পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

(নব পর্য্যায়)
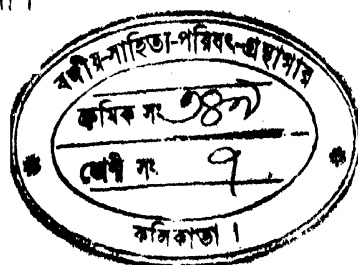
রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

সপ্তম বর্ষ।

প্রথম খণ্ড।

১৩২৯ সনের অগ্রহায়ণ—১৩৩০ সনের বৈশাখ।

কোচবিহার।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।

সূচীপত্র।

পরিচারিকা—সূচী

'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।

৭ম বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল। { ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

নিবেদন।

—:•:—

'পরিচারিকা'র আজ জন্ম-দিন। জন্ম-দিনে নতুন হয়ে মনে পড়ে—জীবনের কথা, মনে জাগিয়ে দেয় দায়িত্ববোধ। এক এক করে জীবনের ওর ছয়টি বৎসর কেটে গেল,—ব্রত উদ্‌যাপনে কর্ম্মের পথে কতটুকু অগ্রসর হতে পারা গেছে ,সাফল্য লাভ হয়েছে কতটুকু, তার হিসাবনিকাশের ইচ্ছা মনে আজ স্বতঃই উদ্রেক হয়, কিন্তু সে ইচ্ছার আর ফল কি,—মূল্যই বা তার কতটুকু। পরিচারিকা যে,—সেবা যার জীবনের ব্রত,—আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে পরার্থপরতাকেই যে মেনে নিয়েছে জীবনের সাধনা,—আনন্দের স্বরূপ, তার আবার কর্ম্মের ফলাফল বিচার! সর্ববনিয়ন্তা যিনি, বিধানে যাঁর আগম-নিগম, জন্ম-মৃত্যু, গতি-স্থিতি, সাধনানন্দে সাফল্য সেই বিশ্ববিধাতার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মহীন হয়ে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত,—তাঁর সর্ব্বজয়ী আশীর্ব্বাদভিখারী

হওয়া ছাড়া পরিচারিকার আর অন্য কাম্য কি হতে পারে! হে সত্য, শিব, সুন্দর, অনন্ত! তোমার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ তার জীবনব্রতে অক্ষুণ্ণভাবে অনুক্ষণ বর্ষিত হোক। তোমার আশীর্ব্বাদে তার সর্ব্ব অক্ষমতা, লজ্জা, অভাব অনটন, সকল সঙ্কট সমস্তই তোমারি কর্ম্মসাধনায়, সাফল্যের সুখে, তা'হলে সার্থক হবে। আদিতে উদ্বোধন-মন্ত্রে প্রাণমন প্রজ্ঞা ভক্তিরসে তোমার চরণে কেন্দ্রীভূত করে সে যে প্রার্থনা করেছিল—

"সুন্দর, তুমি লহ লহ মোরে
লহ জীবনের সাধন-ধন,
সুন্দর কর তোমার আদরে
আমার সেবার এ আয়োজন।"

আজ এই জন্মদিনে তার সেই আন্তরিক প্রার্থনা, আত্মনিবেদন—তার জীবনে কর্ম্মানুরক্তি জাগ্রত রেখে সার্থক কর বিশ্ব-বিধাতা!

আবাহন।

—:*:—

মরম-কমল-দল শিহরণ-চঞ্চল,
বিয়াকুল নবরসগন্ধে,
নীরব কুঞ্জে কল-গীতি-ধারা উচ্ছল,
মুখরিত জাগরণ-ছন্দে;
বনতল চঞ্চল, কমল-কান্ত কই?
রুদ্ধ তিয়াস বুকে মধুকর ফিরে ওই!
কুমুদিনী থরথর, পাণ্ডুর শশধর,
সমীরণ মন্থর বন্দে!

এস হে ঘুচায়ে নবকলিকার গুণ্ঠন
　তুহিন-পরশ-ভীত কুঞ্জে,
গোপন মর্ম্ম-মধু কর বঁধু লুণ্ঠন
　সরম-নিলীম ফুলপুঞ্জে।
হের তরু-মর্ম্মর গুমরে রুদ্ধভাষ,
স্তব্ধ কানন জুড়ি' বেদনার হাহাশ্বাস,—
জাগাও নীরব সুর ঝঙ্কারি' সুমধুর
　নব নব সঙ্গীত-গুঞ্জে।

হৃদয়-তটিনী-বুকে প্রেম-গীতি কল্লোল
　সিকতা-শয়নে আজি সুপ্ত,
আকুল ঊর্ম্মি-দোলে নাহি হিয়া-হিল্লোল,
　অবসিত স্রোতধারা গুপ্ত।—
কোথা গিরি-কন্দর নিরোধি উৎসধার।
শীর্ণা তটিনী জাগে বুকে লয়ে হাহাকার।
ধূ ধূ মরু-বালুকায় পঞ্জর বাহিরায়,
　লীলায়িত যৌবন লুপ্ত!

যমুনা শুকায়ে যায়, এস শ্যাম-সুন্দর।
　তোল তোল বাঁশরীতে ছন্দ,
পুলক-কম্প্র গীতি মুখরিত অন্তর
　প্লাবিয়া টুটাও বালুবন্ধ।

গোপবধূ উন্মন, নয়নে অশ্রু হায়,
বৃন্দাবনের কানু আজি কোন্ মথুরায়?
ঝরি' পড়ে ফুলদল, পঙ্কিল নদীজল,
ব্রজবাসী ক্রন্দন-অন্ধ !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

-:০:-

বর্ষাকাল; চতুর্দ্দিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন. আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত। প্রাতঃকাল হইতেই মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঘরের বাহির হওয়া মহা দায়। রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না বলিলেই চলে. শুধু দু'এক জন মাত্র 'ডুক্‌পা' ভুটিয়া এক রাশি বিভিন্ন ক্রমের dilution দুগ্ধের চোঙ্গা স্কন্ধে ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিল। কর্ত্তব্যের তাড়নে বাধ্য হইয়া এমনি দুর্য্যোগে প্রাতে দশটার সময় বহু কষ্টে অশ্ব সংগ্রহ করিয়া মিরিক যাত্রা করিলাম। আর্দ্দালিরা কুলীর পিঠে মালপত্র চাপাইয়া আমার অনুসরণ করিল, সহিস ছাতি বর্ষাতি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। 'জলা-পাহাড়' হইয়া যখন ঘুমএ আসিয়া পৌঁছিলাম তখন ৬ নম্বর নিম্নগামী যাত্রী গাড়খানি 'ফুঁ ফুঁ' শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কার্শিয়ং অভিমুখে যাত্রা করিল। হিলকার্টরোড হইতে বাহির হইয়া সুকীয়াপোখরি কার্টরোড রেল ষ্টেশনের উপর দিয়া সেঞ্চল সুকীয়া পর্ব্বতমালার ধারে ধারে পশ্চিম দিকে সীমানা প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে।

কার্টরোড ধরিয়া উৎরাই পথে ধীরে ধীরে সুকীয়াপোখরি অভিমুখে অগ্রসর হইলাম, চতুর্দ্দিকের অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়া কবি কালিদাসের—

"সতোয়নম্রাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলৈঃ সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ ॥"

শ্লোকটী বার বার মনে পড়িতে লাগিল।

'হ্যাট্‌কোটধারী' বাঙ্গালী সাহেবকে জলে ভিজিতে দেখিয়া ভুটীয়া বালকগণ মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করিতেছিল। প্রায় বিশ পঁচিশখানি গো গাড়ী ষ্টেশনে চা এর বাক্স পৌঁছাইয়া দিয়া সঙ্কীর্ণ পথটী জুড়িয়া "ক্যাঁক্ ক্যাঁক্" শব্দে সুকীয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, সঙ্গিদের আদেশক্রমে ভুটীয়া গাড়োয়ানেরা বলদগুলিকে সংযত করিয়া গাড়ীগুলি এক পার্শ্বে সরাইয়া লইল। কোনক্রমে সেস্থান অতিক্রম করিয়া অল্পকাল মধ্যেই জঙ্গং আসিয়া পৌঁছিলাম। জঙ্গংএ এক সারি পাহাড় শেষ হইয়া অপর একশ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে, এনিমিত্তই এস্থানের নাম জঙ্গং। এখানে একটি 'গোট্‌' (ডেয়ারী ফারম্‌) ও দুইটি বনবিভাগের বাংলো আছে, বাংলো দুটিতে দুই জন রেঞ্জার বাবু বাস করেন।

জঙ্গংএর পর হইতে কার্টরোডটিকে "মটর সার্ভিসের" উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল। কোথাও ডিনামাইট সাহায্যে পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া, কোথাও অপরপার্শ্বে নীচু হইতে দেওয়াল গাঁথিয়া উঠাইয়া রাস্তটিকে প্রশস্ত করা হইতেছিল। স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল রাস্তা প্লাবিত করিয়া সবেগে বহিয়া যাইতেছিল, ফলে পথটীর কতক অংশ মাঝে মাঝে ধ্বসিয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল, কোথা হইতে এ শ্রুতি-সুখকর স্বর-লহরী উদ্ভূত হইতেছিল কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না; গ্রীক-উপকণ্ঠে "সাইরেণ" সঙ্গীতের গল্প স্বতঃই মনে জাগিয়া উঠিল। শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শ্রুত হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটী মোড় ফিরিতেই দেখিতে পাইলাম প্রায় বিশ পঁচিশটী যুবতী একত্র হইয়া রাস্তার উপর 'রোলার' টানিতেছে ও গান গাহিতেছে। কি কোমল তাহাদের কণ্ঠস্বর,—কি প্রাণমাতান সে সঙ্গীতের তান্! আজিও যেন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"Music when soft voice is dead vibrates in the memory." স্ত্রী-লোকেরা বসিয়া বসিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছিল, পুরুষেরা কেহ পাহাড়ের গায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া "ডিনামাইট্‌" পুরিতেছিল, কেহ বা প্রকাণ্ড হাতুড়ির আঘাতে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিল, বালিকারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলিকে ঝাঁকায় ভরিয়া পিঠে করিয়া বহিয়া আনিতেছিল, মাথার উপরে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতেছিল কিন্তু কুলীরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সকলেই আপন মনে নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছিল। যুবতীর দল রোলার টানিতে টানিতে মাঝে

মাঝে রমণীসুলভ উদ্দাম হাসিতে দিগন্তমুখরিত করিতেছিল, অন্যান্য স্ত্রীপুরুষেরাও কখন কখন তাহাদিগের সহিত হাসি কৌতুকে যোগদান করিতেছিল। নিকটে ছাতি বর্ষাতি লইয়া "বাওদার" (ঠিকাদারের কর্ম্মচারী) মিস্ত্রীদিগকে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেছিল।

আমাদের দেশের মত এদেশের লোকেরা কুলীগিরিকে নীচ কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে না। প্রয়োজন বোধ করিলে ব্রাহ্মণ ছেত্রীরা পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষে রাস্তায় মাটি টানা, পাথর ভাঙ্গার কাজ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যাহার অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার আছে এমন স্ত্রীলোকও অম্লান বদনে কুলীর কাজ করিতেছে; নিজে উপার্জ্জনক্ষম থাকিতে ইহারা গৃহে বসিয়া স্বামীর অন্নধ্বংস করিতে বাস্তবিকই ঘৃণা বোধ করে। এ নিমিত্ত এ দেশে দু'চারিটী ভুটীয়া লামা ও দু'একজন রুগ্ন অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত কাহাকেও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায় না।

ধীরে ধীরে চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লেপ্‌চা-জগতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর আড়ষ্ট প্রায় হইয়া গিয়াছিল, সম্মুখে একটি চায়ের দোকান দেখিতে পাইয়া অশ্বটিকে সহিসের জিম্মায় রাখিয়া দোকানের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। চাওয়ালী আমাকে একটি ছোটখাট সেলামে আপ্যায়িত করিয়া উনানের পার্শ্বে একটি মোড়ায় বসিতে দিল। দোকানে কতকগুলি অৰ্দ্ধ সিদ্ধ কচু ও মেটে আলু ও চাউলের গুঁড়া নির্ম্মিত "খাজা" নামক পিষ্টক, বিক্রয়ার্থ মজুত ছিল। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকও তথায় চা পান করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দু'একজন যে দুইটী যুবতী চা ছাঁকিয়া গ্লাশে গ্লাশে ঢালিতেছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছিল। যুবতীরা তাহাদিগের রসিকতায় "আপ্পা! আপ্পা" শব্দ করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। চাওয়ালীদ্বয় স্মিতমুখে সকলের অভাব পূরণ করিতেছিল, কখনও বা তাহাদিগের সহিত হাসি কৌতুকে যোগ দিতেছিল, কিন্তু এত হট্টগোলের মধ্যেও আপনার পাওনাটি ঠিক কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে ভুলিতেছিল না। দৈব বিড়ম্বনায় এখানে চা পান করিতে আসিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। "Adversity makes strange bed pillows" সুতরাং চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অগ্নির উত্তাপে ও এক পেয়ালা সদ্যোষ্ণ চা পান করিয়া বেশ একটু আরাম বোধ করিলাম, চাওয়ালিকে তাহার সহৃদয় আতিথেয়তার বিনিময়ে পুরস্কৃত করিয়া গন্তব্য

পথ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে আর একটি সকীর্ণ পথ উত্তর দিকে চড়াই উঠিয়া চুংটুং চাবাগানের ভিতর দিয়া পুল-বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একটু রৌদ্রের রেখাও দেখা গিয়াছিল। অদূরে পাহাড়ের গায় শাদা শাদা মেঘগুলি শ্যামল সিক্ত তরুরাজির শিরে রজত মুকুটের মত শোভা পাইতেছিল। সদ্যস্নাত পর্ব্বত শিখরগুলিকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর ও অধিকতর নিকটে বলিয়া বোধ হইতেছিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম Church of Scotland Missionary Society হইতে পাহাড়ের গায় স্থানে স্থানে শাদা কাল অক্ষরে বাইবেলের উপদেশগুলি লিখিয়া রাখা হইয়াছে। এক স্থানে এক হাজার ফুট উচ্চ হংসডিম্বাকৃতি একটি সুবিশাল প্রস্তরখণ্ড উচ্চ-শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই "গুম-রকের" উপর হইতে 'তরাই'এর মনোরম দৃশ্য দেখিবার জন্য অনেক সাহেব মেম এখানে আসিয়া থাকেন।

রাস্তা হইতে একটি "পাক্‌ডাণ্ডী" সরু চড়াই পথ ধরিয়া গুম-রকে আরোহণ করিলাম। রকের উপরটা চারিদিকে লোহার শক্ত রেলিং দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখান হইতে তরাইএর দৃশ্য সত্য সত্যই নয়নমনমুগ্ধকর, পর্ব্বত পাদমূলে নিবিড় ঘন বৃক্ষরাজির শিরে অস্তায়মান সূর্য্যের সোণালি কিরণ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল, পার্শ্বে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদটি বনের গায় শুভ্র রজত বেষ্টনীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিয়াছেন দেখিয়া সত্বর "গুম-রক" ত্যাগ করিয়া নামিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যেই পর্ব্বতের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া আসিয়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, আঁধার হইতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না।

সমতল প্রদেশে ম্লানমুখী সন্ধ্যা ধূসর বসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া ধীর মন্থর গমনে পৃথিবীর বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্ধ্যা গাঢ় তিমির বসনে আবৃত হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এক বিকটাকার দানবীর মত সমস্ত দেশটাকে যুগপৎ গ্রাস করিয়া ফেলে।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলাম, কিন্তু করুণাময় ভগবানের কৃপায় অল্প-ক্ষণের মধ্যেই যখন সুকীয়াপোখরির ডাকবাংলোতে আসিয়া পৌঁছিলাম—তখন কেবল ঘরে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

সুকীয়াপোখরি। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি বালারুণ সূর্য্যের রক্তিম ছটায় সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রভাত সূর্য্যের নবীন কিরণ বৃক্ষপত্রে প্রতিফলিত হইয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল, মৃদুমন্দ বায়ুভরে বৃক্ষশাখা সঞ্চালিত হইতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল যেন সমস্ত বনভূমি আনন্দে নৃত্য করিতেছে 'পবন চলিত শাখৈঃ শাখিভি নৃত্যতীব' বৃক্ষ শাখে নানা জাতীয় পার্ব্বত্য বিহঙ্গ আনন্দে কলরব করিতেছিল, দীর্ঘ অদর্শনের পর সূর্য্যদেবকে পাইয়া সমস্ত জীব-জগৎ পুলকে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ভক্তিভরে তরুণ তপনকে প্রণিপাত করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সুকীয়া পোখরির বাজার দেখিতে বাহির হইলাম।

সুন্দর সমতল ভূমির উপর বাজার, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সারিবদ্ধ দোকান, মধ্যভাগে হাটের জন্য সারি সারি টীনের চালা ঘর! সওদাগরী, মনোহারী, বেনেতি প্রভৃতি দ্রব্য দোকান গুলিতে পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন চা, মিঠাই মাড়োয়ারী দোকান, মুদিখানা, ও দর্জ্জির দোকানও রহিয়াছে, এমন কি একখানা ঘড়ি চশমার দোকানও দেখিতে পাইলাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ছোট খাট সহরে যে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এখানে তাহার কিছুই অভাব নাই।

বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে পোষ্ট অফিস, থানা, কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মিশনারী স্কুল ও ফরেষ্ট রেঞ্জার বাবুর বাড়ী, উত্তর দিকে মদের দোকান, ও 'গোস্‌খানা' কসাইএর দোকান, উত্তর পূর্ব্ব কোণে পাহাড়ের উপর "পচুই মদ্য জার" এর দোকান।

সুকীয়াপোখরির হাটটি—"দার্জ্জিলিং ইম্প্রুভমেণ্ট ফাণ্ডের" অধীন এনিমিত্ত এখানে পায়খানা, জল নিকাশের নর্দ্দামা ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে ও হাট-খোলাটিকে ঝাঁট্‌ঝুট্ দিয়া পরিস্কার রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সুকীয়াপোখরি—আলু ও মাখন ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল, এজন্য নানা দেশীয় মহাজন আসিয়া এখানে অস্থায়ীভাবে বাসা করিয়া আছেন। নেপালের অন্তর্গত ইলাম, তাপলেজুং প্রভৃতি থানার এলাকাধীন গ্রাম সমূহ হইতে পাইকারেরা কুলীর পিঠে আলু বোঝাই করিয়া হাটে লইয়া আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু স্ত্রী পুরুষ শাক সব্‌জী মাখন বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। তাহাদিগের বেশ ভূষা চাল চলন হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এখনও বৈদেশিক

বিলাসিতার হাওয়া তাহাদিগের জাতীয় জীবনকে কলুষিত করিতে পারে নাই।

শুক্রবারেই সুকীয়া পোখরির বড় হাট, দিনটি বেশ খোলসা থাকাতে প্রায় আটটা বাজিতে বাজিতেই হাটে লোক সমাগম হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পুরুষেরা অনেকেই হাফ্ প্যাণ্ট, কোট্, সার্ট, গোলটুপি, কেহ কেহ বা জাতীয় পোষাক যোধপুরী ধরণের ঢোলা পায়জামা, কুর্ত্তা, কাপড়ের টুপি পরিয়া আসিয়াছিল, কাহারও কাহারও পায় মোজা ও বুট জুতাও ছিল। স্ত্রীলোকেরা অনেকেই বিচিত্র বসনে সজ্জিত হইয়া হাটে বিক্রী কিনি করিতে আসিয়াছিল। কাহারও পরণে সাধারণ ছিটের রঙিন কাপড়, জামা, উড়ানি, কাহারওবা পেটিকোট, কাল ভেলভেটের জ্যাকেট ও ঘাগড়া, সিল্কের উড়ানি ছিল। দু' এক জনের পায় জুতা মোজাও দেখিয়াছিলাম। ইতর ভদ্র সকলেরই অঙ্গে অল্প বিস্তর স্বর্ণালঙ্কার ছিল, দু' একটি যুবতীর মস্তকের উপর প্রায় চারি ইঞ্চি ব্যাস চক্রাকার সোণার ফুল ছিল।

হাটে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, ব্রাহ্মণ ছেত্রী জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা পরিয়া শাক সব্জী বিক্রয় করিতেছিল, মস্তকের উপরি ভাগে ∞ (ক্রশবো) আকারের খোঁপা বাঁধিয়া নেওয়ার জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা বানিয়াতি দ্রব্যাদি লইয়া বসিয়াছিল, দর্জ্জির দোকানে স্ত্রীলোকেরা কল চালাইয়া সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় সেলাই করিতেছিল।

ওদিকে মদের দোকানের সম্মুখে ভিড় করিয়া স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকারা ঠেলাঠেলি করিতেছিল। মদ্য ইহাদিগের অতি প্রিয় সামগ্রী, ব্রাহ্মণ, ছেত্রী ব্যতীত, আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই মদ্য পান করিয়া থাকে। মদের দোকানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী ভূটিয়া লামা ঘণ্টা বাজাইয়া ভিক্ষা করিতেছিল। তাহার গায়ে বৈরাগীদিগের আলখেল্লার মত একটি ঢোলা লালবর্ণের পশমী পোষাক, মুণ্ডিত মস্তকের উপর সম্মুখভাগে এক সারি কৃষ্ণবর্ণ লোমযুক্ত, চর্ম্মনির্ম্মিত গোলটুপি, ও পায় হাঁটু পর্য্যন্ত "সে-চা নামক চর্ম্মপাদুকা। হাটের মধ্যে আরও দুই তিনটি বৃদ্ধা ভূটিয়া লামানীকে ভিক্ষা করিতে দেখিলাম, তাহারা সকলেই এক স্থানে বসিয়া দক্ষিণ হস্তে অনবরত একটি তাম্র নির্ম্মিত "মানে" ঘুরাইতেছিল।

চূড়াযুক্ত গোলাকার ঢাকনি বিশিষ্ট, তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ দুই ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত নলাকৃতি একটি চোঙ, এবং তাহার নিম্ন ভাগে অতি দক্ষতার সহিত আটকান একটি হাতল। চোঙের মধ্যে

তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধ মন্ত্র লেখা এক টুকরা ভূর্জ্জপত্র, এবং চোঙ্গের তলায় হাতলের উপরি ভাগে পাতলা একখানি গোলাকার তাম্রখণ্ড। ভুটিয়াদিগের বিশ্বাস মানেটি ঘুরাইবার সময় তাম্রখণ্ডটি ঘর্ষণে ঘর্ষণে যতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে তাহাদিগের ইহ জন্মের পাপও তত নাশ হইবে। এ নিমিত্ত লামাগণ "গুম্বায়" ধর্ম্মমন্দিরে সদা সর্ব্বদা * "ওঁ মানে পেমে হুম্" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মানে ঘুরাইতে থাকে।

হাটের এক স্থানে খুব জনতা দেখিয়া কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক উত্তেজিত ভাবে "এই ত আমার মেয়ে" "এই ত আমার মেয়ে" বলিতেছে, নিকটে একটি তরুণ যুবতী লজ্জাবনত মুখে হাতের নখ খুঁটিতেছে, পার্শ্বে একটি বিংশতি বর্ষীয় যুবক অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া হস্তস্থিত বেত্র দ্বারা নিজ পায়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল জন্মিল, পার্শ্বস্থ একটি ভদ্রবেশধারী পাহাড়িয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, যুবতীটি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ঐ যুবকটির সহিত গোপনে পলায়ন করিয়াছিল।

আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে দেখিয়া লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "ইহাতে বিস্মিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই, গুর্খাদিগের চির সনাতন প্রথা অনুসারে প্রত্যহই এরূপ কতশত যুবক যুবতী প্রেমের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। যাহারা এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল প্রণয়ীর প্রেমের কুহকে ভুলিয়া গোপনে পলায়ন করে, তাহাদিগের আর পিতামাতার আমন্ত্রণ বিনা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবার অধিকার থাকে না এবং তাহাদিগের আর শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ হইতে পারে না। অনেক সময় হাট বাজার করিতে আসিয়া সেখান হইতেই কন্যা নিরুদ্দেশ হয়, হয়ত তাহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। দৈবাৎ কখন সাক্ষাৎ ঘটিলে অথবা সংবাদ পাইলে কোন কোন্ কোমল হৃদয় পিতা স্নেহপরবশ হইয়া কন্যা জামাতাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদিগের ললাটে দধি চাউলের "টীকা" ফোঁটা পরাইয়া দেন, এবং কন্যা জামাতা শির নত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে 'ধোক্ দিমু'।" ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্নানাহার করিতে বাংলাতে ফিরিয়া গেলাম। অপরাহ্নে থানায় বেড়াইতে গেলাম, থানায় একজন দারোগা ও একজন

* ওঁ মণিপদ্মে হুঁ,—কিন্তু সাধারণ লামাগণ পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চারণ করে

জমাদার থাকেন, সকলেই এতদ্দেশীয়। দারোগা বাবু তখন বন বিভাগের জঙ্গল হইতে বিনা পাট্টায় ঘাস কাটার এক মামলা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, জমাদার বাবু খাসমহলের মণ্ডল ও চা বাগানের চৌকিদারগণের নিকট হইতে জন্ম মৃত্যুর সংবাদ লিখিয়া লইতেছিলেন। এদেশে চৌকিদারী প্রথার প্রচলন নাই সুতরাং প্রতি হাট বারে মণ্ডল ও বাগানের পাহারাওয়ালারাই থানায় আসিয়া এ সকল সংবাদ লিখাইয়া দিয়া যায়।

দারোগাবাবু আমাকে স্মিত মুখে অভ্যর্থনা জানাইয়া হাসিয়া বলিলেন "মামলা মোকদ্দমা মোটেই কিছু নাই শুধু এই ঘাসকাটা কাঠকুড়ান মামলা নিয়ে মিছে দিক্‌দারি। মাঝে মাঝে দু'চারটি মারামারি জখমের মামলা হয় বটে, কিন্তু অপরাধীর সন্ধান মিলা কঠিন। রাগের মাথায় খুক্‌রী বসিয়ে দেয়, আবার হুঁস হ'লেই এক দৌড়ে নেপাল এলাকায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

তাড়াতাড়ি থানার কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া "জোড়পুখরীর দিকে বেড়াইতে বাহির হইলেন। আঁকা বাঁকা পথ দিয়া প্রায় মাইল খানেক উর্দ্ধে উঠিয়া জোড়পুখরী পৌঁছিলাম। ক্ষুদ্র পাহাড়টির শীর্ষ দেশে সুন্দর একটী নির্জ্জন বাংলো, চতুর্দ্দিক জঙ্গলে ঘেরা। বাংলোতে চারিজন ব্যক্তির উপযোগী খাট বিছানা এবং চৌকিদারের তত্ত্বাবধানে আবশ্যকীয় বাসন পত্র, প্লেট, কাপ, ল্যাম্প প্রভৃতি আছে। বাংলোতে রাত্রিবাসের জন্য পূর্ব্ব হইতেই পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের অফিস হইতে পাশ সংগ্রহ করিতে হয়। বেসরকারী কি সরকারী কাহাকেও বিনা পাশে বাংলো অধিকার করিতে দেওয়া হয় না, কারণ এরূপ আইন না থাকিলে অনেকেই অনিশ্চিত ভাবে আসিয়া বাংলোয় স্থানাভাব নিবন্ধন অনেক সময় বিপদে পড়িতে পারেন। বাংলোর একটি প্রকোষ্ঠে দার্জ্জিলিং জিলার আবকারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এম্. এ. পেলে ছিলেন। সাহেবটি ফরাসী পিতা—মাতার সন্তান, এরূপ মিষ্টভাষী, অমায়িক, সহৃদয় সাহেব আমি আর কখন দেখি নাই।

জঙ্গলের মধ্যে হরিণের ডাক শুনিতে পাইয়া সাহেব বন্দুক লইয়া বাহির হইলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও শিকারের সন্ধান পাওয়া গেল না। আঁধার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সাহেবকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া উৎরাই পথে সত্বর সুকীয়াপোখরি ফিরিয়া আসিলাম।

সীমানা :—পরদিন প্রাতঃকালে সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া বেলা প্রায় ৮ টার সময় সুকীয়াপোখরি ত্যাগ করিলাম। সুকীয়া বাজার হইতে কাটরোড দিয়া প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "সীমানা" আসিয়া পৌঁছিলাম।

সীমানাতে আবকারী বিভাগের একটি "পেট্রল হাউস্", সামান্য কয়েকখানি দোকান ও দু'চারজন লোকের বাস আছে মাত্র। এই স্থান হইতেই ইংরাজ অধিকার শেষ হইয়া নেপাল রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ জন্য একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত সুবৃহৎ শ্বেতবর্ণ স্তম্ভ রহিয়াছে, স্তম্ভের পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং পশ্চিমে নেপাল। সীমানা বড়ই ভয়ঙ্কর স্থান, খুন জখমাদি ব্যাপার এস্থানে প্রায়ই সংঘটিত হয়। স্থানটি সীমান্তদেশে অবস্থিত বলিয়া এ স্থানের অধিবাসীরা রাজদণ্ডের ভয় করে না, কোন ক্রমে স্তম্ভের অপর পারে পৌঁছিতে পারিলেই অপরাধী নিরাপদ।

স্তম্ভের পশ্চিম পার্শ্বে এক সারি বাড়ীতে কতকগুলি ভুটিয়ার বাস। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে বল্লমের ন্যায় অগ্র বিশিষ্ট কয়েকটি করিয়া সুদীর্ঘ কাষ্ঠ খণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে, তিন চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ এক হস্ত প্রস্থ এক একখানি বস্ত্রখণ্ডে বৌদ্ধ মন্ত্র লিখিয়া প্রত্যেক কাষ্ঠখণ্ডের সহিত লম্বিত ভাবে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভুটিয়াদিগের বিশ্বাস ইহাতে ভূত প্রেত প্রভৃতি অপদেবতাগণ গৃহস্বামীর ও তাহার পরিবারবর্গের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।

কার্টরোড এই পর্য্যন্ত আসিয়াই শেষ হইয়াছে, এখান হইতে দুইটি পথ দুই দিকে বাহির হইয়া গিয়াছে। উত্তরদিকের পথটি জনমানবহীন নির্জ্জন গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া টাম্‌লিং, সান্‌ডাকাফু হইয়া ফালেলং বাংলোতে গিয়া মিশিয়াছে। এই ৩৬ মাইল ব্যাপী অপ্রশস্ত বন্ধুর পথে কখন চড়াই কখন উৎড়াই চলিতে হয়, অবিরত দুঃসহ শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ফলুট (ফালেলং) যাত্রিগণকে শীতে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। পথে হিংস্রজন্তুর উপদ্রবের কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, শীত কালে যখন অধিক পরিমাণে বরফ পড়িতে থাকে তখন উপর হইতে "শোকপা" গরিলা নামিয়া আইসে। দুর্ভাগ্য ক্রমে কখনও এ ভীষণ জানোয়ারের সম্মুখে পতিত হইলে ইহার কবল হইতে পরিত্রাণ

লাভ করা বড়ই সুকঠিন। শোকপা নাকি মনুষ্যের প্রাণ বধ করিয়া তাহার নাসিকার অগ্রভাগ ও কর্ণের নরম অংশ মাত্র ভক্ষণ করে।

এই সকল কারণে নিতান্ত দুঃসাহসী ও কষ্ট সহিষ্ণু অর্থশালী ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ফলুট্ দর্শনে সাহসী হয় না। সচরাচর সেপ্টেম্বর মাসে ফলুট্ যাত্রিগণ সদলবলে ফলুট্ অভিযান করিয়া থাকেন।

পথে টাম্লিং ও স্যানডাকাফুর ডাক বাংলোতে এক এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিনে ফলুট্ পৌঁছা যায়। প্রত্যেক বাংলোতেই প্রায় আট দশ জন ব্যক্তির উপযোগী খাট্, গদি আছে, এতদ্ভিন্ন খানসামা, বাবুর্চি ও কুলীগণের জন্যও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে, অশ্ব রাখিবার নিমিত্ত এক একটি আস্তাবলও আছে। পাকের বাসন, চায়ের পেয়ালা প্লেট্, ল্যাম্প, জ্বালানি কাষ্ঠ চৌকিদারের নিকট হইতে পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমস্তই পূর্ব্ব হইতে প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়, নচেৎ সে জন মানবহীন দুর্গম অরণ্য প্রদেশে দৈবাৎ কোন দ্রব্যের অনটন ঘটিলে প্রভূত অর্থব্যয়েও তাহা মিলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভুটিয়া চৌকিদারেরা বাংলোতে সপরিবারে বাস করে, তাহারাও সুদূর সুকীয়াপোখরির শুক্রবারের হাট হইতে নিজ নিজ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে। আশ্বিনের প্রারম্ভ হইতে ফাল্গুনের মধ্য পর্য্যন্ত ফলুট্ অবিরত তুষারে অবৃত থাকে, প্রায়ই জল জমিয়া বরফে পরিণত হইয়া যায়। স্থানটি প্রায় ১২০০০ ফিটের অধিক উচ্চ, এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার সন্নিকট বলিয়া শীত অত্যন্ত বেশী, এ নিমিত্ত এ অঞ্চলে মনুষ্যবসতি নাই, শুধু বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র শিব চতুর্দ্দশীর দিনে এখানে বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে। ফলুট্, সিকিম, নেপাল ও দার্জ্জিলিংএর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত।

মিরিকের পথে—ফলুটের পথ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদিকে মিরিক অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলাম কয়েক জন লোক একটি শব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং তৎপশ্চাতে অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকে এক এক বোঝা "আউড়" বিচালিখড় সঙ্গে লইয়া উঁ উঁ, উঁ উঁ শব্দ করিতে করিতে শবানুগমন করিতেছে। হঠাৎ শব দর্শন করিয়া মনে মনে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম, শবানুগমনকারিগণের অদ্ভুত ক্রন্দনের স্বর লক্ষ্য করিয়া কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত বিশেষ কৌতূহলী

হইয়া উঠিলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম মৃত ব্যক্তিটি জাতিতে নেওয়ার, নেওয়ারগণের জাতীয় প্রথা অনুসারে শবানুগমনকারী প্রত্যেককেই শোক প্রকাশ করিতে হয়, এবং নেওয়ারের মৃত দেহ একমাত্র পিচাশিখড় সাহায্যেই দাহন করিবার প্রথা।

কিয়ৎক্ষণ পরে লোকগুলি রাস্তা হইতে নামিয়া ঝরণার দিকে চলিয়া গেল, তখন আমি মনে মনে শান্তি বোধ করিয়া গন্তব্য পথ অভিমুখে বেগে অশ্ব চালনা করিলাম। পথটি কখন চড়াই, কখন উৎড়াই ভাবে সীমান্তবর্ত্তী গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃক্ষগুলির ঘনপত্রজাল ভেদ করিয়া সূর্য্যের আলো সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া বনের ভিতর স্যাঁৎসেঁতে, এবং দিনমানেই আঁধার আঁধার মনে হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষগুলিতে অসংখ্য জোঁক পথিকের দর্শন মাত্রেই কিল কিল করিতে থাকে, এবং উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পথিকের পায় আঁকড়াইয়া ধরে। অশ্ব পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া আপনাকে বেশ নিরাপদ ভাবিয়াছিলাম কিন্তু পোষাক ছাড়িবার সময় দেখিতে পাইলাম যে পুরু পট্টি, বুট ও মোজা ভেদ করিয়া এ ক্ষুদ্র জীব ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক রক্তশোষণ করিয়াছে।

পথে এক স্থানে কয়েক জন "লামা" জাতীয় কুলী প্রকাণ্ড ভারী চায়ের বাক্স পিঠে করিয়া পাহাড়ের গায় ঠেস দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। ইহারা অত্যন্ত শক্তিশালী, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী, সামান্য একখানি "খুকরী" ছোরা কোমরে ঝুলাইয়া এই সকল কুলীগণ হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যাতায়াত করে।

গুর্খালিরা ইহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক "সায়েনা ভুটীয়া" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে।

এ জাতি গোমাংসের এতই প্রিয় যে ইহারা* মৃত বলদের মাংস ভক্ষণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না।* মুর্মিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন সহোদর একত্র হইয়া শিকারে বহির্গত হইয়াছিলেন। সমস্ত দিবসের নিষ্ফল প্রয়াসের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে মধ্যম ভ্রাতা বিষ্ণু একটি 'গৌরী গাই' (Cow Bison) দেখিতে পাইয়া শরাঘাতে তাহাকে হত্যা করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেশ্বরকে গাভীর অন্ত্রগুলি ধৌত করিতে ঝরণায় প্রেরণ করিয়া তাঁহারা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন,

---

* Vide Dr: F. Hamilton's Account of Napal, 1829.

এবং রন্ধনাস্তে আপন আপন অংশ অন্তরালে লুকাইয়া রাখিলেন। কনিষ্ঠ প্রত্যাগমন করিলে তাঁহারা কহিলেন "আমরা উভয়ে ভোজন করিয়াছি, তুমি সত্বর আহার করিয়া লও", সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে মহেশ্বর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অনতিবিলম্বে আহার সমাধা করিলেন। তদন্তে ব্রহ্মা বিষ্ণু আপন আপন অংশ বাহির করিয়া তাঁহাকে গোমাংস ভক্ষণহেতু তিরস্কার করিতে লাগিলেন, ভ্রাতাগণের নীচ ষড়যন্ত্রে যৎপরোনাস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অস্ত্রগুলির দ্বারা তাঁহাদিগকে আঘাত করিলেন, এবং তদবধি লামা, তামাঙ্, ইশাঙ্, সামাঙ্ প্রভৃতি মুর্ম্মিগণের গোহত্যা করা নিষেধ।

বন অতিক্রম করিয়া যখন চাবাগানের ভিতর প্রবেশ করিলাম তখন বিশ্রাম সূচক "ভোঁ" বাজিয়া উঠিল, অমনি কুলীরা কাজ বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। প্রত্যুষে কাজে আসিবার সময় সকলেই বাটী হইতে ভুট্টার খৈ ও "জার" মদ্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম লাভ করিয়া স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা প্রত্যেকে আপন আপন পুটুলি বিছাইয়া জলযোগে প্রবৃত্ত হইল। সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দার বাইদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল।

দার্জ্জিলিং জিলার যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই শুধু চা বাগান, প্রত্যেক বাগানে এক এক জন মাত্র শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর ইঙ্গিতে প্রত্যহ কত শত কুলী যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাইতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন চা-করেরাই সমগ্র জিলাটিকে শাসন করিতেছে। আপন আপন বাগানে ম্যানেজার সাহেবরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। সুন্দর বাগান বেষ্টিত চমৎকার বাড়ী, সুসজ্জিত গৃহ, বহুব্যয় নির্ম্মিত টেনিস্ প্রাঙ্গন, দাস দাসী, যান বাহন, কর্ম্মচারী কিছুরই অভাব নাই, সুদূর মফঃস্বলে দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গ বসিয়াও তাহারা সহরের সুখসুবিধা ও বিলাসিতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আবার "ভোঁ" বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার কুলীরা আপন আপন কাজে মনোনিবেশ করিল। বেচারীরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কাজে আইসে এবং প্রায় আট দশ ঘণ্টার অধিক কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিনান্তে গৃহে ফিরিয়া যায়, সমস্ত দিবসের

ফাড়ভাজক খাটুনির উপার্জ্জন শুধু ছয় হইতে দশ পয়সা মাত্র। ইহারা এই যৎসামান্য পারি-শ্রমিক লাভ করিয়াই সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করে এবং আপন আপন বাসগৃহের অঙ্গনে যৎকিঞ্চিৎ শাক শব্জী উৎপাদন করিয়া উহারই বিক্রয়লব্ধ অর্থে কোন ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

পাছে চা বাগানের কুলীদিগের মধ্যে কেহ কোনরূপ অসন্তোষের সৃষ্টি করে অথবা কোন "আড়কাঠি গোপনে প্রবেশ করিয়া কুলী ফুঁসলাইয়া" অন্য বাগানে লইয়া যায়, এ নিমিত্ত বাগানে কোন অপরিচিত আগন্তুক আসিলেই ম্যানেজার মহাশয় তাহার গতিবিধির উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

প্রায় চারি পাঁচ মাইল পথটি চা বাগানের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। পথের দুধারে কোথাও শুধু চা গাছ, কোথাও কলকারখানা গুদামঘর, কোথাও বা কুলীদিগের বাসের নিমিত্ত লম্বা লম্বা টিনের ঘর। প্রত্যেক ঘরে বিশ পঁচিশটি ছোট ছোট কুঠুরী আছে, এবং প্রত্যেক কুঠুরীতে এক একটী কুলী পরিবার বাস করে।

এইরূপ তিন চারি সারি টীনের ঘরগুলিতে এক শত হইতে দেড়শত কুলী পরিবার একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। পাহাড়ী ভাষায় ইহাকে "কুলীধুরা" কহে। এতগুলি কুলীর একত্রাবস্থান হেতু চা বাগানের এলাকাধীন কোন বাটী তল্লাস বা কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে ধৃত করা পুলিশ কর্ম্মচারিগণের পক্ষেও বিপজ্জনক। এ নিমিত্ত এরূপ কোন কার্য্য ব্যপদেশে বাগানের ভিতর যাইতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুমতি ও সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু ইহাতে কার্য্য হানিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কখন কখন আবকারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ গভীর রাত্রিতে সদলবলে বাগানে প্রবেশ করিয়া কুলীধুরা হইতে মদ্য চোলাই করার অপরাধে অনেক কুলী ও কুলী রমণীকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে কোন কোন স্থলে দাঙ্গা হাঙ্গামাও ঘটিয়া থাকে। অধিকাংশ বাগানের ম্যানেজার ও কুলীগণ আবকারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে চির শত্রু মনে করেন এ নিমিত্ত তাঁহাদিগকেও বাগানের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়।

চা বাগান অতিক্রম করিয়া চলিতে চলিতে মেচীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রিটিশ ও নেপাল রাজ্যের প্রান্তসীমা ধৌত করিয়া ক্ষুদ্র মেচীর উদ্দাম জলস্রোত নিম্নদিকে ধাবিত হইয়াছে। মেচীর ধার দিয়া আসিতে আসিতে এক স্থানে কতকগুলি লিম্বু জাতীয় লোক একটি গোর খনন করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

দার্জ্জিলিং জিলার সর্ব্বত্র তখন যেরূপ ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধির প্রকোপ হইয়াছিল তাহাতে প্রত্যহ বহু লোক এই ভীষণ ব্যাধির করাল কবলে পতিত হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিতেছিল। নিকটেই দুইটি সদ্য নির্ম্মিত "মানেগুম্পা" স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। স্তম্ভ দুটির উপরে যোগাসীন বুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম এ দুইটি কোন অবস্থাপন্ন ভুটিয়ার সমাধি হইবে। নিকটে যে একটি নূতন গোর খোঁড়া হইতেছিল তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একটি "ফেঁডাংগ্মা" পুরোহিত কোন অশরীরী আত্মা অথবা কোন দেবতা কি অপদেবতার উদ্দেশে স্তবস্তুতি করিতেছিলেন। লিম্বু "কুরা" ভাষা দার্জ্জিলিংএর প্রচলিত ভাষা হইতে পৃথক্, সুতরাং আমি তাঁহার অঙ্গভঙ্গি ও হস্ত সঞ্চালন ব্যতীত কোন কথারই অর্থবোধ করিতে সক্ষম হইলাম না। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমার সহিসটি লিম্বু জাতীয় হওয়ায় সে আমাকে সকল বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিল।

লিম্বু জাতীয় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃত দেহকে গোরস্থানে বহন করিয়া আনিয়া পুরোহিতকে একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিতে হয়। তদ্দারা তিনি মৃতের সমাধির নিমিত্ত তৎস্থানাধিবাসী দেবদেবীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করিয়া লন, তখন ঐ স্থানে গোর খনন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ব পুরুষ পক্ষে চারি, স্ত্রী পক্ষে তিন সরি প্রস্তর দ্বারা সাজান হয়। তন্মধ্যে শবটিকে চিৎভাবে শায়িত করিয়া বদ্ধকর হস্ত দুখানিকে বুকের উপর স্থাপন করা হয় এবং সমস্ত দেহটিকে বৃক্ষ পত্র দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন শ্রেণীর লিম্বুর শিয়রে কখন কখন কাংস পাত্রে একটি রৌপ্য অথবা তাম্র মুদ্রা রক্ষা করা হয়। গোরটি মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করা হইলে পুরোহিত মৃতের প্রেতাত্মাকে সম্বোধন করিয়া মানবের ভাগ্য ও জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করেন, এবং জীবিতগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে পূর্ব্বপুরুষগণের অনুগমন করিতে আদেশ করেন।

তদন্তর পুরোহিত সকলের সহিত মৃত ব্যক্তির গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পান ভোজন করিয়া থাকেন।

মৃতের পুত্রাদি ও অপরাপর ঘনিষ্ট আত্মীয়গণ পুরুষের মৃত্যু হইলে চারিদিন, স্ত্রীর তিনদিন পর্য্যন্ত "জুঠা বাড়িয়া" থাকেন অর্থাৎ এই কয়েকদিন তাঁহারা আমিষ, লবণ, তৈল, মসলা, চাউল প্রভৃতি আহার করেন না। অশৌচান্তে পুনরায় পুরোহিত ও আত্মীয়কুটুম্ববর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে শূকর মাংস দ্বারা ভোজন করাইতে হয়। ভোজনান্তে তাঁহারা অশৌচ পালনকারিগণকে মাংসাদি ভোজন করিতে অনুমতি দেন, এবং "ফেডাংগ্‌মা" পুনঃ মৃতের আত্মাকে সম্বোধন করিয়া তাহাকে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলিত হইতে আজ্ঞা করেন।

মৃতের সৎকার সম্বন্ধে লিম্বুদিগের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন দেখা যায়, কেহ কেহ মৃতদেহ অগ্নিতে সৎকার করে, কেহ সমাধি দেয়, আবার কেহ বা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী দেখা যায়, কেহ বৌদ্ধ, কেহ শৈব, কেহ বা কিছুই নয়। যে স্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা অধিকাংশ বৌদ্ধ সে স্থলে ইহারা "ওং মণিপদ্মে ওং" মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া ঘোষিত করে, আবার যে স্থানে চতুর্দ্দিকে হিন্দু অধিবাসীর বাস তথায় ইহারা হর গৌরীর উপাসক। তবে শৈব হউক অথবা বৌদ্ধ হউক "য়ুমা কাপোবা" ও "থিবা" ইহাদিগের গৃহে দেবতা, সংসারে কোনরূপ ব্যাধি পীড়া ও অনিষ্টের সম্ভাবনা ঘটিলে "আইতাবার" রবিবার ভিন্ন অন্য কোন দিনে গৃহের বহির্ভাগে মহিষ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি বলি দিয়া গৃহদেবতার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়। যাহারা হেলা করিয়া গৃহ দেবতাকে পাঁচ বৎসর মধ্যে অন্ততঃ একটি বারেও অর্চ্চনা করে না তাহাদিগের সংসারে নানারূপ বিপৎপাত ঘটে এবং তাহারা বাত ব্যাধিগ্রস্থ (গেঁটে বাত) হয়। সহিসের নিকট লিম্বুদিগের সামাজিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে ধীরে ধীরে মিরিকের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। পথে এক স্থান হইতে ছোট একটি রাস্তা বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে মেচী পার হইয়া নেপালের দিকে চলিয়া গিয়াছে দেখিতে পাইলাম অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় মিরিক বাজারে আসিয়া পৌঁছিলাম।

মিরিক পাহাড়ের গাত্র ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে আবার এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় উঠিয়াছে। বাজারের মধ্য স্থলে এরূপ একটি ছোট পাহাড়, পাহাড়টিকে চতুষ্পার্শে গোল করিয়া দুই সারি হাটের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, হাটের দিন সওদা পত্র ক্রয় করিতে হইলে পাহাড়টিকে অন্ততঃ একবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পূর্ব্বদিকে একসারি দোকান, দোকানগুলিতে পল্লীবাসীর উপযুক্ত আবশ্যকীয় সকল প্রকার দ্রব্যাদিই সকল সময়ে পাওয়া যায়।

সুকীয়া অপেক্ষা এখানে মাড়োয়ারী দোকানদারের সংখ্যা অধিক এবং অনেকেই স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতেছেন। মাড়োয়ারীগণের জাতিগত বস্ত্রব্যবসায় ছাড়াও ইঁহাদিগের চাউল ডাইল প্রভৃতির কারবার রহিয়াছে, তরাইএর অতি উৎকৃষ্ট "নূনীয়া" আতপ ও উষ্ণা চাউল সর্ব্বদা এই সকল দোকানে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

বাজারের উত্তর পশ্চিম কোণে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস। দার্জ্জিলিং জিলার মফস্বলে পোষ্ট আফিসের সংখ্যা অতি বিরল, এবং দু' একটি বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যতীত টেলিগ্রাফ অফিস অন্যত্র কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মিরিকের চতুষ্পার্শ্বে মারমা, সৈরিনী, বোখিম, থারবো প্রভৃতি অনেকগুলি চা বাগানে বহু সাহেব ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বাস করেন বলিয়া এখানে পোষ্ট অফিসের সহিত একটি টেলিগ্রাফ আফিসও খোলা হইয়াছে। বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে প্রায় তিন চারি মাইল নিম্নে ক্ষুদ্রকায়া মেচী প্রবাহিত হইতেছে, মেচীর অপর পারে বিশাল পর্ব্বত যেন স্বাধীনতাগর্ব্বে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত তরাইএর মনোরম দৃশ্য, পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র তড়াগ। তড়াগের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই ঘাস জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কেবল দু'এক স্থানে জল পাওয়া যায় মাত্র। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে এখানে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হয়, তখন তড়াগের জল প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়, যে সামান্য পঙ্কিল জল অবশিষ্ট থাকে লোকে উহাতেই স্নান ও বস্ত্রাদি ধৌত করে এবং ঐ কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া থাকে।

তড়াগটির অবস্থা পূর্ব্বে এরূপ ছিল না; এক সময়ে নাকি ইহা সুন্দর স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ থাকিত, এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হংসরূপ ধারণ করিয়া সহচরীর সহিত তড়াগের সলিলে আনন্দে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেন। মিরিকবাসীর দুরদৃষ্টক্রমে একদা একটি সাহেব

হংসদম্পতির প্রাণ হিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং তদবধি দেবতা এ স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে তড়াগটিও এ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

এ কিংবদন্তীর মধ্যে কোনরূপ সত্য নিহিত আছে কিনা জানি না, তবে এককালে যে তড়াগটি বেশ জলপূর্ণ ছিল তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ইহার সহিত দু'একটি ঝরণার সংযোগ ছিল, কিন্তু মিরিক বাজার নির্ম্মিত হইবার সময় কোনক্রমে হয়ত সে জল প্রবাহের গতি রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় তড়াগটি জলহীন হইয়া গিয়াছে।

মিরিকের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে পানিঘাটা রোডের নিম্নে "কালীখোলা" "খেতীখোলা" নামে অতি ক্ষুদ্র দুইটি ঝরণা পাশাপাশি প্রবাহিত, যখন দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হয় তখন লোকে উক্ত দুই "খোলা" হইতে জল লইয়া আইসে।

বাজারের উত্তরপূর্ব্ব কোণে কতকগুলি লোকের বাস, তন্মধ্যে একটি গৃহের নীচতালায় "কসাইখানা"। হাটের দিন প্রাতে কসাইখানার বীভৎস্য দৃশ্য দর্শন করিলে চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়।

কসাইখানার একটু উপরে পানিঘাটা রোডের ধারে আবকারী বিভাগের একটি "পেট্রলপোষ্টে" একজন জমাদার ও চারিজন সিপাহী বাস করে। পানিঘাটা রোড দিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বামদিকে মাঠের ভিতর কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই উত্তরদিকে ছোট একটি পাহাড়ের উপর "পুলিশ পেট্রলপোষ্ট" ও দক্ষিণদিকে আর একটি পাহাড়ের উপর সুন্দর ডাকবাংলা। যখন বাংলোয় পৌঁছিলাম তখন সূর্য্যদেব পাহাড়ের অপর পারে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

নিভৃত সুখ।

-:*:-

বঁধু　তুমি কি বুঝিবে তোমার কি রূপ ?
যদি　দেখিবারে চাও আপন স্বরূপ
এস তবে আজি আমার প্রাণের
　　গভীর অন্দরে ;

সেথা　বিশ্ব আমার অপলক আঁখি
মুগ্ধ নেত্র শ্রীচরণে রাখি
যুগ যুগান্ত দেখিছে আমার
　　প্রেমিক-সুন্দরে !

সেথা　আমার গগন জলধির নীলে
শিহরি উঠিছে প্রণয় সলিলে
লেপিয়া দিয়াছে অঙ্গ তাহার
　　নীলের অঞ্জনে,

দিবস আমার পীত-অম্বর
জড়ায়েছে তার তনু সুন্দর ;
রজনী আমার নয়নে রেখেছে
　　নয়ন রঞ্জনে !

আমার জন্ম মরণের সুর
রচিয়াছে তার পায়ের নূপুর
তাহার যুগল চরণ ঘেরিয়া
　　নিয়ত গুঞ্জরে,

আমার বুকের রক্ত লালিমা
মুছাইয়া তার পায়ের কালিমা
রক্ত রাগের রক্ত-কমল
চরণে মুঞ্জরে।

এ মোর পূর্ণ যৌবন ভার
ধন্য হয়েছে অঙ্গে তাহার
লেপিয়া রয়েছে গন্ধ আকুল
শুভ্র চন্দনে,

বুকের পুলক ঝুলন ঝোলায়
প্রণয় তাহারে গোপনে দোলায়,
চুম্বন সুধা অধরে ছোঁয়ায়
সোহাগ নন্দনে।

আমার হৃদয় তনু মন প্রাণ
বাজিতেছে তার বাঁশীর সমান
অধরের ছায় নাচিছে তাহার
প্রণয় মন্তরে,

ওগো এস' তুমি এস বন্ধু সুজন
নিভৃতে শুনাব প্রাণের কূজন
নিভৃতে দেখাব প্রেমের পূজন
নিভৃত অন্তরে।

মরণ আড়াল।

——:o:——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি একটা। দিবসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর প্রকাণ্ড পুরীটার অধিবাসীবর্গ সুপ্ত! কেবল আমরা কয়েকটি প্রাণী,—হুকুমের দাস, তখনও জাগ্রত, প্রেতপুরীর পাহারায় নিযুক্ত! বন্ধনের উপর বন্ধন, অবরোধের উপর অবরোধের ব্যবস্থা করিয়াও প্রভুদের সোয়াস্তি নাই—পাহারার উপর পাহারা,—প্রহরে প্রহরে অনুসন্ধান, হাঁক ডাক। বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই কাহারও প্রতি; সাধ্য নাই কাহারও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া একপদ অগ্রসর হয়; অন্যের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে, কথাবার্ত্তা বলে, শাসন এখানে এমনি কড়া! এমনি কঠিন নিয়মে সকলই বাঁধা! সে নিয়ম পালনে প্রাণ যায় আর থাকে, তাহা দেখিবার নিয়ম নাই, আছে কেবল পদে পদে নিয়ম ভঙ্গের অপরাধ, আর তাহার জন্য বিনা বিচারে অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন! মন বলিয়া যে কোন বস্তু এখানকার আভশপ্ত অধিবাসীদের থাকিতে পারে, তাহা কর্ত্তাদের ধারণার অতীত। মানুষ এখানে এতই তুচ্ছ, এমনি হেয়! পশুর অধম! পশুর প্রভুরও প্রাণ আছে, পালিত জীবের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টি আছে, দয়ামায়া আছে! এ প্রেতপুরীর প্রভুদের আনন্দই পরপীড়নে,—দলিয়া পিষিয়া 'কাজ' লওয়াই ইহাদের পরম ও চরম লক্ষ্য! এ হেন নরকের পাহারা আমরা, নিজ মুখে আত্মপরিচয় দিবার 'মুখ' আছে কি! ছি! ছি! নিজের অবস্থা ভাবিতে নিজেই লজ্জায় মরিয়া যাই। হৃতনামা নম্বরের ছাপে পরিচিত হতভাগ্য আমরা! আমাদের আবার পরিচয়! আমাদের জীবন-কথা আবার বলিবার! বলিলে শুনেই বা কে, কে'ই বা তাহার বিচার করে! আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কে অন্যের চক্ষে নিজকে হেয় অপরাধী করিবে! বাঙ্গলায় ত তেমন কাহাকেও দেখি না। যে বাঙ্গালী গৃহের পরমাত্মীয়ার সত্য মিথ্যা কলঙ্ক-কথা কোন প্রকারে প্রচারিত হইলে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে, প্রত্যয় নাও হয় যদি তথাপি বিনা বিচারে সতীকে পরিত্যাগ করিতেও

পারান্মুখ হয় না, সে দেশে আমাদের মত নরকবাসীর জীবন-কাহিনীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া অপরাধ নিরপরাধের নির্দ্ধারণ কে করিবে! বিচারে অবিচারে, ন্যায় বা অন্যায়ে যে ভাবেই হ'ক না কেন, এ রৌরবে একবার নিক্ষিপ্ত হইলেই সে ব্যক্তি বিচার আচারের বহির্ভূত মানুষের সহানুভূতির অতীত, তাহার সুখ শান্তি, ধর্ম্মাধর্ম্মের চিরসমাধি, মানুষ তখন প্রেত, নরের ত্রাস—সমাজের কলঙ্ক! মনুষ্যসমাজ হইতে তখন তার প্রাপ্য কেবল লোকলজ্জা, তীব্র ঘৃণা, আর এই দোর্দণ্ড প্রতাপ নরকের প্রভুদের হস্তে অসহ্য তাড়না! আজ নয় বৎসর আমি এই নরকে! ওগো! এখন আর ও-সকল ঘৃণা টিট্‌কারীকে ভয় করি না; অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ও-সমস্ত বহু পূর্ব্বেই মানিয়া লইয়াছি। জীবনের সুকুমার বৃত্তি, মনুষ্যোচিত প্রবৃত্তি অনেক দিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন আমি এই নরকের বিকট আনন্দেই সুখী, এ পশু-জগতের পাশবিক কার্য্যকলাপে কৃতিত্ব দেখাইয়া আমার এই নারকীয় জীবনে, নারকীয় বিধানে প্রমোশন,—উন্নতি হইয়াছে। আমি প্রেত হইতে প্রেতের পাহারার পদে উন্নীত হইয়াছি। দিবসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, রাত্রে সটান দাঁড়াইয়া জাগরণ—তবুও অন্যের তুলনায় আমি সুখী, গণ্যমান্য! প্রভুদের পায়ের পয়জারের ধূলার অধম হইলেও দুর্ব্বলের উপর আমার অসীম প্রতাপ,—কণামাত্র স্বাধীনতাহীন জীবনে পরপীড়নের স্বাধীনতা লাভেও এত আনন্দ! ললাটের কলঙ্কের টীকা,—রৌরবের চিহ্ন আমার এখন গৌরবের! এখনও কি মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে আমি কে? কোথায়? সে স্থানে পাছে পতিত হইতে হয় বলিয়া, তোমরা সাধুজন সর্ব্বদা ভীত,—কোন গুরুতর অপকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সে স্থানের নাম একবার স্মরণে না আসিয়া যায় না,—স্মরণ মাত্র ভয়ে ত্রাসে ঘৃণায় মানুষ কুকর্ম্ম হইতে ঘুরিয়া দাঁড়ায় সেই স্থানে এই গভীর রাত্রে একা—প্রাণহীন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত পাহারায় আমি নিযুক্ত! পরিচয় প্রমাণ আমার কার্য্যেই,—আর ভনিতায় ঢাকিয়া কি করিব—লজ্জায় "ল" জীবনে আছে যে লজ্জা করিব! অপরাধী আমি—জেলের কয়েদী আমি—প্রেতের প্রেত পাহারা কন্‌ভিক্ট-ওয়ার্ডার! ওয়ার্ডারীতে সুখের সীমা নাই,—দিনে খাটিয়াছি—রাত একটা—শরীর অবসাদে ভাঙ্গিয়া আসিতেছে—তবুও, তখনও 'ডিউটী' দিতেছি,—পশুর অধম পরাধীন নই কি আমরা!

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া "বিপদের ঘণ্টা" বাজিয়া উঠিল ! বিপদ ! এ মহা বিপদসঙ্কুল স্থানে নতুন করিয়া বিপদ আর কি হইতে পারে ! এ বিপদ অধিবাসীবর্গের ব্যক্তিগত বিপদ নহে—তাহা ত এখানে নিত্য ব্যাপার,—গ্রাহের মধ্যেই নয় তাহা প্রচারের যোগ্য নয়—গোপন করিবার। এ বিপদ সাধারণের,—সকলের—জেলটায় -তাই এ ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি,—বিপদের প্রচার। সঙ্গে সঙ্গে গোলগোল "আগুন আগুন" চীৎকার ! জেলের কোন স্থানে তাহা হইলে আগুন লাগিয়াছে ! চাহিয়া দেখিলাম চট-গুদামের দিকটা আলোকে উদ্ভাসিত ! তাহা হইলেই হইয়াছে ! চট-গুদামের পার্শ্বেই রেশ্রীবীজের গুদাম, তাহাতে আগুন লাগিলে আর রক্ষা নাই ! বাঁধা পশুর মত কক্ষরুদ্ধ কত কয়েদীকে পুড়িয়া তা' হইলে প্রাণ হারাইতে হইবে ! মানুষ মরিবে তবুও ইহারা কখনও এতগুলি কয়েদীকে এত রাত্রে কক্ষের বাহিরে ছাড়িয়া দিতে সাহসী হইবে না।

একবার মনে হইল আগুন নিভাইতে ছুটি ! এরূপ বিপদে ওয়ার্ডারের সে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কি করিয়া কক্ষরুদ্ধ এতগুলি কয়েদীকে ছাড়িয়া পলাই,—জানি না কখন কোন নিয়মের কোন ব্যাখ্যা,—হয়ত আমার নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগের অপরাধে অপরাধী হইলেও হইতে পারি ! স্থান পরিত্যাগ কয়েদীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ—শাস্তি তার ভয়ানক ! অধীনতা আর অপরাধ লইয়াই কয়েদীর জীবন ! সে কথা এতদিন অভ্যাস বশে বড় মনে উঠে নাই ! মন এমনই মুসড়িয়া গিয়াছে,—ধারণাই আসে নাই যেন কয়েদীর জীবন আবার অন্য প্রকার হইতে পারে ! নিয়ত আশে পাশে তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় লোককে নির্মম ভাবে নির্যাতিত হইতে দেখিয়া তাহার তুলনায় নিজকে সৌভাগ্যবানই মনে হইয়াছে। ভুলিয়াও ভাবিতে পারি নাই কত অসহায় আমরা—জীবনের আমাদের মূল্য কত কম,—ইচ্ছা অনিচ্ছা আমাদের কিছুই না। ইহারা বাঁচাইলে বাঁচি মারিলে পশুর মত মরিতে হয়, তাহাতে 'না' শব্দটি করিবার অধিকার নাই। কথা কয়টা মনে উঠিতেই শরীর শিহরিয়া উঠিল ! কি ভয়ানক ! ইহারা না ছাড়িলে এ বিপদেও আত্মত্রাণের উপায় নাই। মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াও কি মানুষ এমন পরাধীন হইতে পারে। কেন ? ভগবানের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ—সে কি কখন বুদ্ধি বিবেচনাহীন পশুতে পরিণত হইয়া এমন ভাবে প্রাণটার জন্যও পরপ্রত্যাশী ? আর না—এ নরকে আর না ! যেরূপেই হ'ক এ স্থান

পরিত্যাগ করিতেই হইবে। সংশোধনের জন্য ন্যায় বিচারক পাঠাইয়াছেন এখানে,—আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বিপদগামীকে সুপথে ফিরাইতে? বিচারক! বেশী নয় একটা দিন কয়েদী জীবন গ্রহণ করিয়া দেখ, তোমার এ সংশোধন যন্ত্র কিরূপ ভীষণ! কাজ কর্ম্মে, স্নান আহারে, এমনকি শৌচে পর্য্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া সংশোধন! সংশোধন না দ্রুত অধঃপতনের যন্ত্র যে জেল! যদি শুভ ইচ্ছায়,—অপরাধীর সংশোধন উদ্দেশ্যে এ রৌরবে নিক্ষেপ করিয়া থাক বিচারক! সে উদ্দেশ্য তোমার ব্যর্থ! তোমার শুভ ইচ্ছার মানা—ধর্ম্মাধিকরণের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলেই আমাকে এ মুহূর্ত্তেই এ নরক ত্যাগের চেষ্টা করিতে হইবে! দশটী বৎসরের জন্য এ অদ্ভুত সংশোধন আগারে পাঠাইয়াছিলে, দীর্ঘ নয়টী বৎসর তাহার অতিবাহিত, উন্নতিও হইয়াছে আমার অনেকখানি—মনুষ্য নামের অযোগ্য—প্রকৃত ই প্রেতে পরিণত হইয়াছি; রেমিশন নিয়মে আর একটি মাস পরেই আমার মুক্তি, মুক্তিই বটে কিন্তু একটা মাস কেন আর একটা মুহূর্ত্তও এ নরকে নয়, আত্ম অবস্থা মনে পড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে!

বিধাতার কৃপায় সুযোগ উপস্থিত! উপর হইতে আদেশ আসিয়াছে, দেবতার সঙ্কেত আমি অবহেলা করিব না—জীবন যায় সেও ভাল জেল পরিত্যাগ আমাকে করিতেই হইবে। এক মাস পরে মুক্ত স্বাধীন হইবার অপেক্ষায় না থাকিয়া আজই আমি জেল পলাতক দুর্দ্ধর্ষ নামে অভিহিত হইব। সে ইচ্ছা আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে, দেরী আর সহ্য হয় না—এ সুযোগ-মুহূর্ত্ত যে অধিকক্ষণ থাকিবেনা!

জেলের সমস্ত আমার জানা শুনা,—ওয়ার্ডাররূপে পুরাতন কয়েদীর কোথায় এ দিবসে যাওয়ায় বাধা নাই। আমার ওয়ার্ডের পরেই জেলের গোশালা—ডেয়ারী সেই পথে পলায়ন করা স্থির করিলাম! সঙ্কল্প স্থির, বিলম্ব নয় আর এক মুহূর্ত্ত। বাহির হইয়া পড়িলাম, আমাকে বাধা দিবার তখন কেহই ছিল না। ওয়ার্ডারগণ বিপদ স্থলে বিপদের আহ্বানে ছুটিয়া ছিল! ভগবানের নির্দ্দেশে আজ, আমার ছুটির দিন। জেলের অভ্যন্তরে প্রাচীর বহিঃপ্রাচীরের মত অত উচ্চ নয় অতিকষ্টে বারংবারের চেষ্টায় তাহা অতিক্রম করিয়া গোশালা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। গোশালার পূর্ব্ব পার্শ্বে বহিঃপ্রাচীর। গোশালার ড্রেন প্রাচীরের তলদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে লৌহ শিক

এমন ভাবে বসান যে তাহার ভিতর দিয়া লোক যাতায়াত একবারে অসম্ভব। গোশালার লৌহ রেলিং সাহায্যে ড্রেনের সে শিকগুলি সরাইয়া সেই পথে পলায়ন করিলাম!

জেলের ভিতরে তখনও আগুন জোর জ্বলিতেছে,—গোলযোগ—চীৎকার সমভাবে চলিয়াছে। জেলবাগানের দক্ষিণ দিকে পুকুর,—কয়েদীর সারি বসাইয়া তাহা হইতে বালতীতে বালতীতে জল হাতে হাতে লইয়া চটপুদামে ঢালা হইতেছে। পুকুরের দিকে উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া সমস্ত অনুমান করিয়া লইলাম। আর মুহূর্ত্তমাত্রও দেরী করা নয়! জেল প্রাচীরের বাহিরে নিশ্চয়ই পুরাতন বিশ্বাসী কয়েদী দ্বারা সারি বসান হইয়াছে,—হয়ত সেই জন্যই আমারও খোঁজ পড়িবে বা এতক্ষণ পড়িয়াছে। ছুট্, ছুট, ছুট! বাহিরে ঘোর অন্ধকার! নিকটের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না। নয় বৎসরের আঁধবাসী আমি! অন্ধ হইতামও যদি, তথাপি আমার চলাফেরার বাধা হইত না! রুদ্ধশ্বাসে জেলের বাগান অতিক্রম করিলাম! তাহার পরই একটা ছোট মাঠ,—তাহার পর লোকের বসতি। লোকালয়! মনে হইতেই প্রাণটা আঁৎকাইয়া উঠিল! আমি যে লোকালয়ে প্রবেশের অযোগ্য। এ বেশে আত্ম-গোপন সম্পূর্ণ অসম্ভব! যে দেখিবে তখনই সে এ হতভাগাকে পাকড়াইবে,—আবার জেলে নরকে পুরিবার ব্যবস্থা করিবে,—পলাতক কয়েদী,—ফেরয়ার জগতে কাহারও নিকট সহানুভূতি আশা করিতে পারে না! মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে ভয় করে!

কতক্ষণ যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছি, তাহার ধারণা নাই; সহর সীমা অতিক্রম করিয়া পল্লীপথে ছুটিতেছি,—শরীর ক্লান্ত—ঘর্ম্মে আবৃত হইয়া গিয়াছে, তীরের মত ছুটিবার প্রবৃত্তি আমাকে তখনও পরিত্যাগ করে নাই। পথ বিপথের জ্ঞান নাই, কেবল সম্মুখ দিকে দৌড়াইতেছি! ক্রমে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম; জানি এ রাস্তা গোঁসাইগঞ্জ হইয়া 'ম' সহরে গিয়াছে! গতি রোধ করিলাম! এখন যাই কোথায়!

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে! অন্ধকার! প্রিয়তম বন্ধু আর ঘণ্টাখানেক জোর আমাকে তোমার মসীময় বক্ষে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে! তারপর! আমার উপায়! আবার সেই জেলে,—সেই নরকে—তবে আর হইল কি! কেন ভগবান! তাহা হইলে আমার বক্ষে কেন স্বাধীনতার মাদকতা ঢালিয়া দিলে? একমাস পরেই ত আমি জেলের

বাহির হইতে পারিতাম,—সে সময়টা পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে কেন দিলে না প্রভু ! জেলে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করিবার জনাই কি? না—কিছুতেই তাহা নহে,—কতবার ওয়ার্ডাররূপে কার্য্যসরবরাহে একা জেলের বাহিরে আসিয়াছি, তখন ত পলায়নের প্রবৃত্তি মনে জাগে নাই, আজকার এ পলায়নে তোমার ইঙ্গিত নিশ্চয় আছে দেবতা।

মনটা একটু হাল্কা বোধ করিলাম।

ভোর হইয়া আসিয়াছে। শাখীতে বসিয়া বিহঙ্গকুল সুস্বরে নির্জ্জন মাঠ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে! সে সঙ্গীতেও স্বাধীনতার সুর—অবাধ উন্মুক্ত জীবনের গৌরব-গাথা! সে সুমধুর সুর আমাকে মুগ্ধ করিল—কিন্তু শান্তি দিতে পারিল না! স্বাধীনতা! সে যে আমার জীবনে স্বপ্নাতীত স্বপ্ন।

এখন কি করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল হওয়া যায় সেই ভাবনায় আমি অস্থির! আলোক তোমাতে পুলোক, পবিত্রতা কোথায়? অন্ধকার! আশ্রয় দাও আমায়।

অদূরে একটা বাবলা বন। বাবলাগাছের চতুর্দ্দিকে উলুখড় বেশ বড় বড় হইয়াছে—দিবসের জন্য তন্মধ্যে আশ্রয় লইব স্থির করিলাম। একবার মনে হইল যদি এখানেও ওরা আমার অনুসন্ধানে আসে,—কয়েদী আর বন্য জন্তু একই,—তার সন্ধান বনে হওয়াই স্বাভাবিক! ভীত হইলাম কিন্তু উপায়ান্তর খুঁজিয়া পাইলাম না,—উলুবনে উপর হইয়া পড়িয়া রহিলাম।

বেলা প্রহরে প্রহরে বাড়িয়া চলিল। খড়ের মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলে না! এক একবার একটা শব্দ হয়, আর মাথা একটু উঁচু করিয়া খড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখি—ব্যাপার কি! ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে সাহসে কুলায় না! মনে যত আশঙ্কা—পদে পদে সন্দেহ! অসহ্য কষ্টে, উদ্বেগে দিনটা প্রায় কাটিয়া গেল! সন্ধ্যা হয় হয়—একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম,—মোটর সাইকেলের শব্দ! শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল। যাক্—এমন সময় সাধ্য নাই ও-সাইকিলিষ্টের আমাকে আবিষ্কার করে! তবুও মাটীর সহিত মিশিয়া আত্ম-গোপন করিলাম—সাবধানের মার নাই।

'ফট্ ফট্ ফটাস্'—একটা বিকট শব্দ হইয়া শব্দের শেষ! আমার বুঝিতে বাকী থাকিল না—ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল,—নিশ্চয় সাইকেলের দফা রফা!

সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে গোপন-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, উলু খড়ের মধ্যে নিজকে লুক্কায়িত রাখিয়াই মাথা তুলিয়া দেখি—আমার অনুমান সত্য!—সাইক্লিষ্ট ভদ্রলোকটি চাকায় নতুন টায়ার পরাইতে পরাইতে গলদঘর্ম্ম হইতেছেন!

ভয় বলিয়া বস্তু আমার প্রথম জীবনে ছিল না। অবস্থা আমাকে এরূপ কাপুরুষ করিয়াছে! ভদ্রলোকটির অবস্থা দেখিয়া মনে হইল—গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করি। পলাতক কয়েদী আমি, সে ইচ্ছার সার্থকতা কি! লোকটা পাছে আমাকে ধরাইয়া দেয়! মানুষে বিশ্বাস আমি হারাইয়াছি—জানি, জগতের কেহই আমাকে বিশ্বাস করিবে না—আমিও নিঃসঙ্কোচে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না!

মনটা কিন্তু মানিল না, মনে যে তখন স্বাধীনতার হাওয়া—যতটুকুই হ'ক—আসিয়া লাগিয়াছে—মনুষ্যত্বকে—পরোপকার প্রবৃত্তিকে আর কি তখনও ঠেলিয়া দূরে রাখা চলে! তাও যদি না হইল তবে জেল ভাঙ্গিয়া এ পলায়নের মূল্য কি—কি সার্থকতা!

মস্তক উত্তোলন করিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া লইলাম—লোকটি হৃষ্টপুষ্ট হইলেও আমা অপেক্ষা বলিষ্ঠ নয়,—এই দ্বিতীয়-জন-হীন প্রান্তরে আমার অনিষ্ট করিবার সাধ্য ওর একার নাই।

ধীরে ধীরে রাস্তার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। অকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশাকেই সাহায্য করতে পারি কি?"

যুবকটি মুখ তুলিয়া চাহিলেন—এক গাল হাসিয়া বলিলেন—"ভালো ভালো—বন্ধু তুমি এখানে! সহর যে তোমার খোঁজে তোলপাড়! জেলে আগুন তোমার না কি কীর্ত্তি! যা'হোক্ কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে এক জন তুমি! সরকারী জেলে লঙ্কাকাণ্ড যে সে কথা!"

বলিলাম "সে আলোচনাটা না হয় পরেই হবে—ধরিয়ে দিতে হয় ধরিয়ে দেবেন—সন্ধ্যা যে হয়ে এল—টায়ারটা বদলান একা ত সহজ নয়।

যুবক মাথা নাড়িয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, সে হাস্য পুরা পাঁচ মিনিট—তার পর আমার হাতটা টানিয়া ধরিয়া ঝাঁকির পর ঝাঁকি দিয়া বলিলেন "ঠিক ঠিক—টায়ারটার বিধি-ব্যবস্থা হতে আর বাধা কি! দুই-দুইটা জোয়ান মরদ থাকতে তা'তে আর

মুস্কিল দেখছি না—মুস্কিল-আশান—সব ব্যবস্থাই আগে হতে করে রাখা হয়েছে! নতুন টায়ার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে—সাহায্যকারীও মিলেছে—বস্!"

আমি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলাম—"তারপর।"

তিনি বলিলেন—"তারপর—পলায়ন! না—তোমার জেলে ফিরে গিয়ে অন্য একটা কাণ্ড বাধাবার ইচ্ছে আছে?"

বলিয়া উঠিলাম—"বিলক্ষণ! ধরিয়ে দেবেন না কি? তালই ত!"

"চাকাটা ধর ত আগে,—তারপর দেখা যাবে কোন্‌টা, ভাল,—কোন্‌টা মন্দ!"

মিনিট পনেরর মধ্যে সাইকেলটা মেরামত হইয়া গেল। যুবক সাইকেলে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "এবারে সাইড্‌কারে ঝাঁ করে উঠে বসো ত বন্ধু। যতটুকু এগিয়ে দিতে পারি!"

দ্বিধা তখনও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। মনের কথা রহস্যচ্ছলে ব্যক্ত করিয়া বলিলাম—"কোন দিকে? কারে ওঠা মানে ত মশায়ের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।"

যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "বলিহারি দাদা, নৈলে কি জেলে একদম লঙ্কাকাণ্ড!—সেখানে সীতাও নেই, সরমাও নেই, নিছক রাবণের দরবার। তাদেরও দাগা দিয়ে এসেছ বাবা—তুমি করবে আত্মসমর্পণ! তা হলে বল যাচ্ছ না??"

পলায়নের এ সুযোগটা ছাড়িয়া দেব,—কিছুতেই নয়, বলিলাম "যাব না বল্‌তে গেলাম কেন! চল্‌তে হবেই,—বলেছেন এগিয়ে দেবেন—পেছনে না ফেরেন সেই সন্দেহ হওয়াটা এ অবস্থায় আমার অস্বাভাবিক নয়।

যুবক তখনি হাসিয়া বলিলেন "বাহবা—ব্রেভো—দস্তুর মত পলিটিক্যাল পাকা চাঁদ! চটপট্ উঠে পড় দাদা—রাত হয়ে যাচ্ছে—যেতে হবে এখনো অনেকটা পথ—ফেরবার অবসর থাকলে না-হয় জেলে ঘুরে গিয়ে দেখা যেত দাদা খেলঘরটা কেমন!—এখন—"

মুখের কথা শেষ না করিয়াই যুবক আমার হাত ধরিয়া এক টানে সাইড্‌কারে তুলিয়া লইলেন। ষ্টার্ট দিয়া বলিলেন "কি ফ্যাসাদেই পড়েছিলেম যা হোক!—ভাগ্যে পথে তুমি উঁকি মেরেছিলে দাদা,—নৈলে ঝাড়া এক প্রহর নষ্ট হত ত."

তাহার বড় কোট্‌টা আমার গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "গায়ে দিয়া নাও—গরম ও আত্মগোপন দুইই হবে।"

ঘণ্টায় পনের মাইল বেগে গাড়ীখানা ছুটিয়াছে,—আর মোটার সাইকেলের যে শব্দ তাতে বেশী কথাবার্ত্তার সম্ভাবনা কমই তবুও তিনি মাঝে মাঝে হাসি তামাসা চালাইতেছিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা চলাবার পর তিনি গাড়ীর গতি কমাইয়া আমার গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিলেন "কি হে—একেবারে যে চুপচাপ—কথা কানে পৌঁছোচ্ছে না বোধ হয়,—বলছি যে—দিনমান কিছু মিলেছে কি ?"

ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করিতেছিল—কপালে হাত দিয়া বলিলাম 'এ বেশে আবার আহারের আশা! এবারে সত্যিই হাসালেন যা হোক!"

যুবক টিফিন-ক্যারিয়ার বাহির করিয়া বলিলেন "মাপ করো ভাই অন্য ধান্দায় ও-কথাটা একদম ভুলে গেছিলেম,—চট্‌পট্‌ যা আছে খেয়ে নাও,—আমার আর দরকার হবে না—আটটা, স' আটটায় পৌঁছে যায়!"

জানি না ভগবানকে না তাঁহাকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইব। বলিলাম—"জন্ম জন্মের বুঝি বন্ধু আপনি—"

আমাকে বাধা দিয়া তিনি তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যকৌতুকময় স্বরে বলিলেন—"এতই আত্মীয়তা! ঘণ্টার বহরে কুলোল না দাদা জন্ম-জন্মান্তরের দাবি—মানুষ সুবিধে পেলেই চায় জড়াতে—আমি কিন্তু চাই মুক্তি—পথের কাজ পথে মিটে গেল—বস্‌!"

সাইকেলে পূর্ণ বেগ দিয়া তিনি স্পষ্ট শিসে গান ধরিলেন। আরামের আনন্দে আমার ঘুম পাইতেছিল।

গোঁসাইগঞ্জ পৌঁছিবার মাইল দুই থাকিতে তিনি সাইকেলটা একদম থামাইয়া বলিলেন "বন্ধু! এবারে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধুত্বের যবনিকা পতনের পালা! এসে পড়েছি—নেমে পড় চট্‌পট্‌—সহরটার ভেতর এ বেশে নিশ্চয়ই যাবার প্রবৃত্তি তোমার নেই! টেলিগ্রামের তার অঘোর পক্ষে যাই হক তোমার যে বন্ধু নয় নিশ্চয়।"

সত্যই,—আমার আর বলিবার কি আছে। বিনা বাক্য ব্যয়ে কার হইতে নামিয়া পড়িলাম। বড় কোটটা খুলিয়া কারে রাখিয়া বলিলাম—"জেল-ভাঙ্গা কয়েদী জেনেও আপনার এ সৌজন্য—এমন শুনিনি কখনো—কি করে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাব।"

তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "জেল অজেল বুঝিনে দাদা,—স্থান অস্থানের বিচার জীবনে বড় করি নি—যেখানেই হ'ক যে অবস্থাতেই হ'ক মানুষ যখন মাথা তুলে থাকতে চেষ্টা করে, মানুষ মানুষ থাকতে চায়—আমার মনে হয় সে তখন নিজ স্বভাবে স্বার্থক হয়! মানুষ হবে মানুষ, ভেড়া নয়—মনে ও দেহে। সেই হিসেবেই কয়েদী জেনেও তোমায় বাঁচা দিয়েছি—যে অবস্থারই থাক মনে রেখো তুমি মানুষ—ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব—তার অপমাননা করলে মঙ্গল নেই! তবে আসি—গুড্‌নাইট।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই যুবক পুরাদমে কারে ষ্টার্ট দিলেন। নিমেষে সাইকেল দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল। শব্দ তখনও শুনা যাইতেছিল—সে শব্দ যেন দৈববাণীর মত আমার প্রাণে পৌঁছিয়া তাঁহার শেষ কথা বার বার হৃদয়বীণায় ঝঙ্কৃত করিতেছিল—মনুষ্যত্বের অবমাননায় মঙ্গল নেই।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

ঢেউ।

-:*:-

(১)

হীরামণির টুক্‌রা যত
মাথায় নিয়ে খালি,
ঢেউ নাচ্‌ছে দিয়ে তালি !
লীলায়িত রূপের নাটে
এরা চলে কোন্ সে হাটে ?
পৌছে দে' যায় ঘাটে ঘাটে
আনন্দেরি ডালি !

(২)

চল্‌ছে নিয়ে শুধু ওরা
সাঁজ সকালের গান—
আহা ! সরল ওদের প্রাণ।
কূলের থালি নিয়ে শিরে
আস্‌চে প্রাতে, আস্‌চে ধীরে ;
সন্ধ্যে বেলা দে' যায় চিরে
এম্নি হৃদয় ঢালি' !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

চয়নিকা।

আত্ম-সমর্পণ।

আজকালকার গণতন্ত্র বা ডেমোক্রাসীর যুগে এই কথাটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে যে প্রত্যেক মানুষই ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ স্বাধীন স্বতন্ত্র, অর্থাৎ তাহার থাকিবে নিজের পথে যথেচ্ছ চলিবার ফিরিবার পূর্ণ অধিকার, মুক্ত অবকাশ। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" এই আমাদের আজকালকার জীবনসাধনার মূলমন্ত্র। মানুষের সার্থকতা নিজের নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠায়, আত্ম-প্রকাশে। শিক্ষা ও দীক্ষা এই আত্ম-কর্তৃত্বকেই ফুটাইয়া তুলিবে, সমাজের গড়ন এমন ভাবে দিতে হইবে যেন মানুষ এই আত্ম-কর্তৃত্বের পথই খোলা পায়। বাহিরের, পরের দেওয়া বাঁধন—সে বাঁধন যতই সদুদ্দেশ্যমূলক হউক না কেন, মানুষ পরিণামে তাহাতে খাটো হইয়াই পড়িবে। তাই এমন কোথাও কোথাও শুনিতে পাই যে কোন বিশেষ মানুষের কথা ছাড়, ভগবানের বিরুদ্ধেও মানুষকে দাঁড়াইতে হইবে নিজের নিজত্ব লইয়া, তক্ তাঁবেদার হইয়া চলা মানুষের পক্ষে কোন ক্রমে মঙ্গলকর নয়। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই আত্ম-বশ হইয়া চলার দরুণ যদি ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতে হয় তাহাও ভাল, কিন্তু পরবশ হইয়া সমৃদ্ধিলাভ "শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ"—To reign is worth ambition though in hell.

নিজত্বের এই যে সাধন তত্ত্ব ইহার মধ্যে একটা খুব বড় সত্য আছে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে সত্যটি এখানে ঢাকা পড়িয়াছে তাহা হইতেছে এই যে স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রকৃতভাবে হইতে হইলে আগে জানা দরকার, প্রকৃত "স্ব" কি, আত্ম-কর্তৃত্বকে পাইতে হইলে আগে পাওয়া দরকার আত্মাকে। নিজের নিজত্ব খুব ভাল কথা, কিন্তু সে "নিজ" জিনিষটা কি? পশু "নিজ" অর্থ বুঝে শরীর এবং এই শরীরের দাবি দাওয়া মিটাইয়াই সে পায়, তাহার নিজের চরম চরিতার্থতা। পশু-প্রকৃতির মানুষ যে, তাহারও নিজত্ববোধ এই শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ। মানুষ শিশু অবস্থায় এবং ক্রমবিকাশের আদিমযুগে এই পশুর একান্ত দেহ ধর্ম্ম উদযাপন

করিয়াই নিজের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। তখনকার পুরুষার্থ শরীরকে বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রাখা। মানুষের এই স্তরের ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।" তারপরে যখন তাহার চেতনা একটু প্রসারিত হয়, তখন সে শরীরকে ছড়াইয়া যায়—শরীরের উপরে আছে যে প্রাণের স্তর, তাহাকেই "নিজে" বলিয়া আঁকড়িয়া ধরে। তখন ফুটিয়া ওঠে তাহার রাক্ষস-প্রকৃতি। এই প্রাণের তোড়ে পড়িয়া তাহার শত বুভুক্ষা জাগিয়া ওঠে—সে চায় বিরাট বিপুল ভোগ-বৈচিত্র্য। নূতন নূতন তৃষ্ণা তাহার মধ্যে নিত্য দেখা দিতে থাকে, যে তৃষ্ণা মিটাইবার জন্যে নূতন নূতন উপকরণ সম্ভার নিত্য সৃষ্টি করিতে থাকে। তারপরে মানুষ আরও একটু উপরে তখন উঠিয়া যায়, তাহার চেতনা পায় আর এক ধারা, যখন প্রাণ হইতে সে মনের পর্দ্দায় উঠিয়া দাঁড়ায়। এই মনকেই তখন সে নিজ-জ্ঞানে উপাসনা করে, এই মনই হয় তখন তাহার আত্মা। মনের ধর্ম্ম পাইয়া মানুষ হয় অসুর। মনের মধ্যে আসিয়া মানুষ হয় সজ্ঞান, নিজত্ব সম্বন্ধে সচেতন। প্রাণের দেহের স্তরে মানুষ চলে প্রকৃতির স্রোতে গা ভাসান দিয়া, প্রকৃতির যন্ত্র হইয়া তখন প্রাণকে ও দেহকে আত্মা বলিয়া সে বোধ করে মাত্র, একটা ভাব, তাতে জ্ঞান নাই। কিন্তু মনের আলোতে আসিয়া আত্ম-কর্তৃত্ব তাহার সজাগ হ'য়ে ওঠে—তাহার মধ্যে ফুটিয়া ওঠে অহংকার এবং এই অহংকারের শক্তি দিয়াই সে ধীর প্রকৃতিকে সমস্ত বস্তুকে নিজের বশীভূত করিতে। তাহার মন অর্থাৎ যতটুকু জ্ঞানের আলো সে পাইয়াছে তাহা নিযুক্ত করে এই অহমিকার প্রসাধনে, পরিস্ফুরণে। আমি যে একটা কিছু, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাকে সকলের—প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, নিজের একটা বিশেষ কোট আঁকিয়া লইতে হয়। অধিকার, দাবী তখনকার যুগের হয় যুদ্ধ মন্ত্র। মানুষ তখন ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কল্যাণ, অকল্যাণ, স্বর্গ, নরক, পাপ পুণ্য বিচার করে না—সে চায় কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠা, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বলিয়া সে বাস্তবিকই নিধনকে বরিয়া লইতে দৃকপাত করে না।

জগতে আজও পাশব ও রাক্ষস ধর্ম্মের যে অনেকখানি চলিয়াছে, তার পরিচয় আমাদের চোখের সম্মুখে যথেষ্টই মিলে। তবুও ইহাদের বিরুদ্ধেও যে একটা আন্দোলনের স্রোত চলিয়াছে তাহাও স্পষ্টই দেখি। কিন্তু যে বাণী এখনও অরণ্যে রোদন মাত্র, তাহা হইতেছে ঐ আসুরী ভাবকেও অতিক্রম করিয়া চলিবার আহ্বান। কারণ, দেখিতে পাই,

মানুষের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্তরে, চিন্তা জগতে যাঁহারা নূতনের আলো লইয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও অনেক স্থলে আসুরী ভাবকেই প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার করিতেছেন। স্বাতন্ত্র্য, স্বধর্ম্ম, স্বাধীনতার নামে তাঁহারা যে "স্ব"কে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন, তাহা হইতেছে অসুরের স্ব—মনের স্তরে যে আত্মা প্রকট অর্থাৎ বিদ্রোহী বিজিগীষু অহমিকা।

মানুষের আসল নিজত্ব দেহেও নয়, প্রাণেও নয়, মনেও নয়—সে নিজত্ব আরও উপরে। সে তুরীয়, নিজত্বে নিজত্ব বোধ হয় তত বড় কথা নয়, সেখানকার ধর্ম্ম বোধ হয় আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ততখানি নয়, যতখানি হইতেছে একটা বৃহৎ সমগ্রত্ব, একটা অকুণ্ঠ আত্ম-সমর্পণ, একটা পরিপূর্ণ প্রণতি (বৈদিক 'নমঃ')। অসুর ভাবের উপরে দেব-ভাব। এই দেব-ভাব অসুরের সে তীব্র সঙ্কীর্ণতা, সে বিরোধের আনন্দ নেশা, জোর করিয়া শক্তি ফলানের উৎকট চেষ্টা নাই—তাই দেব-ভাবের মানুষকে আমরা শক্তিহীন ক্লীব বলিয়া অনেক সময়ে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। কিন্তু দেব-ভাবের বিশেষত্বই এই যে এখানে স্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্ব ও পরের একটা নিবিড় মিলনের মধ্যে মনের দ্বৈত এখানে ঘুচিয়া গিয়াছে, তাই এখানকার শক্তিতে আছে একটা উদার প্রশান্ত প্রসন্ন অথচ অমোঘ সামর্থ্য। মনের অহন্তা ভূমার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকা আপনার মাথা নুয়াইয়া দিয়াছে একটা বৃহত্তর শক্তির কাছে। ক্ষুদ্রের, ব্যষ্টির যে প্রকৃত নিজত্ব, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, তাহা ক্ষুদ্র যতক্ষণ ক্ষুদ্রের মধ্যে, ব্যষ্টি যতক্ষণ ব্যষ্টির মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে পারে না। আপনাকে হারাইয়া তবে আপনার প্রকৃত "স্ব"কে স্বধর্ম্মকে লাভ করা যায়—He that findeth his life shall lose it and he that loseth his life for my sake shall find it.

এই ভাবে যে প্রকৃত স্বধর্ম্ম পাইয়াছে তাহার স্বধর্ম্মে কখন নিধন নাই, স্বধর্ম্মে তাহার পূর্ণতা সার্থকতাই নিত্য ফুটিয়া উঠিবে—অসুরেরই স্বধর্ম্মে নিধন সম্ভব, দেবতার নহে। দেবতা স্বরাট্ বটে কিন্তু সে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত একটা পরম সেবা-ভাবের উপরে। দেবতা স্বরাট্ সেই জন্যেই তিনি সেবক হইতেও কুণ্ঠিত নহেন, অসুর স্বরাট নহে বলিয়াই, জোর করিয়া স্বারাজ্য ফলাইতে চায়।

আর আমরা কর্ম্মী আর আমরা জ্ঞানী হইতে চাহিতেছি, কিন্তু কর্ম্মের উৎস আমাদের দেহের ও প্রাণের 'স্ব' ও জ্ঞানের উৎস আমাদের মনের 'স্ব'এর মধ্যে নিহিত, তাই আমাদের

জ্ঞান কর্ম্ম সঙ্কীর্ণ নিস্ফলই হইয়া চলিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানকে একটা নূতন স্তরে উঠাইয়া, একটা দিব্য সত্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার রহস্য আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। "গীতার স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" কথাটিই আমরা একান্ত করিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু ভগবানের সে সর্ব্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ সেই—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ সেই অনন্যা পরাভক্তি, যাহা জ্ঞানকে কর্ম্মকে সত্যসন্ধ ও শ্রেয়োমুখী করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লয়, যাহা অহঙ্কারের সঙ্গে একটা শাশ্বৎ অব্যয়ং পদে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার প্রসাদ যতদিন না পাইতেছি ততদিন আমরা আমাদের যথার্থ ও স্বাতন্ত্র্য পাইব না, ততদিন আমাদের সকল চেষ্টা সকল সাধনা বিফল।

বিজলী।　　　শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

ফুলশয্যা।

চল্লিশটাকা মাইনের কেরাণী কন্যাকে একটু শিক্ষিতা করে তুলেচেন। মেয়েটি বাংলা বেশ শিখেছে। মাইনর পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়েছে। পাড়াগাঁয়ে অর্দ্ধশিক্ষিত বরের হাতে দিলে পাছে রাজযোটক না হয়; তাই ভেবে ভিটেখানি পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে এক আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট বরকে তিন হাজার টাকা নগদ দিয়ে তিনি কন্যা সম্প্রদান করলেন।

বরপ্রবর মেয়েটির শিক্ষার বিষয় শুনেছেন, কিন্তু সঙ্গীতে তার জ্ঞান আছে কিনা, তাই পরীক্ষার জন্য ফুলশয্যার রাত্রে নিভৃতে' পত্নীকে একখানি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। পত্নী একটু দূরে সরে বসলেন। তখন বর বল্লেন—"ছিঃ ছিঃ, লেখাপড়া শিখেও তুমি লজ্জার বাধ ভাঙ্তে পারলে না! আমি যে শিক্ষিতা, সঙ্গীত-কুশলা ওয়াইফ্ চেয়েছিলুম! মানসী আমার, এস কাছে এস। একটি গান গাও।" বর পত্নীর হাত চেপে ধরলেন। দুহিতার হিতাকাঙ্ক্ষী পিতার সর্ব্বস্বাপহারী পতিপরমগুরুর অনুরোধে পত্নী গাইলেন:—

তুমি প্রভু, আমি দাসী,
　আমি স্ত্রী তুমি স্বামী।

(যেহেতু) তোমার বাবা মহাজন আর
আমার বাবা আসামী।

মুখে বলেন বেয়াই বেয়াই,
অমে কিন্তু দেন নি রেহাই
তাঁর মুখে মধু অন্তরে বিষ,
ব্যবহারে চাষামি।

অন্ন নাই মোর বাপের ঘরে
(তবুও) এলাম কত গয়না পরে
আমার ভাইরা খাবে ভিক্ষা করে,
না হয় করবে গোলামী।

পেয়েছিলে উচ্চশিক্ষা,
শ্বশুরকে করাতে ভিক্ষা,
এই হৃদয়ে গর্ব্ব কর,
বল—এম-এ, বি-এ পাশ আমি।

ছি ছি পরের পয়সায় করতে স্ফূর্ত্তি!
শ্বশুরের কাছে কাবলী মূর্ত্তি!
সাহেবদের চরণ ধরে
বলবে "প্রভু, দাস আমি।"

গান শুনে পতি দেবতার চক্ষু ছানাবড়া। পত্নীকে বল্লেন "আমাদের তোমার বাপের শত্রু মনে করে আমাদের ঘরে এলে! তবে তো তুমি আমায় ভক্তি করতে পারবে না।"

পত্নী কাতর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"কেন পারব না? খুব পারব। প্রহ্লাদ তাঁর পিতৃশত্রুকে এমন কি তাঁর পিতৃহন্তাকে উপাস্য দেবতা বলে ভক্তি করতে পেরেছিলেন আর আমরা পারব না? তোমাদের হিন্দুকুলকামিনী আমরাও এক একটি প্রহ্লাদ। পিতাকে

যাঁরা সর্ব্বস্বান্ত করেন, তাঁকে যারা ঠ্যাঙ্গে মেরে ফেলেন তাঁরাই আমাদের গুরু, পতি পরম গুরু। শাস্ত্র দূরে থাক্ নিত্য-ব্যবহার্য্য চিরুণীতে, সেফ্‌টীপিনে পর্য্যন্ত সে নজীর বেরিয়েছে।"

বর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—"যাক্ ওসব কথা। তোমার গলাটি কিন্তু বড় মিষ্টি, আর একটি ভাল গান শোনাও।"

পত্নী আবার গাইলেন :—

আমরা কলির প্রহ্লাদ,
প্রভু আমরা কলির প্রহ্লাদ।
পিতৃ শত্রু মোদের গুরু,
তাঁর আহ্লাদেই আহ্লাদ।
প্রভু আমরা কলির প্রহ্লাদ।
পিতৃহন্তা মোদের গুরু,
মোদের প্রেমের কল্পতরু
গুরুর গুরু পরম গুরু
শ্বশুর মশাই জল্লাদ।
প্রভু আমরা কলির প্রহ্লাদ।

পত্নীর গান শুনে পতি গালে হাত দিয়ে বসলেন—বাহির থেকে বন্ধুর দল হাততালি দিল।

"বিজলী"

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত।

মোগল-সন্ধ্যা।

কুশীলবগণ

পুরুষ।

বাহাদুর শাহ	মোগল সম্রাট।
জাহান্দার শাহ	মোগল সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
আজীম	,, ২য় পুত্র।
জাহান	,, ৩য় পুত্র।
ফরোকসিয়ার	আজীম পুত্র।
অজিতসিংহ	মারবার রাজ।
অমরসিংহ	মেবারের রাণা।
জয়সিংহ	অম্বরাধিপতি।
রাজসিংহ	মারবারস্থ সামন্তরাজ।
চিন্‌কালিচ খাঁ	সম্রাটের প্রধান অমাত্য।
জুলফিকার খাঁ	ঐ প্রধান সেনাপতি।
রুস্তমদিল খাঁ	আজীমের অধীনস্থ সেনাপতি।
হামিদ খাঁ	মনসবদার।
হোসেন আলি খাঁ	বাংলার শাসনকর্ত্তা।
আবদুল্লা খাঁ	বিহারের শাসনকর্ত্তা।
প্রেমদেব	বাংলার দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী।
নসিরুদ্দিন	ফকীর।
মুজাহের	জোহেরার প্রিয় ভৃত্য।

সৈনাগণ, প্রহরীগণ, নাগরিকগণ, সেবাব্রতচারিগণ, ওস্তাদজী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লালকুমারী	পরে জাহান্দারের বেগম ইম্‌তিয়াজ।
দুর্গাবতী	অজিতসিংহের মহিষী।
লয়লা	চিনকালিচের দৌহিত্রী।
জুলেখা	আবদুল্লার কন্যা পরে সিয়ারের বেগম।
জোহেরা	লালকুমারীর বাঁদী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর দরবার কক্ষ। কাল—প্রথম রাত্রি—বাহাদুর শাহ সিংহাসনে
অর্দ্ধশায়িত; জাহান্দার, আজান, চিন্‌কালিচ্ খাঁ,
জুলফিকার খাঁ দণ্ডায়মান।

বাহাদুর। চিন্‌কালিচ্! জুলফিকার!

উভয়ে সমস্বরে। জনাব!

বাহাদুর। এই বোধহয় আমার শেষ দরবার। এই দরবার ছেড়ে সব চেয়ে বড় দরবারে হাজির হ'বার পরোয়ানা এসেছে—তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

চিন্‌কালিচ্। অনুরোধ কেন ব'লছেন্ জাঁহাপনা? বলুন আদেশ।

বাহাদুর। না, চিন্‌কালিচ্! এ আমার আদেশ নয়; মরণের পারে দাঁড়িয়ে কি আর আদেশ করা সাজে?—হোক্ না সে দিন-দুনিয়ার মালিক দিল্লীর বাদশাহ? আমার অনুরোধ রাখ্‌তে পার্বে?

জুলফিকার। বাদশা'র হুকুম তামিল ক'র্বে না এত সাহস কার হ'বে জাঁহাপনা?

বাহাদুর। রাজ্যে বিপ্লব অশান্তি ক্রমেই বেড়ে চ'লেছে। এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য, উত্তরে যার অভ্রভেদী হিমালয়, দক্ষিণে যার সিন্ধু প্রক্ষালিত লঙ্কা, পশ্চিমে রূঢ়, দীপ্ত, কঠোর আফ্‌গানিস্থান, আর পূর্ব্বে চিরশ্যামল স্নিগ্ধরূপ বঙ্গভূমি এই বিরাট সাম্রাজ্য অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করা সে কি একটা কথার কথা! জুলফিকার! শুধু তরবারির জোরে এ'কে শাসন ক'র্ত্তে গেলে প্রতি আঘাতেই এ শতধা হ'য়ে ভেঙ্গে প'ড়্বে। পিতা ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে যে বিদ্রোহানল সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত জীবনের চেষ্টাতেও তাকে নির্ব্বাপিত কর্ত্তে পারলেম না।

চিন্‌কালিচ্। চেষ্টা আপনি একটুও কম করেন নি সম্রাট! কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন এ অনিষ্টের প্রতিকার হ'ল না তখন আর ক্ষোভ করবার কি আছে, জাঁহাপনা?

বাহাদুর। ক্ষোভের কথা বলছ, চিন্‌কালিচ্‌! ক্ষোভ! সে আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত এ হৃদয় ব্যথায় ভ'রে দেবে। তুমি বুঝ্‌তে পারছ্‌ না, যে অগ্নি দেশে জ্বলে উঠ্‌ছে তাতে এ মোগল সম্রাজ্য অচিরেই ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।—যাক্‌ যা বলতে যাচ্ছিলাম, তৈমুর বংশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমার মৃত্যুর পর জাহান্দারেরই দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্য। কিন্তু আমি আজ আজিমকেই সিংহাসন দিয়ে যেতে চাই—জানিনা আমার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা।

জুলফিকার। জাঁহাপনা! আমার হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত আপনার আদেশ পালনে ব্যয়িত হ'বে।

বাহাদুর। তোমার কথায় তুষ্ট হ'লাম জুলফিকার—আজিম বাংলার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত; আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই তাকে বসিয়ে যেতে পাল্লে বোধহয় ভাল হ'ত। কি চিন্‌কালিচ্‌! তুমি অধোমুখে নীরবে রইলে যে?

চিন্‌কালিচ্‌। সম্রাট! একটা নিবেদন আছে।

বাহাদুর। কি বলবে বল।

চিন্‌কালিচ্‌। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করার চাইতে কি মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধন মহত্তর নয়। আপনি আজ একটা ভয়ানক অমঙ্গলজনক ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন অচিরেই গৃহ বিবাদ বাধবে, চারদিক হতে আর তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগুলি সুবিধা পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌বে। অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে, রণভেরীর ভৈরব নিনাদে, আর্ত্তের কাতর কণ্ঠস্বরে দিল্লীর আকাশ ভরে যাবে। স্বর্গে বসেও এ দৃশ্য দেখে আপনি সুখ পাবেন না বাদশা'। তাই ভাবছি আপনার আদেশ পালন কোর্ত্তে পারব কি না।

বাহাদুর। (ঈষৎ বিষাদের হাস্য হাসিয়া) চিন্‌কালিচ্‌! তাই বলেছিলাম আমার অনুরোধ আছে, মরবার পথে ব'সে আর আদেশ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় নি।—অসহায় নিরুপায় দিল্লীর সম্রাট তোমাদের করযোড়ে নিবেদন জানিয়েছিল।

চিন্‌কালিচ্‌। কেন বৃথা ক্ষুব্ধ হ'চ্ছেন সম্রাট?

বাহাদুর। বৃথাই ক্ষুব্ধ হ'চ্ছি চিন্‌কালিচ্‌!—ভেবে দেখ একদিন যার চোখের ইঙ্গিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পিত হ'ত—যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে তোমার মত কত শত

চিন্‌কালিচ্‌ স্রোতমুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে গেছে—আজ তার এত অধঃপতন—এত অপমান! চিন্‌কালিচ্‌ তুমি ভেবো না যে বাহাদুর বাদশা' এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে যে সে তার প্রধান অমাত্যেরও ঔদ্ধত্য সহ্য করবে।

চিন্‌কালিচ্‌। বাদশা! আপনি ভুল বুঝেছেন। ন্যায্য কথা বলতে চিন্‌কালিচ্‌ কখনও ভয় করে নি—এখনও বলছি আমাদের গৌরবান্বিত পিতৃপুরুষেরা যে নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন যাতে ক'রে ক্ষুদ্র মোগল সাম্রাজ্য ঝড়ের মেঘের মত সমস্ত ভারতবর্ষ দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেলেছে—সে নিয়মটা মানতেই হ'বে। যে দিন হ'তে এ নিয়ম ভাঙ্গতে আরম্ভ হয়েছে সে দিন থেকে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমশঃই হীনবল হ'য়ে পড়ছে। আপনি আজ তাকে আর এক ধাপ পতনের দিকে নাবিয়ে দিচ্ছেন।—ভেবে দেখুন কথাগুলো ঠিক বলেছি কিনা।

জাহন্দার। খাঁ সাহেব! একটা বিরোধের ছায়া দেখিয়ে দিয়ে পিতার শেষ সময়টাকে কেন তিক্ত ক'রে তুলছেন? পিতা আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ—আজ মাথা পেতে আপনারও আদেশ গ্রহণ করছি। দিল্লীর সিংহাসনের চাইতে কি জগতে আর কিছুই বেশী আকাঙ্ক্ষার জিনিষ নাই! পিতা, জাহান্দার জানে আপনার ঐ সিংহাসনে বসবার যোগ্যতার দাবী একটুও কম নয়। আপনার আদেশ যাতে পালন করা হ'য় সে আমিই দেখ্‌ব।

বাহাদুর। এ বড় শক্ত কথা জাহান্দার—বড় কঠিন। (মাথা ঘুরাইয়া) কেও জাহান্!

জাহান। হাঁ, পিতা—আমায় কি কিছু আদেশ করবেন পিতা।

বাহাদুর। না কিছুই না, প্রভুত্বের ঝঙ্কার এ কণ্ঠ হতে চির নির্ব্বাসিত হয়েছে মুমূর্ষু সম্রাটের আদেশ ওষ্ঠাগ্রে উচ্চারিত হতে না হতেই ধূমের মত—বাতাসে মিশে যাবে।

চিন্‌কালিচ্‌। বাদশা' ক্ষমা করবেন।

বাহাদুর। চিন্‌কালিচ্‌! কি অপরাধ তুমি ক'রেছ যে ক্ষমা চাইছ? এ আমারই ভুল—কেন মিছিমিছি এত ভাবছি? যেদিন চোখের সামনে দূরের দৃশ্যগুলি ছায়ার মত হয়ে আসবে—কালো শেষ যবনিকা নেবে এসে সমস্ত জগতটাকে আমার চিরদিনের মত আঁধারে ডুবিয়ে দেবে—সেদিন হ'তে কোথায় বা মোগল সাম্রাজ্য আর কোথায় বা তার সম্রাট বাহাদুর শা'?

বড় ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি। আজকার মত দরবার এই শেষ।

(কুর্ণিশ করিয়া সকলের প্রস্থান)

(স্বগতঃ) আমায় দুর্ব্বল দেখে আজ সকলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাবে শিখ, রাজপুতানায় রাজপুত আর দাক্ষিণাত্যে মারাট্টা। আর কয়েকটা দিন যদি পেতুম—বৃথা আশা।

প্রায় একমাস হ'ল আজীমকে ফিরে আসবার জন্য লিখেছি, কই সেও আর এল না।

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(স্থান—দিল্লীর সেনানিবাসের তোরণ। হামিদ পায়চারি করিতে করিতে।)

হামিদ। হুসিয়ার! হুসিয়ার! খবরদার! পাহারা সব খাড়া রহ—বন্দুককা সঙ্গিনকা মাফিক, তাজকা গম্বুজকা মাফিক!

(নেপথ্যে—খাড়া হায় হুকুমদার)

ইয়াদ রাখ্‌খো, ফরসিকা নচিয়াকা মাফিক্—একদম্ খাড়া সিধা।

(নেপথ্যে—যো হুকুম মন্‌সব্‌দার)

বাস্ ব্যাটারা সব ঠিক আছে—আমি এইবার ঘাটি আগ্‌লে বসি। ফুর্ত্তি আজ এইখানেই চালাবো। এই পথ দিয়ে বিবি হর রোজ যায় আসে, পিয়ারের আসনাই এ, ঠিক এই সময়েই কি খপ্‌সুরৎ চেহারা! একদম্ কেয়াবাৎ! এইসা উমদা নয়না—বিবি দিলকা বিচ্‌মে কাটারী হানে—ছোরা মারে বাবা ছোরা মারে! আজ যা থাকে নসিবে। এইসা নয়না ঠারে বিবির জান নিকাল লেগা। ঐ কেল্লায় ঘড়ি বাজিল। এখনই সে আসবে বিবিজান।

(হামিদ গান ধরিল)

মেরা দিল্‌কা পিয়ারী—(কাশিয়া লইয়া)

মেরা দিলকা—

নাঃ সাফাই লাগ্‌ছে না—একটু জমিয়ে নিতে হ'বে।

(বোতল হইতে সুরাপান।)

(কাশিয়া লইয়া)—মেরা দিল্‌কা পিয়ারী উম্‌দা তেরা নয়না ঐযে আসছে।—দিল মেরা ঠিক হো যাও।

(জোহেরার প্রবেশ)

জোহেরা। এইটাই ত কেল্লার ফটক ব'লে মনে হ'চ্ছে—কিন্তু খবর নি কি করে?

হামিদ। এই কোন হ্যায় খাড়া রহো।

জোহেরা। এই ত একজন প্রহরী দেখ্‌ছি, দেখা যাক্—বন্দিগি জনাব।

হামিদ। সেলাম, সেলাম বিবি। এ রূপের রোসনাই জেলে এ রাতে কোথায় চ'লেছ।

জোহেরা। একটা জরুরী কাজে এসেছি, সাহেব!

হামিদ। এই কালো চোখে সুরমা টেনে, হাসির জলুসে আগুনের ফুল্‌কি ছড়িয়ে এই আঁধারে বেরিয়েছ, একটুও ভয় নেই বিবি সাহেব? ও রূপ দেখ্‌লে যে ফকিরও পাগল হ'য়ে উঠ্‌বে।

জোহেরা। সে আপনাদের মেহেরবাণী সাহেব। দয়ার চোখে ঐ রকমই দেখে থাকেন। আমি ত দেখ্‌তে একটুও ভাল নই।

হামিদ। আরে তোঃ তোঃ বিবিসাহেব! কোন কমবখৎ বেইমান এ কথা স্বীকার কর্ব্বে? চেহারা ত নয় যেন একেবারে মহরমের চাঁদ।

জোহেরা। থাক্ ও কথা সাহেব। এ আমার বড় জরুরী কাজ। আজ একমাস হ'ল ঘোরাঘুরি কচ্ছি, কিন্তু কাজ হাসিল হ'ল না। যদি মেহেরবাণী ক'রে আমায় একটু সাহায্য—

হামিদ। সাহায্য! হুকুম কর, হুকুম কর—বান্দা খেদমতে হাজির আছে।

জোহেরা। একটা কস্‌বীর এমন মান বাড়াবেন না। আমি একটা বাঁদী, আমার মনিবানীর কিবে চেহারা সাহেব! বাদশা'র হেরেমের সব চাইতে খপ্‌সুরৎ বেগমও তার দাসী হ'লে ভাগ্য মান্‌ত তিনি আমার কাজের ভার দিয়েছেন—তা যদি ক'রে দিতে পারেন—

হামিদ। বিবিসাহেব, শুধু হুকুম কর'—জান দিয়ে তা তামিল ক'র্ব।

জোহেরা। আমার বিবিসাহেবা চান যে একজন আমির-উল-ওমরাহের সঙ্গে তার মুলাকাৎ হয়।

হামিদ। আমির-উল-ওমারাহের সঙ্গে মুলাকাৎ! সে ত তুচ্ছ কথা! বাদশা'র সঙ্গে হ'লেও হামিদ খাঁ পিছ পা' হবে না।

জোহেরা। বাঁদীর গোস্তাকী মাফ হয়। হুজুর কার নাম কল্লেন—হামিদ খাঁ—হুজুরই কি হামিদ খাঁ।

হামিদ। হাঁ, বিবি; তোমার গোলাম জোসেন্ন হিম্মৎ হামিদ খাঁ।

জোহেরা। আমিও খোঁজ পেয়েছিলাম যে আপনাকে ধর্‌লে নাকি কাজ হাসিল হবে। বাঁদীর আর্জ্জি মঞ্জুর হবে কি জনাব?

হামিদ। আলবৎ, বাদশা'র সব চাইতে বড় সেনাপতি আমির-উল-মুলুক জুলফিকার খাঁ। কুছ পরোয়া নাই বিবি!

(নেপথ্যে—আঁখি ডাহিনা কর'। হুকুমদার হাজির। সেলাম বাতাও)

হামিদ। এমন জলুসের সময় এল কিনা ব্যাটা হোদ্দল কুৎকুৎ আসনাই মাটী কর্ত্তে।—বিবি তা হ'লে তুমি এস—কিন্তু আবার কখন কোথায় দেখা হ'বে?

জোহেরা। রাত্তির দুপুর উৎরে গেলে মীনা মসজিদের পেছন দেউরীর কাছে বাঁদী হাজির থাক্‌বে। যদি মেহেরবাণী হয়, যাবেন। বন্দেগি জনাব।

হামিদ। সেলাম, সেলাম বিবিসাহেব—ঠিক হাজির থাক্‌বে।

(জোহেরা একটু হাসিয়া প্রস্থান)

হামিদ। বিবি কাটা কলিজার উপর নিমক ছড়িয়ে হেসে গেল।

(নেপথ্যে জুলফিকার খাঁ—(উচ্চৈঃস্বরে) হামিদ খাঁ)

হামিদ। শালা গিধ্বর! একেবারে আতসজুবরি ছেড়ে ডাক ছাড়্‌লে!—হামিদ খা!

(নেপথ্যে জুলফিকার—হামিদ খাঁ)

হামিদ। হুজুর, হুজুর, বান্দা হাজির।

জুলফিকারের প্রবেশ।

জুলফিকার। হামিদ, আজ এ সময়ে তুমি যে এখানে পাহারায়।

হামিদ। হাঁ জনাব! পাহারাদার বেটারা কেবল ঘুঘুর মত ওড়ে আজ তাই ফাঁদ পেতে ব'সেছি।

জুলফিকার। বেশ করেছ। কিন্তু—(নিম্ন স্বরে) সম্রাটের শেষ হচ্ছে কি শুনেছ?

হামিদ। ফুরসৎ হয় নি।

জুলফিকার। সম্রাটের ইচ্ছা যে আজীম সিংহাসনে বসে। কিন্তু—

হামিদ। কিন্তু জুলফিকার খাঁ সেটা চান না?

জুলফিকার। হাঁ, রাজ্যের অসংযত শিথিল রশ্মি জুলফিকারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সে তাকে যথেচ্ছ চালাবে আপনার খেয়ালে, কখনও দ্রুত, কখনও শ্লথ,—অবাধ, অপ্রতিহত। যদি আজীম সিংহাসনে বসে—তা হবে না, কারণ, সে বুদ্ধিমান, বিদ্বান, ন্যায়পরায়ণ। তার মাথা আছে আর আছে প্রাণ। জাহান একগুঁয়ে ন্যায়নিষ্ঠ, আবার বিচক্ষণ যোদ্ধা। সেও হতে পারে না।

হামিদ। সুতরাং সম্রাট হবেন জাহান্দার। মসজিদে গিয়ে মাথা খুঁড়বেন আর জুলফিকার খাঁ সেই ফাঁকে দামামা বাজাবেন।

জুলফিকার। কিন্তু তাতেও আশঙ্কা আছে, হামিদ। ধার্ম্মিক লোক ন্যায়ের পক্ষপাতী। তবে জাহান্দারের একটা দৌর্ব্বল্য আছে। তাঁর চিত্তে দৃঢ়তা নেই। আঘাত পেলে সে নুইয়ে যায়—নদীর স্রোতের মত সে বাঁক পেলেই ঘুরে চলে। এখন চাই সেই আঘাত। নারীর রূপ আর যৌবনের ফাঁদে তাকে বন্দী করে রাখলে জুলফিকারই কাজে সম্রাট হবে। এ ভার তোমারই উপর। যদি পার এক সুবার সুবাদারী।

হামিদ। কিন্তু শাহজাদা আজীম আর জাহান এই ঈদের কোর্ব্বানী হতে রাজি হবেন কেন? সিংহাসন আম্নি ছেড়ে দেবেন?

জুলফিকার। হামিদ, জুলফিকার জীবনে শুধু একটা জিনিষ শিখেছে—সে রাজনীতি—কুট, বক্র, রূঢ়। তীরের মত সে দ্রুতগতি, তরবারির চেয়ে শক্ত তার আঘাত। বিদ্রোহের

দিবে, বিপ্লবের মত, নির্ম্মম হয়ে একটা বজ্রের আঘাতে সে তাদের আশার বিরাট সৌধচূড়ার উপরে ভূমিকম্পের বিপুল কম্পন তুলে দেবে। এক লহমায় সব ধ্বংস, চূর্ণ, দলিত করে ফেল্‌বে, তখন কোথায় আজিম—আর কোথায় জাহান। শুধু কর্ণধার হয়ে দাঁড়াবে এই জুলফিকার—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চাই তোমার সাহায্য। যদি পার আবার বলি—এক সুবায় সুবাদারী।

হামিদ। খাঁসাহেব, সেলাম। এক কিস্তিতে বাজি মাৎ। সব যোগাড় হবে। আমার জানা এক বিবি আছে—কি তার রূপ—লাখ আমীরের দৌলত তার ও রূপের কাছে তুচ্ছ। হাজার বাদশা'র শির সে চাউনীর নীচে মুচ্ছিত হয়ে যায়, আর তেমি মিঠে তার গলা। দুপুর রাতে বিবি যখন ছাদের উপর বসে গজল্ ধরে তখন বুঝ্‌লেন কিনা—

জুলফিকার। বেশ, বেশ, তাকেই যোগাড় কর।

হামিদ। কুছ পরোয়া নেই। রাত দুপুরে মীনা মস্‌জিদের পেছনে আমার অপেক্ষা কর্ব্বেন।

জুলফিকার। আচ্ছা, স্মরণ থাক্‌বে।

(জুলফিকারের প্রস্থান)

হামিদ। নসিব বাবা আমার—লাগ্‌ বি ত লাগ্ একেকবারে কোপের মুখে তাক্ মতন।

(পট নিক্ষেপণ।)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পথের গান।

শূন্য মাঠের পথ ধরি ও কে
গান গেয়ে সাঁঝে চলে
তরল মাণিক ঢেলে দিয়ে যায়
ডুবায়ে গরল জলে।
বুঝি নে তাহার স্বভাব কেমন,
জানে না কি ধন করে বিতরণ
মুকুতার মুঠি ছড়াইয়া যায়
জানি নে সে কোন ছলে

(২)

এসেছে সে সখি সুরের ধারা কি
সারা সুরলোক লুটি'
সামালিয়া হায় রাখিতে পারে না
ছাপায়ে পড়িছে টুটি'।
সত্যি কি তার কোনো হুঁস নাই
একাকী বিজনে করে রোশনাই
কেন্দে কুসুমের মেলা বসাইয়া
তরুহীন মরুতলে।

(৩)

বেদনার সাথে এত মধুরতা
কোথা সে করেছে চুরি
ভালবাসা হায় রেখে দিয়ে যায়
মরম পাষাণ খুঁড়ি'।
কবে সে কখন জোছনার রাতে
কুড়ায়ে পাইবে পথে যেতে যেতে
বিনা সূতে গাঁথা বেদনার হার
আদরে পরিবে গলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

-:০:-

রাজসাহীর কলেক্টর মিঃ মিড সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি নিজে বন্যা প্লাবিত স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রজার দুঃখ ক্লেশ নিবারণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ—রাজসাহীর প্রায় ১২০০ বর্গ মাইল প্লাবিত হইয়াছিল, উহার লোক সংখ্যা প্রায় ৭৪ ৪৩ জন। এক নওগাঁ মহকুমাতেই ২০ জন লোক বন্যায় প্রাণ হারাইয়াছে। ১৪০০ গরু মরিয়াছে; ৭৯৪০ খানি ঘর পড়িয়াছে। নওগাঁ সবডিভিসনে মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরই বেশী—মাটীর ঘরগুলি প্রায়ই ভূমিসাৎ হইয়াছে! শস্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—চারি আনা হইবে কি না সন্দেহ।

বন্যা প্রপীড়িত স্থানগুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বিগত ১৫ই নভেম্বর বঙ্গের গবর্ণর লর্ড লিটন সস্ত্রীক আমদানীঘি ষ্টেসনে আগমন করেন। বলা বাহুল্য বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমদানীঘির ষ্টেশনমাষ্টার বন্যার ধ্বংশলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে সমস্ত বর্ণনা করিতে বলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারের নবজাত সন্তানটীর মৃত্যু কাহিনী শুনিয়া গভর্ণর-মহিষী বিশেষ ভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর গভর্ণর ও লেডী লিটন সমস্ত সম্রান্ত রাজকর্মচারীসহ পদব্রজে তালশন গ্রামে প্রবেশ করেন। এই গ্রামে ৫০২ খানি গৃহের মধ্যে মাত্র ১০খানি অবশিষ্ট আছে। গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লাট সাহেব বস্তুতঃই দুঃখিত ও চঞ্চল হইয়াছিলেন, এবং গ্রাম-বাসীদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে, সহানুভূতিতে প্রজাগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। প্রজাগণের এ মহাদুঃখের আদি কারণ যেটা, সহৃদয় গভর্ণর যদি তাহা নিরাকরণে মনোযোগী হন তাহা হইলেই তাঁহার এই পরিদর্শন পরিভ্রমণ সার্থক হইবে, প্রজা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল স্মরণে রাখিবে—নতুবা মরন আকাল হইলেই অশ্রু ঢাকার যদি ছোট বড়র এ দেখা না দেখা তুল্য মূল্য।

* * *

বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে—কোচবিহারের শ্রীশ্রীমহারাণীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। তিনি সমুদ্রযাত্রায় সক্ষম হইলেই শ্রীশ্রীমহারাজ সপরিবারে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীমান্ দ্বিতীয় মহারাজকুমার ও শ্রীমতী কনিষ্ঠা মহারাজকুমারী বর্ত্তমান মাসে কোচবিহারে পৌঁছিয়াছেন।

* * *

বড়ই দুঃখের কথা—কোচবিহার ষ্টেট কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব জুডিসিয়াল মেম্বর প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, মহাশয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর এত সত্বর পরলোক

গমন করিলেন। বিগত ৯ই নভেম্বর তারিখ রাঁচীতে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তিনি ১৮৯৬ সনে সব নায়েব আহেলকার রূপে কোচবিহার এক্‌সিকিউটিভ্ সার্ভিসে প্রবেশ করেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গলায় একদিন ছিল—যখন চরকার সূতায় মেয়েদের কৃতিত্বের পরীক্ষা হইত। আসামে এখনও বালিকার কর্ম্মকুশলতা বিচারে তাঁতের সহিত তাঁতের খবর লওয়া হয়। ছোট বড় সকল অবস্থার স্ত্রী-লোককেই সেখানে তাঁতে পারদর্শিনী হইতে হয়। কোচবিহারের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহাই ছিল! মেয়ে চরকা কাটিতে না জানিলে বাঙ্গলায় নিন্দা হইত। ব্রাহ্মণ কুমারী মাত্রেই পৈতা কাটিতে শিখিত—এখন শতকরা ৮০ জন পৈতা কাটিতে জানে না।

* * *

রামগোপালপুরের অতি বৃদ্ধা রাণী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চরকায় সূতা কাটিয়াছেন। বিগত ৭ই কার্ত্তিক ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন,—তিনি এ বয়সেও গৃহকর্ম্ম রীতিমত করিতেন,—সংসারের তত্ত্বাবধান করিতেন, আহ্নিক পূজায় মগ্ন থাকিতেন অথচ চরকায় সূতা কাটাও কোন দিন বাদ যাইত না। কার্য্যে আন্তরিকতা থাকিলে এমনই হয়।

* * *

বিগত পূজায় সময় বিলাতী কাপড় কাটতি কমিয়াছিল, আবার যে সেই! সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১১ নভেম্বর পর্য্যন্ত—

কোরা কাপড়।

	১৯২২ সনে।	১৯২১ সনে।
কলিকাতা—	১৬৬০৮০০০ গজ	৮৩১৩০০০ গজ

বোম্বাই—	৪৫২০০০০ গজ	২২১৯০০০ গজ
মাদ্রাজ—	১৪৩০০০ গজ	৯০০০০০ গজ

এবং

ধোয়া কাপড়।

কলিকাতা—	১৯৮৬০০০ গজ	৩৭৭৪০০০ গজ
বোম্বাই—	২২৩৭০০০ গজ	১৫৭৮০০০ গজ
মাদ্রাজ—	১১৬৬০০০ গজ	৯৯৫৮০০০ গজ

আমদানি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বসময়ের মূল্যের হিসাবে বিলাতী কাপড়ের মূল্য শতকরা ৭০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে! অথচ বিলাতী কাপড়ের কাটতি কমে নাই। সখের চরকা অনেক গৃহেই নীরব হইয়াছে। যে কার্য্যে আন্তরিকতা অপেক্ষা হুজুক ও প্রশংসালাভের চেষ্টাই বেশী, তাহার ফল এরূপই হয়। দেশকে এ দুরবস্থা হইতে আবার টানিয়া তুলিবার একমাত্র উপায়—নিদারুণ দারিদ্র, অন্নবস্ত্রের অভাব মোচনের চেষ্টা;—চরকা, তাঁত এবং কৃষির উন্নতি আমাদের উদ্ধারের প্রধান উপায় ও অবলম্বনীয় জানিয়াও উহাদের উন্নতির জন্য শিক্ষিত সমাজের আন্তরিক অনুরাগ আজও জাগ্রত হয় নাই। সুখের বিষয় নিজেদের অসহায় অবস্থা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন,—খদ্দর প্রভৃতি মোটা কাপড় পরিধান করিবার জন্য অনেকেই প্রস্তুত এমন কি রাজা! কিন্তু তাহার উৎপন্নের দিকে চেষ্টা তেমন হইতেছে না। গৃহে গৃহে চরকা চালানের সংকল্প যে চিরস্থায়ী হইতে পারে না—তাহা একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। সকল অবস্থার লোক যে চিরদিন অন্যকার্য্য ছাড়িয়া, আমোদবিলাসের, বিশ্রামের আরাম উপভোগ না করিয়া চরকায় অধিকতর আনন্দ লাভ করিবে এ আশা করা যায় না। দুই দিনের জন্য তরুণী ধনীগৃহিণী একার্য্য সখের খাতিরে সম্পাদন করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন—চিরকাল তাঁহার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। এ শিল্পকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে যে অভাবগ্রস্ত—ইহার অনুশীলনে যাহার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইবে—তাহাকে ইহাতে সুশিক্ষিত কর,—তাহারও আয়ের উপায় হ'ক,—সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভাবও পূর্ণ হইবে। দেশের মতি ফিরিয়াছে—গতির বিধিমত ব্যবস্থা হউক।

বাঙ্গালী কি সত্য সত্যই জীবন-প্রবাহে নিমজ্জিত, আয়ুহীন হইয়া শেষ হইবে ? তাহার নিজ দেশেও সে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। সর্ব্ব সমস্যার উপরে সেই সমস্যা! অথচ এ দিকে চেতনা আছে খুব কমেরই। কলিকাতার বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—কত দ্রুত বাঙ্গালী হটিতেছে। 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশ :—

কলিকাতায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছে ও বাহিরের লোকসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। অবাঙ্গালীর সংখ্যা এমন বাড়িতেছে যে কালে কলিকাতায় তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিবে। বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতায় বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র নহে।

কলিকাতা, কলিকাতার উপকণ্ঠ ও হাওড়ার অবাঙ্গালীর সংখ্যা দেখিলে আমাদের উক্তি যে সত্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

	কলিকাতা	উপকণ্ঠ	হাওড়া
কলিকাতায় যাহাদের জন্ম	৩,০২,৭৭৬	২১,৫৯৪	৩৯ ২
২৪পরগণা হাওড়ায় জন্ম	৯৯,১২৪	১,০৫,৭১১	৯৯,৫৩৪
বঙ্গের অন্যান্য স্থানে জন্ম	১,৭৫,৬৬৪	২৫,০৫৩	২০.৯৬৯
ভারতের অন্য প্রদেশে জন্ম	৩,০৪ ১০৬	৭১২৫৩	৭৯,১২৩
ভারতের বাহিরে জন্ম	১৪০৫১	৮৭৪	৮৫১

অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা কত জন কোন স্থানের লোক তাহা পাঠ করিলে কলিকাতার প্রকৃত অবস্থা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

	কলিকাতা	উপকণ্ঠ	হাওড়া
কলিকাতায় জন্ম	৩ '৫৭	৯'৬৮	২'০১
২৪ পরগণা ও হাওড়ায় জন্ম	১০'৯২	৪৭'১১	৪৬'৩৬
বঙ্গের অন্যান্য জেলায় জন্ম	১৯'৩৫	১১'১৬	১০'৭৪
ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জন্ম	৩৪'৬১	৩১'৭৫	৪৪'.৬
ভারতের বাহিরে জন্ম	১'৫৫	০'৩৯	০'৪৩

কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে গমন করিলে মনে হয়, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী বা গুজরাটের কোন সহরে উপস্থিত হইয়াছি। কলুটোলা অঞ্চলে গেলে মনে হয় দিল্লী সহরে উপনীত হইয়াছি।

কলিকাতার যেসকল পল্লীতে খাস বাঙ্গালীর বাস ছিল, সে সকল অঞ্চলের বাড়ী ঘরও অন্য প্রদেশের লোকেরা অধিকার করিতেছে।

পাটের ব্যবসায়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের লোকেরাই রাজা ছিল। এখন পাটের ব্যবসায় মাড়োয়ারী ও ইউরোপীয়দের হস্তগত হইয়াছে, বাঙ্গালীরা দালাল হইয়াছে। কাঠের ব্যবসায় করিয়া অনেক বাঙ্গালী ধনী হইয়াছিল, এখন ষ্ট্রাণ্ড রোডে গেলে দেখা যায়, মাড়োয়ারী সে ব্যবসায় দখল করিয়াছে, বাঙ্গালীরা কোনরূপে পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষা করিতেছে।

ঠনঠনিয়াতে বাঙ্গালী মুচি চটি জুতা তৈয়ার করিত, এখন তাহা ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে, হিন্দুস্থানীরা ঐ ব্যবসায়ের কর্ত্তা হইয়াছে।

মাড়োয়ারীরা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন, জাহাজ কোম্পানী গঠন করিয়াছেন, পাটের কল ও কাপড়ের কল চালাইতেছেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট বাঙ্গালী পরাভূত হইয়াছে।

ইংরেজ ব্যবসায়ীর হৌসে আগে বাঙ্গালীরা মুচ্ছুদ্দি ছিল, এখন মাড়োয়ারী ঐ পদ দখল করিয়াছে।

বাঙ্গালী পল্লীর অনেক বাড়ী মাড়োয়ারীই কিনিয়াছে, কলিকাতা তার চারিদিকের বাগান বাটীগুলির মালিক মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীরাই হইয়াছে।

রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহাদের মানমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। রাজস্ব কমিটির সভাপদে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইলেন না, নিযুক্ত হইলেন মাড়োয়ারী বিড়লা। মাড়োয়ারীরা [illegible] কোম্পানীর কর্ত্তা হইয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভা কি মিউনিসিপ্যালিটিতে মাড়োয়ারীকে সভ্য নিযুক্ত না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকে।

লেখাপড়ার কথা ভাবিয়া দেখ। আগে প্রায় সবগুলি বিদ্যালয় বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইত। এখন মাড়োয়ারী স্কুল হইয়াছে। মাড়োয়ারীরা বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্তও হইয়াছে।

সাধারণ হিতকর কার্য্যে মাড়োয়ারী কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদের বিরাট হাসপাতাল ঘর ও মাড়োয়ারী দাতব্য সমিতি।

ব্যবসায় বাণিজ্যে যেমন, সৎকার্য্যেও তেমনি বাঙ্গালী হটিয়া যাইতেছে। সুতরাং কলিকাতায় বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস ও অন্য প্রদেশবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতায় বাঙ্গালীর প্রতাপ খর্ব্ব হইতেছে, তবু বাঙ্গালীর চৈতন্য হইতেছে না। বাঙ্গালী কর্ত্তার পদ হইতে অবনত হইয়া এখন চাকুরিয়া হইয়াছে, ক্রমে মুটে মজুর হইবে—যদি শীঘ্র তাহার আত্মবোধ না জাগে।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম।)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিষয়ক সাধন ভজন প্রণালী কিছু কিছু জানা আবশ্যক। তজ্জন্য বোধহয় এই সকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বহু প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে ধর্ম্ম সাধনের প্রধানতঃ তিনটি উপায় প্রচলিত ছিল। ইহাদিগকে সাধারণতঃ (১) কর্ম্মযোগ, (২) জ্ঞানযোগ ও (৩) ভক্তিযোগ আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে।

কর্ম্মযোগ—এই কর্ম্মযোগের মধ্যে আবার (১) বৈদিক যাগযজ্ঞাদি (২) পৌরাণিক ব্রতনিয়মাদি এবং (৩) তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপাদি—এই ত্রিবিধ অঙ্গই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গকেও এই কর্ম্মযোগেরই অঙ্গ বলা যায় (গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়)। প্রথম

কর্ম্মযোগের যে ত্রিবিধ অঙ্গ উল্লেখ করা গেল তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বিধিমার্গে থাকিয়া যাগযজ্ঞ ব্রতনিয়মাদি পালন করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করা; চিত্তশুদ্ধির পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। এমন কি মীমাংসকগণ মনে করেন যে এই কর্ম্মই একমাত্র সাধন, কর্ম্মই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া আপনা হইতে নিবৃত্তি হইয়া যায়। বোধ হয় ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গীতাতে উক্ত হইয়াছে— "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" (৪।৩৪)

সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, ও তৎপর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধা ব্যতীত যাগযজ্ঞাদি কোন কর্ম্মেই কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং ভক্তি এবং জ্ঞান কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিবার সহায়ক। এই মার্গকে প্রবৃত্তি মার্গ বলিলেই ঠিক হয়। প্রাকৃতিক যাবতীয় কার্য্যদ্বারা সুখভোগ করিয়া যখন সেই সুখ আর সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তখন চিত্ত আপনা হইতেই প্রাকৃতিক কার্য্য হইতে বিরত হয়। তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়, কারণ তান্ত্রিকেরাও নিবৃত্তিকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন। অষ্টাঙ্গযোগমার্গ প্রধানতঃ নিবৃত্তি মার্গের অন্তর্গত। এই মার্গের সাধকেরা প্রবৃত্তিকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে চান না; ইহা তাঁহাদের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্ট অঙ্গের সাধন হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায়। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥" (৩।৩৭)

"তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞাননাশনম্॥" (৩।৪১)

গীতার এই দুই শ্লোককেই ইঁহারা মূলমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করেন।

এই উভয়ের মতের মধ্যেই কতকটা সত্য নিহিত আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রবৃত্তিকে একেবারে প্রশ্রয় দেওয়া আর নিজের মৃত্যু টানিয়া আনা উভয়ই এক। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তিকে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়া কেবল নিবৃত্তির উপর খাড়া থাকা যে

কতদূর সম্ভব তাহাও বিবেচ্য। ব্রহ্মা, বিশ্বামিত্র, পরাশর এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বোধ হয় ভগবান এই উভয়ের সামঞ্জস্যের জন্যই বলিয়াছেন—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥" (৬,১৬)
"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥" (৬।১৭)

উপরে যে কর্ম্মযোগের কথা বলা হইল তাহাতে শাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম্মগুলিকেই ধরা হইয়াছে; যাগযজ্ঞাদি, এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রতাদি ইহার অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে জীব কোন কালেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।—
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" গীতা—(৩।৫)

পার্থ-সারথির মতে কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ অসম্ভব; আমরাও বলি কর্ম্ম কোন কালেই ত্যাজ্য নহে, কারণ, কর্ম্মই আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতেও আমাদের উন্নতি দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—পূর্ব্ব-তপস্যা ও বর্ত্তমান-পুরুষকার। পূর্ব্ব-তপস্যার উপর এখন আর আমাদের কোন হাত নাই, কিন্তু বর্ত্তমান পুরুষকার আমাদের করায়ত্ত। পুরুষকার দ্বারা যে দৈবকেও আমরা জয় করিতে পারি তাহার উদাহরণ হিন্দুশাস্ত্রে বিরল নহে। সাবিত্রীসত্যবানের আখ্যায়িকা ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এখন কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা লাভের জন্য যে বিবিধ উদ্যম এবং চেষ্টা তাহাকেই কর্ম্ম বলে। যদি তাহাই হয় তবে যতদিন আমরা অপূর্ণ ততদিনই আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে, যদিও অবস্থাভেদে এই কর্ম্ম বিবিধ আকার ধারণ করে, এমন কি যে কর্ম্ম এক অবস্থায় কর্ত্তব্য, তাহাই আবার উন্নত অবস্থায় ত্যাজ্য। আমরা জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগেও পরে দেখাইতেছি যে কর্ম্ম সেখানেও অপরিহার্য্য, যদিও সে কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি বা ব্রতনিয়মাদি করিবেন তাঁহাদিগকে কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে হইবে; নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে কর্ম্ম বন্ধনেরই

কারণ হয়, কখনই মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে না। কর্ম্মফল প্রকৃতির মধ্যেই আবদ্ধ, ভূলোকই হউক আর স্বর্লোকই হউক; সুতরাং কেবল তদ্দ্বারাই প্রকৃতির অতীত সেই পরম পুরুষকে লাভ করা অসম্ভব। যিনি যাহাই করুন না কেন লক্ষ্য "নারায়ণ" হওয়া উচিৎ; তাঁহারই শ্রীচরণে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ পূর্ব্বক যখন যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বিবেচিত হয় এবং মহাপুরুষগণের মতের বিরোধী না হয় সেই কর্ম্মগুলি ধীরভাবে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কারণ—কাম ক্রোধ লোভ বা উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের অবনতিই হইয়া থাকে; ঐরূপ কর্ম্ম কখনই তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক কর্ম্ম শাস্ত্রীয় কি না অর্থাৎ সেই যুগের মহাপুরুষগণের অনুমোদিত কি না ইহা বিচার পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিৎ (গীতা ১৬।২১—৪, ত্রিবিধং নরকস্যেদং…… কর্ত্তুমিহার্হসি।)

অতএব আমাদের কর্ম্ম এরূপ ভাবে হওয়া উচিৎ যেন আমাদের কৃত সমস্ত কর্ম্মগুলি শ্রীশ্রীভগবানের পূজাস্বরূপ গৃহীত হয়।—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নম্ সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্॥"

জ্ঞানযোগ—দ্বিতীয় সাধনমার্গ জ্ঞানযোগ। বহু প্রাচীন কাল হইতে বৈদিক শাস্ত্রে এই জ্ঞানযোগই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে; মধ্যযুগে ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই জ্ঞানযোগকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনের উপায় বলিয়া গিয়াছেন। (১) নিত্যানিত্য-বিবেক-জ্ঞান (২) ইহামুত্র-ফল-বিরাগ (৩) শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান ও (৪) মুমুক্ষুত্ব—এই সাধন চতুষ্টয়ই এই জ্ঞানযোগের অন্তর্গত। প্রত্যেক জীবই জন্মকাল হইতে অনিত্যকে নিত্য বলিয়া মনে করে, সংসারের যাবতীয় পদার্থের সঙ্গেই নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং দেহ, গেহ প্রত্যেক জিনিসেই সে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে। এ অবস্থায় তাহাকে একজন্মবাদী বা শূদ্র বলা যায়। পরে যখন সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে এই অনিত্যের অন্তরালে কোন নিত্য সত্য বস্তুর সত্তার অস্তিত্বের সন্ধান পায় তখন সে সদ্‌গুরুর নিকট উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে নিত্যের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে এবং

নিজের নিত্য জন্মে বা অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হয় তখন তাহাকে দ্বিজ বলা যায়। এই দুই অবস্থায় নিত্যানিত্য-বিবেক-জ্ঞানই তাহার প্রধান সাধন। বলা বাহুল্য যে নিত্য জ্ঞানের আস্বাদ পাইলেই তাহার ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকের সুখের প্রতি অনাস্থা জন্মে। তখন সে ইহামুত্র-ফল-বিরাগরূপ দ্বিতীয় সাধন প্রণালীতে অগ্রসর হয়। তৎপর শমদমাদির সাধন দ্বারা সে নিত্যের দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই তাহার আচরণও সাধারণ লোকের আচরণ হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। যে সমস্ত কর্ম্ম নিত্য-সুখের আস্বাদনের বিরোধী সে-গুলিকে তিনি স্বরূপতঃ বর্জ্জন করেন এবং যেগুলি নিত্যের সাধক সেগুলি তিনি আশ্রয় করেন; এবং লোক সংগ্রহের জন্য যদি তিনি কখন কোন কার্য্যও করিতে বাধ্য হন তাহা নিষ্কাম ভাবেই করিয়া থাকেন, কারণ সাধারণ লোক তাঁহারই আচরণ অনুসরণ করিবে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" (৩।২১)

এই অবস্থায় তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়। তৎপর যখন তিনি নিত্যেরই পুরোহিত, নিত্যেরই রক্ষক; শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা নিত্যের চিন্তায় ব্যাপৃত, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। যখন তিনি সাধন-পথে এতদূর অগ্রসর হন যে অধিকাংশ সময়ই নিজেকে বাহ্য-জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করিয়া সেই নিত্য-সত্য পদার্থে বিলীন করেন তখন সেই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় তিনি বেদ বা ব্রহ্ম। যতদিন প্রাকৃতিক দেহ থাকে ততদিন তিনি জীবন্মুক্ত; প্রাকৃতিক দেহ ধ্বংসের পর নিত্য স্বরূপে অবস্থিতি করেন।

এই সাধন-প্রণালী আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে শ্রদ্ধা কিংবা অনুরাগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না; যথা—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥" গীতা (৪।৩৮)

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" গীতা (৪।৪০)

এবং শমদমাদি কর্ম্ম ভিন্ন সিদ্ধিলাভও করা যায় না। সুতরাং যদিও যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম এ প্রণালীতে দরকার নাই সত্য তথাচ জ্ঞানের সাধন করিতে হইলে যে কর্ম্মগুলি দরকার

তাহাদের সম্পূর্ণ অপেক্ষা থাকে। অতএব ভক্তি এবং কর্ম্ম ক্রোড়ীভূত জ্ঞানমার্গই জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত।

ভক্তিযোগ—এখন ভক্তিযোগের বিষয় সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। ভক্তিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(ক) বৈধী বা সাধন ভক্তি, (খ) রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা ভক্ত্যাত্মক কর্ম্মগুলি আচরণ করিয়া যে শ্রীভগবানের ভজন তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, পরিচর্য্যা, সখ্য আত্ম নিবেদন—শ্রীমৎ প্রহ্লাদোক্ত এই নববিধ সাধনই বৈধভক্তির অন্তর্গত। এবং স্বাভাবিক প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া যে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ—তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তি পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন বৈদিক যুগে ভক্তির সাধন সম্বন্ধে বড় একটা কিছু শুনা যায় না, এমন কি প্রাচীন শাস্ত্রে ভক্তি কথাটাই পর্য্যন্ত নাই। ইহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে সত্য বলা যায় না। কারণ প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে আত্মাকে বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, জ্ঞান বা অন্য কোন সাধন প্রণালী দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; ইনি যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহারই নিকট ইঁহার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"—কঠোপনিষৎ ২।২৩

এইটি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আত্মার নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা বা কৃপা সাপেক্ষ। কোন সাধনভজনের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই কৃপাকেই পরবর্ত্তী কালে ভক্তিনামে অভিহিত করা হইয়াছে। মণ্ডুকোপনিষদেও বলা হইয়াছে—"সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি"; ইহাতে ভক্তির স্বরূপ স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে যাঁহার দেবতা এবং গুরুতে সমান ভক্তি তাঁহারই নিকট তত্ত্ব সমুদায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং ভক্তিকে একেবারে বিদেশ অঁহতে আগত অথবা দেশের ভুঁইফোঁড় বলা সমীচীন হইবে না। গীতাতেও একাদশ অধ্যায়ে

ভগবান বলিয়াছেন যে বেদ, তপস্যা, দান, যাগযজ্ঞাদি দ্বারা এই রূপ দৃষ্ট হয় না ; কেবল অনন্যা ভক্তিদ্বারাই আমার এই রূপ খ্যাত, দৃষ্ট ও অধিগত হইয়া থাকে।

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ (১১।৫৩)
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (১১।৫৪)

বেদোক্ত "নায়মাত্মা" ইত্যাদি বচন এবং গীতার এই দুইশ্লোক একত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যদিও আত্মা স্বাধীন এবং তাঁহার স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা বা কৃপা সাপেক্ষ, তথাচ ভক্তের নিকট তিনি প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারেন না। ভক্ত তাঁহার অনন্য ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাভব করিয়া থাকেন স্মৃতিতেও বলিয়াছেন "অহং ভক্ত পরাধীনঃ" "সাধবঃ হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্" ইত্যাদি ; গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (১৮।৫৫)

অর্থাৎ "আমি যৎস্বরূপ যৎস্বভাব তাহা নির্গুণ ভক্তিদ্বারাই জীব জানিতে পারেন।" এখন প্রশ্ন হইতেছে এই ভক্তির স্বরূপ কি? জ্ঞান বলিতে বুঝায় "চিদেকরসম্" (ষট্‌-সন্দর্ভ) জ্ঞান, চিৎ ও রস শব্দ শ্রুতিতে ব্রহ্ম স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। রস ও চিৎ উভয়ের পরিবর্তে জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ স্থল স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য জ্ঞান শব্দটির অর্থ প্রকরণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে বলিতেছেন—"বিদ্যা বেদন পর্য্যায়ং জ্ঞানং দ্বিবিধং। একং নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্ত্বম্ পদার্থানুভবরূপম্।" দ্বিতীয়ন্তু অপাঙ্গবীক্ষণবদ্ বিচিত্রং ভক্তিরূপামতি।" অর্থাৎ জ্ঞান দুই প্রকার বিদ্যা ও বেদন ; একটি নিমেষ শূন্য দর্শনের ন্যায় ত্বম্ পদার্থানুভবস্বরূপ এবং তৎ পদার্থপরিশুদ্ধিবিজ্ঞ নস্বরূপ ; অপরটি অপাঙ্গবীক্ষণ বা কটাক্ষ দর্শনের সদৃশ। প্রথমটি বিদ্যা বা জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি বেদন বা বিচিত্র ভক্তিরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবও

তাঁহার শিক্ষাষ্টকে প্রেমভক্তিকে "বিদ্যাবধূ" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। রস বলিতে যেরূপ সকল প্রকার রস বুঝায়—তদ্রূপ জ্ঞান শব্দে বিদ্যা বেদনরূপ উভয় বিধ জ্ঞানই বুঝাইয়া থাকে। ভক্তি জ্ঞান হইতে একবারে বিরোধী পদার্থ নহে। অথর্ব্বশিরসিতাপনী শ্রুতিতে দেখা যায়—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" পুনশ্চ "বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি।" ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া গিয়া শ্রীভগবানের চরণ দর্শন করাইয়া থাকেন, ভক্তিই ভগবদ্ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। বিজ্ঞানানন্দঘন মূর্ত্তানন্দস্বরূপ ভগবান সচ্চিদানন্দরূপ ভক্তি যোগেই অবস্থিত। স্পষ্টই এস্থলেও ভক্তির সচ্চিদানন্দরূপত্ব উল্লেখ করা হইল। মণ্ডুকো-পনিষদের উক্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল দেখা গেল। উপরোক্ত উপনিষদে ভক্তির স্বরূপ আরও স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে যথা—"ভক্তিরস্য ভজনং, তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং"—অর্থাৎ—ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার ফলকামনাশূন্য হইয়া শ্রীভগবানে মনঃকল্পনা বা মনোনিবেশরূপ ভজনকেই ভক্তি বলা হইল। উহাই আবার নৈষ্কর্ম্ম্য—অর্থাৎ মোক্ষের বা সর্ব্বপ্রকার মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। এই লক্ষণটী ঠিক প্রেম ভক্তির লক্ষণ বলা যায় না; নিষ্কাম হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ভজনকেই ভক্তি বলা হইল ইহাই বুঝায়। পূজনীয় শাণ্ডিল্য ঋষি ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলিতেছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" এখানে ঈশ্বরে গাঢ় অনুরাগকে ভক্তি শব্দে অভিহিত করা হইল। পূর্ব্বোদ্ধৃত তাপনীশ্রুত্যুক্ত "অমুষ্মিন মনঃকল্পনং" এর সঙ্গে ইহার মিল আছে বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু একটু গাঢ় অনুরাগের আভাস পাওয়া গেল। এই দুইটি একত্র করিলে দেখা যায় কামনা শূন্য হইয়া গাঢ় অনুরাগের সহিত ঈশ্বরের ভজনকে ভক্তি বলা যায়। গীতার ৯।১৪ শ্লোক হইতে পাওয়া যায়—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ় ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

এখানে দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীভগবানের কীর্ত্তন ও যজন এবং সমাহিত চিত্তে নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনাই ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইল ইহাকে সাধনভক্তি বলা যাইতে পারে। শ্রীমন্নারদ তাঁহার ভক্তিসূত্রে বলিতেছেন—"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা; অমৃত রূপাচ।"

এখানে ভক্তির স্বরূপ "প্রীতি" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। যদিও "কস্মৈ" পদে ঈশ্বরকে বুঝায় সত্য তত্রাচ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে "কস্মৈ" পদ প্রয়োগ হেতু ভক্তির স্নিগ্ধত্ব ও সুকোমলত্ব সূচিত হইল। অপরিস্ফুটভাবেই যেন প্রিয়তমের নামটি শ্রুতিগোচর হইল। কিন্তু পূজ্যপাদ দেবর্ষি নারদ তাঁহার পঞ্চরাত্ররহস্যে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন যথা:—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে উপাধি সকল পরিত্যাগ করিয়া তৎপ্রাপ্তি অভিলাষহেতু নির্ম্মলভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা যে হৃষীকেশ গোবিন্দের সেবা—তাহাই উত্তমা ভক্তি নামে অভিহিত। অতএব ইঁহার মতে শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রগাঢ় প্রীতির সহিত সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবাই ভক্তিপদবাচ্য। এই ভক্তিই অমৃতস্বরূপা। ইহা লাভ করিলে জীব আনন্দিত হয়েন, আত্মারাম হয়েন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীপাদ ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ এইরূপ করেন যথা—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

"কৃষ্ণানুভজনমিতি পাঠান্তরং।"

কেহ কেহ এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে করেন যে উক্ত গোস্বামীপাদ ইহার দ্বারা জ্ঞানের সহিত ভক্তির চিরবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। উপরে উক্ত হইয়াছে, ভক্তি ও এক প্রকার জ্ঞান বিশেষ; সুতরাং জ্ঞানের সহিত ইহার বিচ্ছেদ অসম্ভব। এখন আমরা এই শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলাদি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও অনুগতভাবে তাঁহার ভজনকে উত্তমা ভক্তি বলা হইয়াছে। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা। প্রীতি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবাই অনুভজন শব্দের অর্থ। এই সেবাও করিতে হইলে অন্য সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ স্বরূপতঃ ত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্বারা কৃষ্ণেতর বিষয়ে সম্পূর্ণ মমতাশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী তৃষ্ণাকে বলবতী রাখিয়া মমতাধিক্য বশতঃ অনুকূলভাবে যে তাঁহার ভজন বা অনুশীলন তাহাই উত্তমা ভক্তি বা প্রেম ভক্তি নামে অভিহিত করা হইল।

যে সমস্ত কর্ম্মের বা জ্ঞানের বিষয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান নহেন অথবা যেগুলি তাঁহার নিকট হইতে সাধককে দূরে লইয়া যায় সেইগুলিকে সম্যকরূপে পরিহার পূর্ব্বক ভগবদ্ ভজন করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। এজন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ত্রিবিধ কর্ম্ম স্বরূপতঃ বর্জ্জনীয়; কারণ এই সকল কর্ম্মের লক্ষ্য ঐহিক বা পারত্রিক সুখ। কর্ম্ম মাত্রই ত্যাজ্য বলা হইল না, অতএব এখানে কর্ম্ম বলিতে ভগবানের সেবাত্মক কর্ম্ম বুঝিতে হইবে না। প্রেমভক্তির বিষয় ভগবান এবং আশ্রয় ভক্ত এজন্য যে জ্ঞান, ভক্তির বা প্রীতির বিষয় হইতে আশ্রয়ের ভেদ রাখে না তাহা নিশ্চিতই বর্জ্জনীয়। পক্ষান্তরে যে জ্ঞান দ্বারা প্রেমাস্পদের স্বরূপ অধিকতর পরিস্ফুট হয় তাহা পরিহারযোগ্য হইতে পারে না। অতএব এই শ্লোকের "জ্ঞান" পদে অভেদ ব্রহ্ম জ্ঞান বুঝিতে হইবে। জ্ঞান মাত্রই বর্জ্জনীয় বুঝিতে হইবে না। ভগবদ্ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জ্ঞান ভক্তি সাধনে সহায়তাই করে। যথা—

কৃষ্ণাবাপ্তি ফলা ভক্তি রেকাত্মাত্রাভিধীয়তে।
জ্ঞান বৈরাগ্য পূর্ব্বা সা ফলং সদ্যঃ প্রকাশয়েৎ॥
(প্রেমের রত্নাবলী)

অর্থাৎ যদি এই ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ব্বিকা হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপ ফল প্রকাশিত করে।

এই ভজন অনুকূলভাবেই করিতে হইবে প্রতিকূলভাবে নহে। এজন্য সাধারণ কাম যাহার লক্ষ্য আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি, ক্রোধ বা দ্বেষ এবং ভয় এই ভক্তি সাধনের অত্যন্ত প্রতিকূল বুঝিতে হইবে। যেমন প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত বস্তুর সত্ত্বা পরিবর্ত্তনশীল উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানমার্গের সাধক নিত্যানিত্যবিবেকজ্ঞান প্রভৃতি সাধন চতুষ্টয় দ্বারা এক অখণ্ড চিন্ময় সত্ত্বার অস্তিত্ব জ্ঞানে উপস্থিত হয়েন এবং ঐ তত্ত্বকে "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" বলিয়া উপলব্ধি করেন, পরিশেষে সেই অনন্ত সত্ত্বায় নিজের সত্ত্বাকে বিলীন করিয়া নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। তদ্রূপ এই প্রাকৃতিক জগতে অবিমিশ্রিত সুখের অত্যন্তাভাব দেখিয়া অর্থাৎ সমস্ত সুখই দুঃখের নিত্য সহচর অতএব নশ্বর জ্ঞান করিয়া প্রেমভক্তির সাধক কোন অখণ্ড চিন্ময় নিত্যসুখের আধারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন এবং সাধনবলে পরিশেষে

ঐ তত্ত্বকে "জ্ঞানং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি" উপলব্ধি করেন। এই নিত্য সুখের অস্তিত্ব নিত্য সত্ত্বার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পরিণামী জগৎ হইতে আমার সত্ত্বা পৃথক ও নিত্য এই জ্ঞানেই ভক্ত সন্তুষ্ট হয়েন না। তাঁহার সাধনভজন প্রণালী তাঁহাকে ইহার উপরে লইয়া যায়। তিনি সমগ্র অদ্বয়জ্ঞান বা রসতত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক খুঁটিয়া দেখিতে চাহেন ও আস্বাদ করিতে চাহেন। এজন্য ভক্তির স্বরূপ "অপাঙ্গবীক্ষণ" বলা হইয়াছে। প্রীতিই ভক্তকে শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়া তাঁহার গুহ্যরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখান। এই ভাবে দেখিলে ভক্তিকে সর্ব্বগ্রাসিনী বলা যাইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ তাঁহার উপদেশামৃতে প্রীতির লক্ষণ করিয়াছেন:— দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণং॥

বলাবাহুল্য গুহ্যভাষণ ও গুহ্যবিষয়ের প্রশ্নই প্রীতির মুখ্য লক্ষণ। এক ভগবান ভিন্ন এই প্রাকৃত জগতে এরূপ প্রিয়তম সঙ্গীর মিলন অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন তাঁহার তৃপ্তি অসম্ভব। সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ বিশেষ রূপে বিচার করা হইয়াছে। উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা গেল যে ভক্তি আনন্দস্বরূপা এবং ভগবানকে বশ করিবার অব্যর্থ মন্ত্র। যদি তাহাই হয় ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এই স্বরূপ বুঝিতে হইলে চারি প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যথা—(১) প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা। (২) ভগবজ্‌জ্ঞানানন্দরূপ। (৩) জৈবানন্দরূপা এবং (৪) হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসাররূপা। প্রথমটি হইতেই পারে না কারণ তাহাতে শ্রীভগবানের মায়াবশ্যতা দোষ আপতিত হয়; দ্বিতীয়টিও অসঙ্গত কারণ শ্রীভগবান ভক্তের ভক্তিতেই আনন্দাধিক্য অনুভব করেন ইহাই প্রসিদ্ধ আছে; তৃতীয়টিও অসম্ভব কারণ জীব অতি ক্ষুদ্র তাহার জ্ঞানানন্দও তদ্রূপ, তদ্দ্বারা ভগবানের বশ্যতা সঙ্গত হয় না। অতএব চতুর্থ পক্ষই স্বীকার্য্য হইতেছে; অর্থাৎ হ্লাদিনী এবং সম্বিতের সারভাগই ভক্তিপদ বাচ্য। এখন এই হ্লাদিনীও সম্বিতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

বৈষ্ণব মতে শ্রীভগবান নিত্যপরাশক্তি যুক্ত। এই শক্তি বলেই তিনি সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশিত হয়েন। এই পরাশক্তি এক হইলেও ইঁহার ত্রিবিধাবৃত্তি। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে

উক্ত হইয়াছে তাঁহাতে জ্ঞান বল ক্রিয়ারূপিণী ত্রিবিধাশক্তি নিত্য বিরাজমানা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—　হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্ব সংশ্রয়ে।
হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়িনো গুণবর্জ্জিতে॥

(শ্রুত্যুক্ত বল জ্ঞান ও ক্রিয়া যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বুঝিতে হইবে।)

অর্থাৎ প্রাকৃতিক সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ তোমাতে নাই কারণ তুমি নির্গুণ বা গুণবর্জ্জিত, কিন্তু সর্ব্বাশ্রয় যে তুমি তোমাতে সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনী নাম্নী ত্রিবৃত্তিকা একা-শক্তি নিত্য বিরাজমানা। এই ত্রিশক্তির ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জীবগোস্বামী এরূপ করিয়াছেন—সদাত্মা ভগবান যদ্দ্বারা সত্তাবিশিষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়েন এবং দেশ, কাল, প্রকৃতি ও জীবকে সত্তা প্রদান করেন তাহাকে তাঁহার সন্ধিনী শক্তি বলা হয়। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা তিনি জ্ঞানবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং জীব সকলকে জ্ঞান বিশিষ্ট করেন তাহাই সম্বিৎ নামে অভিহিত। এইরূপে সেই ভগবান নিজে আনন্দ স্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা তিনি আনন্দবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং জীব সকলকে আনন্দিত করেন তাহাকে তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি বলা হয়। সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ শ্রেষ্ঠ এবং সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনী শ্রেষ্ঠ ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল জ্ঞান ও আনন্দের সারভাগই ভক্তি বা প্রেম। প্রেমের অপর আখ্যা "আনন্দচিন্ময় রস।" প্রেমের আস্বাদনও প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় না থাকিলে হয় না; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এজন্য ভক্তের সহিত ভগবানের মিলনের পূর্ব্বে ইহার প্রকাশ অসম্ভব। যেমন প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে বাৎসল্য প্রেম স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্বেও পুত্রের অভাবে ইহা প্রকাশ পায় না ইহাও তদ্রূপ। এজন্য ভগবদ্ভক্তি ঈশ্বরের শক্তি হইয়াও অপরিস্ফুটভাবে তাঁহাতে অবস্থান করেন ইহাই বুঝিতে হইবে। পরম গম্ভীর রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের তাঁহার সহিত মিলিত হইবার প্রবল তৃষ্ণা প্রযুক্ত ক্ষুব্ধ হয়েন, তখন এই প্রেমভক্তি আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের সহিত ভগবানের মিলনকার্য্য সম্পন্ন করেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে প্রেমের উদ্বোধন ও আস্বাদন জন্য ভগবান ও ভক্ত উভয়ের নিত্যসত্বার আবশ্যক। এজন্য "অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান" পরিত্যক্ত হইল এবং ভক্তির জ্ঞানবিশেষত্বও সিদ্ধ হইল। বেদান্ত সূত্রে উক্ত হইয়াছে— "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি দৃষ্টমিতি।" অর্থাৎ মোক্ষাবস্থাতেও ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্য দৃষ্ট হয়। শ্রীশুকদেব

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি ব্রহ্মানন্দানুভবী ভক্তবৃন্দ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যদি ভক্তি হ্লাদিনী-সম্বিৎসারাভূতই হয়েন তাহা হইলে ইহাতে কোন হানি হইতেছে না। বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা শ্রীভগবানকে জানা যায় সত্য কিন্তু ভগবদ্বিষয়ক প্রেম লাভ করা যায় না। কেবল সাধন-ভক্তি দ্বারাই সাধ্য-ভক্তি বা রতিপ্রেমাখ্যা ভক্তি লাভ হয়। শ্রীভগবানের সম্যক্ সেবা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে উহা অনুভব করিতে পারা যায়। এই ভগবৎ সাক্ষাৎকারও একমাত্র অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তির দ্বারা হয়, অন্য কোন সাধনের দ্বারা হয় না। অহৈতুকী অর্থে নিষ্কামা,—অব্যবহিতা, মধুধারাবৎ ব্যবধানরহিতা। এইরূপ ভক্তি লাভ হইলে ভক্ত সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য বা সাযুজ্য এই পঞ্চবিধা মুক্তি শ্রীভগবান দান করিলেও গ্রহণ করেন না। ভক্ত কেবল শ্রীভগবানের প্রেম সেবা করিয়াই সন্তুষ্ট (শ্রীমদ্ভাগবত)। অতএব শ্রীভগবানে যে প্রীতি তাহার আসন সমস্ত সাধনভজনের উপরে ইহা সিদ্ধ হইল।

এখন স্পষ্টই দেখা গেল যে ভগবৎ অনুসন্ধিৎসুজ্ঞান এবং ভগবৎ সেবাত্মক কর্ম্ম ভক্তিসাধনের অঙ্গ। এইরূপ জ্ঞানও কর্ম্ম-ক্রোড়ীভূত ভক্তিকে ভক্তিযোগ বলা যায়। কর্ম্মযোগকে প্রধানতঃ যেরূপ প্রবৃত্তিমার্গের অন্তর্গত বলা হয়, জ্ঞানযোগকে যেরূপ নিবৃত্তি মার্গের অন্তর্গত বলা হয়, সেইরূপ ভক্তিযোগকে পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "নিবৃত্তিকর্ম্মমার্গ" আখ্যা দিয়াছেন। যেমন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ প্রশ্রয় দিলে নিবৃত্তিতে পৌঁছান অসম্ভব হইয়া উঠে, পতন অবশ্যম্ভাবী হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকেও কেবল সংযমের পথে রাখিলে তাহারাও অবসর বুঝিয়া প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিবৃত্তি-মার্গ-সাধকগণের সাময়িক পতন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত কর্ম্ম ও চেষ্টা কখনই অপরিহার্য্য নহে—"অতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ"। গীতা হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে পার্থ-সারথি এই মতই প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম মাত্রেই এই মতের পরিপোষক। অবশ্য সংযমকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন বাক্যের বেগ, মনের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ যিনি সহ্য করিতে শিখিয়াছেন তিনিই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ। তাঁহারই মতে অত্যাহার (অতিবিহারও ইহার অন্তর্গত), প্রজল্প, প্রয়াস (অলসতা), নিয়মাগ্রহ (উচ্চ অঙ্গের অধিকারী হইয়া নিম্ন অঙ্গের সাধনের

প্রতি আগ্রহ) জনসঙ্গ (অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা লম্পটসঙ্গ—এক কথায় সর্ব্ব প্রকার অসৎসঙ্গ) এবং লোল্য (চিত্তচাঞ্চল্য)—এইগুলি সমস্তই ভক্তিপথের অন্তরায়। পক্ষান্তরে উৎসাহ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ধৈর্য্য, ভক্তির অঙ্গীভূত কর্ম্ম সকল, সদবৃত্তি এবং অসৎসঙ্গ স্বরূপতঃ বর্জ্জন, ভক্তিপথের অনুকূল। সুতরাং যাঁহারা ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের উপরোক্ত উপদেশাবলীর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

দান।

—ঃ০ঃ—

[তুলসীদাস]

প্রকৃতি-বন-ভবনে এল
বসন্ত সে অতিথি
রচিল স্নেহে শুষ্কপাতে
আসন তার প্রকৃতি।
হৃষ্ট তাহে অতিথি বড়
গেল সে আশীর্ব্বাদি' গো—
শোভিল সারা বনে নিমেষে
সুপল্লব ভাতি ও।

কহিছে কবি বিভল হয়ে'

মিথ্যা নহে কথা এ

দানের চেয়ে ধর্ম্ম নাহি—

দান যে নহে বৃথা হে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চরকার কথা।

১৯২১ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর এই আট মাসে কোচবিহারে বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছে ৭,৮৫,৯৩৪ টাকার, আর দেশী কাপড় আসিয়াছে ১,০১,৯৩০ টাকার। এই সংখ্যা হইতে দেখা যায় কোচবিহারে বিলাতী কাপড়ের চাহিদা এখনো খুব বেশী। কোচবিহারের যে অধিক সংখ্যক লোক বিদেশী কাপড় ক্রয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের স্বদেশের প্রতি প্রেম থাকিলেও তাহা যে গভীর তাহা মনে হয় না। এই সব লোক স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এবং বস্ত্র সমস্যা মীমাংসার ভয়ে সকল রকম আলোচনা ও আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া আছেন বলিয়া মনে হয়। Sentiment যদি ইঁহাদের প্রবল হইত তাহা হইলে এই চড়কা ও খদ্দর প্রচার আন্দোলনের দিনে, হাজার হাজার দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত সত্বেও ইঁহারা বিলাতী কাপড় ক্রয় করিতেন না। আবার

মনে হয়, এই শ্রেণীর লোক দারিদ্র্যের জন্যই হউক, ব্যক্তিগত বেশী লাভ লোকসানের হিসাব খতিয়ান্ করিয়া চলেন। কাজেই কোচবিহারের বাজারে যে কাপড় সস্তা তাহাই তাঁহারা ক্রয় করেন।

এখন প্রশ্ন এই কি করিলে এই এতগুলি লোক দেশী কাপড় কিনিতে রাজী হইতে পারে? আমার মনে হয়, চলনসই আটপহরা দেশী কাপড় যদি বাজারে বিলাতী কাপড়ের চেয়েও সস্তায় পাওয়া যায়, তাহা হইলেই এই সব লোক দেশী কাপড় কিনিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে। নচেৎ তাঁহাদের ভাবের ঘরে নাড়া দিয়া কোনও সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। দেশী আটপহরা কাপড় বিলাতী কাপড়ের চেয়েও সস্তায় দিতে হইলে, দেশী কাপড়ের কলের মালীকদের উচিত অল্প লাভে কাপড় বিক্রয় করা, কিন্তু দেখিতেছি কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে না। আমাদের দেশী কলের মালীকেরাও বিদেশী কলওয়ালাদের চেয়ে লাভের জন্য কম লোভী নহেন। এমন অবস্থায় প্রতি সহরে এবং গ্রামে চড়কা ও তাঁত প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। ঘরে চরকায় সূতা কাটিয়া স্থানীয় তাঁতীকে বানি দিয়া যদি কাপড় বুনাইয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে খুব সস্তায় কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। তখন কাপড়ের দাম পড়িবে, তুলার দাম তাঁতীর বানি, অর্থাৎ বড় জোর জোড়া প্রতি ২৸৹ দুই টাকা বার আনা। ইহার চেয়েও কমে হয়। এই হিসাবে সূতা কাটনার মজুরর ধরি নাই। কারণ চড়কায় সূতা কাটা হয় অবসর সময়ে। সূতা কাটনার মজুরী যোগ করিলেও ঐ কাপড়ের দাম বিলাতী কাপড়ের চেয়ে কম থাকিবেই। তাহার পর, এখনো যদি প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর এক কোণে চার পাঁচটী কাপাস গাছ রোপণ করেন, তাহা হইলে আগামী বৎসর হাতে বুনা কাপড়ের দাম আরও কমিয়া যাইবে। কারণ তখন গৃহস্থের সূতা কাটিবার জন্য তুলাও কিনিতে হইবে না। সূতা তো গৃহস্থালীর অবসরে গল্প করিতে করিতে কাটা হইবে। কাজেই কার্য্যতঃ কেবল তাঁতীকে কাপড় বুনিবার বানি দিলেই কাপড় পাওয়া যাইবে।

তখন পাঁচ সিকা সাত সিকা খরচ করিলেই এক জোড়া কাপড় পাওয়া যাইতে পারিবে। এই প্রথা অবলম্বন করিলেও কোচবিহারের লোক যদি হাত পা গুটাইয়া পাবনা, ঢাকা, অথবা নোয়াখালির তাঁতীর বুনা কাপড়ের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকেন তাহা হইলে, কোচবিহারের বাজারে দেশী হাতে-বুনা কাপড় বিলাতী কাপড়ের চেয়ে সস্তায় পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরাও যে ভারতে অতি সস্তায় কাপড় যোগাইবার জন্য জোট বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কোচবিহারের প্রতি গ্রামে এবং কোচবিহার সহরে চরকা ও তাঁত প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে কোচবিহারবাসী সস্তায় কাপড় পাইতে পারেন। নতুবা অন্য জেলা হইতে হাতে-বুনা কাপড় কোচবিহারে আমদানী করিয়া বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগীতা করা দুঃসাধ্য হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

(নব পর্য্যায়)
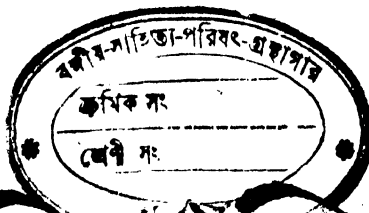
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। | পৌষ, ১৩২৯ সাল। | ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

ওপারে।

—:•:—

দেখা হবে কিনা বঁধু হে জানি না
তোমায় আমায় ওপারে
বুকে বাজে ভয় ভুল যদি হয়
অজানা দেশের আঁধারে!
কত অচেনারে করি আপনার
কত কহি কথা কত বেদনার
নয়নে নয়নে না রাখিলে যদি
ভুলে যাই চেনা সখারে
তাই বড় ভয় ভুল যদি হয়
চিনিতে তোমায় ওপারে!

তবে কিগো কথা কহিব না হেথা

অচেনা পথিকে পথিকে ?

পথে দেখা হলে চেয়ে যাব চলে

বাসিব না ভাল সাথিকে ?

পথ পাশে বসি কব দু'টি কথা

ঢেলে যাব নিতি প্রেম ব্যকুলতা

প্রাণের মাধুরী বাড়াব গো তায়

জ্বালাব প্রেমের জ্যোতিকে

পথে বসে হেথা কয়ে যাব কথা

বেসে যাব ভাল পথিকে !

ও পারের তীর ভরা কালো নীর

চির আঁধারের আড়ালে

ও পারের বাঁশী ডাকিলে গো আসি

ফিরে পাব বুকে হারালে !

কত ভালবাসা পেয়েছি তোমার

নেমে গেছে কত হৃদয়ের ভার

মোরে লয়ে কত সকট রথে

দুর্গম পথে দাঁড়ালে

এত বিনিময় ভুল কিগো হয়

চির আঁধারেরও আড়লে !

শ্রীঅজয়কুমার বসু।

দার্জ্জিলিং উকপণ্ঠে।

——:০:——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ডাকবাংলোর সম্মুখে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলাম। বাংলোটি বেশ শান্ত নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত, এবং চতুর্দ্দিকের দৃশ্যও বড় মনোরম। বাংলো হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় বার মাইল দূরে অবস্থিত কার্শিয়াং টাউনটির ঘর বাড়ীগুলি ও পাহাড়ের গায় গায় রেল লাইনটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, যেন একখানি সুচিত্রিত মনোরম ছবি!

প্রায় সাড়ে আটটার সময় খাসমহালের "মণ্ডল" "কারবারীকে" সঙ্গে লইয়া বাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাদিগের হিসাবাদি পরিদর্শন জন্য ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলাম।

এদেশে গ্রামের প্রধান মাতব্বর ব্যক্তির হস্তেই খাসমহালের আদায় তহশিলের "(মালগুজারি)" ভার ন্যস্ত থাকে, এবং অনেক বিষয়েই সরকারকে মণ্ডলের উপর নির্ভর করিতে হয়। সাধারণতঃ বিশেষ কোন কারণ বা অপরাধ ব্যতীত মণ্ডল পরিবর্ত্তন করা হয় না, এক মণ্ডলের বংশধরগণই পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এক বা ততোধিক গ্রামের মণ্ডলগিরি করিয়া থাকে। আপন আপন সুবিধা ও সাহায্যের নিমিত্ত প্রত্যেক মণ্ডল নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে ও নিজ দায়িত্বে এক এক জন "কারবারী" নিযুক্ত করে, এবং তাহারাই মণ্ডলদিগের প্রতিনিধিরূপে মহাল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করে।

বৈকালে খাসমহালের দিকে বেড়াইতে গেলাম, ফিরিবার পথে দেখিতে পাইলাম এক দল লোক ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা প্রভৃতি বাজাইয়া চড়াই পথে উঠিয়া আসিতেছে, তৎপশ্চাতে একটি বাঁশে কাপড় বাঁধিয়া এক ব্যক্তিকে "বাঁদর ঝুলান" করিয়া চারিজন লোকে বহিয়া আনিতেছে, এবং তৎপার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে আসিতেছে। সর্ব্ব পশ্চাতে আরও কতকগুলি লোক ইহাদিগকে অনুগমন করিতেছিল। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ব্যাপার কি কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম গ্রামে সেদিন

একটি বিবাহ ছিল এবং ইহারাই সেই বিবাহের বর ও বরযাত্রী। বর বেচারীর "বাঁদর ঝোলা" অবস্থা দেখিয়া হাসিও পাইতেছিল দুঃখও হইতেছিল। অন্য অবস্থায় কেহ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে স্বীকৃত হইত কি না জানি না, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বরটি বোধ হয় শুধু আত্ম-স্ত্রীলাভের আশায় বুক বাঁধিয়া নিতান্ত গোবেচারীর মত ঊর্দ্ধমুখে হস্তপদ বিস্তার করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। অশ্বারোহণে যিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন তিনি বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এদেশে চড়াই, উৎড়াই পথে একমাত্র অশ্বব্যতীত অপর কোন যানবাহনাদির সুবিধা নাই, সুতরাং বরের ভাগ্যে এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। আমি আরও অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি লোকে রুগ্ন অথবা অশক্ত স্ত্রী পুরুষকে কুলীর পিঠে করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়।

ইতিমধ্যে একটি লোক আসিয়া আমাকে বিবাহ দেখিতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল এবং তখনই তাহার সঙ্গে বিবাহ বাটীতে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। আমি পূর্ব্ব হইতেই এরূপ একটি সুযোগ খুঁজিতেছিলাম সুতরাং মৌখিক সামান্য একটু ওজর আপত্তি দেখাইয়া অবিলম্বে তাহার অনুসরণ করিলাম।

বর ও বরযাত্রিগণ বিবাহবাটীতে পঁহুছিবা মাত্রই এক ব্যক্তি একখানি থালায় করিয়া কিছু দধি ও চাউল লইয়া সম্মুখদিকে ছিটাইতে লাগিল, এবং গৃহস্বামী সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাটীর অঙ্গনে লইয়া বসাইলেন।

তৎপরে বরকর্ত্তা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়ে স্বপক্ষীয় কয়েক জন সগোত্রকে লইয়া একজন ব্রাহ্মণের সমক্ষে বিবাহ সম্বন্ধে কি কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। "দুধওয়ালী" অর্থাৎ কনের মাতার প্রার্থিত মত অর্থ বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার হস্তে অর্পণ করিলে তিনি বাগ্‌দান করেন এবং বরের অঙ্গুলিতে "সাই মুন্দ্রি" অর্থাৎ বাগ্‌দানের নিদর্শন স্বরূপ একটি অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া থাকেন।৹ বরের হস্তে একটি রৌপ্য নির্ম্মিত অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়া কনের পিতা কহিতে লাগিলেন "আজ হইতে আমার কন্যাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, এখন হইতে সে তোমার, যদি কখনও পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতে তাহার চাল চলনে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ হয় তাহা হইলে তুমি তাহাকে মাটীর হাঁড়ি যেমন লোকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে সেইরূপ করিয়া খণ্ডখণ্ড করিও।"

বাগ্‌দানই পাহাড়িয়াগণের হিসাবে প্রকৃত বিবাহ। বাগ্‌দানান্তে বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া কনের পিতা ও তাঁহার আত্মীয় আত্মীয়াগণ একে একে তাহার পদ ধৌত করিয়া দেন। ইহাদিগের সংস্কার ইহাতে বিশেষ পুণ্য অর্জ্জন হয় এবং এ নিমিত্ত সকলেই উপবাসী থাকিয়া "গোড় ধোয়ানি" ব্যাপার সমাধা হইলে পর আহার করিয়া থাকেন। বরের সম্মুখে একটি বৃহৎ তাম্রপাত্র ও অপর একটি জলপূর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তাম্র পাত্র রক্ষিত হয়। বরের পদধৌত জল বৃহৎ পাত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, দান স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ অপর পাত্রটির মধ্যে রক্ষা করা হয়। এই দানের "অর্থ" বরের পিতার প্রাপ্য সুতরাং তিনিই ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই রাত্রিতে কনের পিতা বরপক্ষকে একটি ভোজ প্রদান করেন, কিন্তু এই প্রীতি ভোজে বরের পিতাকেও নিজ গৃহ হইতে আনীত কিঞ্চিৎ দধি ও কলা নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে বিতরণ করিতে হয়।

বিবাহের সময় নিরূপণ জন্য একটি "পোলা" অর্থাৎ ঘড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ছোট একটি তাম্রপাত্র একটি জলপূর্ণ বৃহৎ তাম্র পাত্রের মধ্যে ভাসিতে ছিল, ছিদ্রপথে জলপূর্ণ হইয়া ছোট পাত্রটি যখন ডুবিয়া যাইবে তখন বিবাহের সময় উপস্থিত হইবে। যোল দণ্ডে বিবাহের সময় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পাহাড়িয়াগণ তিথি নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে মানিয়া চলে, এবং কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হইলে অথবা এমন কি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে হইলেও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা সময় নিরূপণ না করিয়া কোন কার্য্যে ব্রতী হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি হিসাব অনুসারে সময় নিরূপণ ও লগ্ন নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় তাহা বুঝিতে পারি না, অন্ততঃ এ দেশে দার্জ্জিলিংএ নক্ষত্র বিদ্যা বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের (Astrology ও Astronomy) কোনরূপ চর্চ্চা আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক আমাদের দেশে যেমন অনেক স্থলে কুল গুরু ও কুল পুরোহিতের দোহাই দিয়া কত নিরক্ষর গুরু পুরোহিত-পুত্র শিষ্য যজমান রক্ষা করিয়া বেশ দু'পয়সা উপায় করিতেছেন, ইহাও ঠিক সেই প্রকার হইবে।

"ঘোল লগণ্" ঠিক বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু ঘড়িটির অবস্থা হইতে অনুমান করিয়া লইলাম যে শেষ রাত্রির পূর্ব্বে লগ্ন হইতেই পারে না, সুতরাং গৃহস্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাংলোতে ফিরিয়া আসিলাম।

পাহাড়িয়াদিগের "রীত" (বিবাহ বিধি) দেখিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছিল, সুতরাং সমস্ত রাত্রি একরূপ বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বিবাহ বাটীতে যাইয়া হাজির হইলাম। সকলে আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, গৃহস্বামী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাকে চা পান করাইবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেলেন। শাদা পোষাক পরিয়া বর উড়ানি দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া অগ্নির সম্মুখে বসিয়াছিল, লাল রংয়ের তিন প্রস্থ পোষাক পরিয়া পাত্রীও বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। তিন-প্রস্থ পোষাক পরাইবার তাৎপর্য্য কি তাহার সন্তোষ জনক উত্তর কেহই আমাকে দিতে পারিলেন না। চারি কোণে চারি জন ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিতে ছিলেন। বরকে কোন মন্ত্র পাঠ করিতে হয় না, সে বেশ শুদ্ধ শান্ত সুবোধ বালকের মত চুপ করিয়া বসিয়া সকলের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। কয়েক মিনিট পরেই ব্রাহ্মণগণ সিঁদুর পরাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণ সকলেই বিবাহ মণ্ডপ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। "সিঁদুর হাল্লার" সময় নাকি কন্যার পক্ষের কাহাকেও সিঁদুর পরান দেখিতে নাই।

সিঁদুর পরান অন্তে "ফেরা" অগ্নি প্রদক্ষিণ ও "গঠবন্ধন গাঁঠ" আঁচলে গিরে দেওয়া হইল। ইহাদের বিবাহ বিধি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকাংশেই হিন্দু বিবাহ বিধির অনুরূপ, তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে কোন কোন স্থলে অল্প বিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। হোম যজ্ঞ ইত্যাদি শেষ হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিদায়ের পালা—সে এক বিষম ব্যাপার। যাহা হউক, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর উভয় পক্ষে একটি রফা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে সকলে আহার করিতে বসিলেন, এবং ভোজনান্তে বরযাত্রিগণ বরকন্যা লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুর্খালিদিগের সামাজিক প্রথা অনুসারে তথায় একরাত্রি বাস করিয়া বরকন্যাকে পরদিনই যে কোন উপায়ে হউক কন্যার বাটীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

আমাদের দেশে বরযাত্রিগণের অভ্যর্থনা ও সংবর্দ্ধনার জন্য কর্ম্মকর্ত্তাকে বিশেষ ভাবিত হইতে হয় কারণ বরযাত্রিগণ স্বভাবতঃই অতি সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া ভীষণ গণ্ডগোল এবং এমন কি অনেক স্থলে চিরকালের জন্যও উভয় পক্ষের মধ্যে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু পাহাড়ে বর পক্ষকেই বরাবর ভদ্র ও বিশেষ নম্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে এ দেশে কন্যার পিতাকে আমাদের দেশের দুরদৃষ্ট কন্যার পিতাগণের মত কন্যার জন্য পাত্রের অনুসন্ধানে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতে হয় না। পুত্রকন্যার বয়স সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই ইহারা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া বিবাহের "লগ্ন" স্থির করেন। পুত্রের ষোল বৎসর কি আঠার বৎসর যে বয়সে বিবাহ লগ্ন উপস্থিত হয় তাহার তিন কি চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের পিতা পুত্রের জন্য পাত্রী অনুসন্ধানে বহির্গত হন। পাত্রীর অনুসন্ধান করিয়া পুত্রের পিতা ব্রাহ্মণ ছেত্রী জাতীয় হইলে "দধি ও সুপারী" ও ঠাকুর, থাস, মংগর, গুরুং প্রভৃতি জাতীয় হইলে "দধি ও জায় নামক মদ্য" মাংগলিক নিদর্শন স্বরূপ সঙ্গে লইয়া কন্যার পিতার বাটীতে প্রার্থীরূপে আসিয়া উপস্থিত হন্।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি কন্যার পিতার সম্মুখে রক্ষা করিয়া তিনি পুত্রের জন্য পাত্রী যাচ্ঞা করেন। প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করা না করা কন্যার পিতার ইচ্ছা খেয়ালের উপর নির্ভর করে তবে ঘর, বরও বরপক্ষের কুলমর্য্যাদাদি কন্যার পিতার মনোমত হইলে, এবং উভয়েই ধর্ম্ম সম্বন্ধে একপন্থী হইলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাধা থাকে না। কন্যার পিতার অভিপ্রায় হইলে এবং কোনরূপ অপ্রতিকূল প্রতিবন্ধক না থাকিলে তিনি কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন্। পরে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাত্র পাত্রীর "লগ্ণ" মিলাইয়া "লগ্ণ" অনুকূল হইলে বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয়। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিবসে বরের বাটীতে ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হোম করিতে থাকেন, হোম অন্তে বর বরযাত্রীগণ একত্র পান ভোজন করিয়া এরূপ সময়ে যাত্রা করেন যেন "বস্তি" (marriage party) অপরাহ্নেই বিবাহ বাটীতে পৌঁছিতে পারে।

ঐদিন রাত্রিতে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে "বাগ্‌দান" ও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাগ্‌দান করিলে সে সম্বন্ধ ভঙ্গ করা সমাজের চক্ষে বড়ই দূষণীয় ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত

হয়। এ নিমিত্তই বোধহয় আজকাল আমাদের দেশের অনুকরণে অথবা এরূপ প্রথার প্রচলন সমীচীন বোধ হওয়াতে বিবাহ রাত্রিতেই "বাগ্‌দান" ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে যেমন পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইলে পরে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশে পাত্রী দেখা বা দেখান প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। পাত্রী সুশ্রী কি কুৎসিত, খঞ্জ কি অন্ধ ইহা কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বরের পিতার দেখিবার অধিকার নাই, তবে এ দেশে স্ত্রী অবরোধ প্রথার প্রচলন না থাকা নিবন্ধনই সকলেই সকলের বাড়ীর মেয়েছেলেকে হাটে বাজারে বা পথে ঘাটে কোন সময় অবশ্যই দেখিতে পাইয়া থাকেন। বিবাহ রাত্রিতে বরের পক্ষ হইতে পাত্রীকে গহনা ও বস্ত্রাদি দিতে হয়।

ইহাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপারেই বরের পিতাকে কনের পিতার ইচ্ছানুসারে চলিতে হয় এবং কোন বিষয়েই তাঁহার নিজের কোন স্বাধীন মত নাই। বিধবার আর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে না, কিন্তু বিধবা স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে অপর কোন পুরুষের পরিবারভুক্ত হইয়া তাহার সহিত স্বামীস্ত্রীরূপে বস্‌বাস করিতে পারে। এ নিমিত্ত পাহাড়ে এমন অনেক স্ত্রীপুরুষ দেখা যায় যাহাদের পিতা একজাতি ও মাতা অন্য জাতি যথা—ছেত্রী, মাতা মংগরনী, অথবা পিতা নেওয়ার মাতা ছৈত্রীণী। আমাদের দেশে এইরূপ পিতামাতার সংমিশ্রণে উদ্ভূত সন্তানগুলিকে আমরা "জারজ" বলিয়া ঘৃণা করি, এবং সমাজের চক্ষেও "জারজের" স্থান অতি নিম্নে। কিন্তু পাহাড়ে ইহাদিগকে কেহই ঘৃণার চক্ষে দেখে না কারণ তাহারা বলে যে পিতামাতার পাপের জন্য নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশু চির অভিশপ্ত জীবন যাপন করিবে ইহা কখনই ন্যায়ের বিধান হইতে পারে না। এইরূপ "খয়" সন্তানের বিবাহ "খয়" এর সহিতই হইয়া থাকে।

পাহাড়িয়াগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভাগ রহিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, তবে ব্রাহ্মণ ছৈত্রী ও সংগর গুরুং ঠাকুর খাস প্রভৃতি গুর্খালিগণের বিবাহ প্রথা একই প্রকার। সুনুয়ার, কামী (লোহার) সরকী (মুচি) প্রভৃতি জাতিরও সামাজিক আচার ব্যবহার অনেকাংশেই গুর্খালিগণের অনুরূপ। কামী, সুরকী ইহারা নিকৃষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত, এবং ব্রাহ্মণ ছৈত্রী ও গুর্খালিগণ ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

গুর্খালিগণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে অপর একটি প্রথা প্রচলিত আছে। যে বৎসরে যুবকের "বিবাহ লগ্ন" থাকে তৎপূর্ব্বে যদি কোন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া যায় তাহা হইলে উত্তম, অন্যথায় যুবক নিজেই পাত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হয়, এবং কোন যুবতীকে নানা কৌশলে তাহার মন হরণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসে। সুকীয়াপোখরি হাটে সেদিন এরূপ একটি প্রেমিক সম্পতির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।

মংগরগণ নিজেরা যে বংশে বিবাহ করে সে বংশের কোন যুবকের সহিত তাহারা কন্যা বিবাহ দিতে পারে না, কিন্তু গুরুংদিগের মধ্যে এরূপ স্থলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে কোনরূপ আপত্তি দেখা যায় না। তবে কি মংগর কি গুরুং—ইহারা নিজেরা যে বংশের সন্তান সে বংশে কেহই কন্যা দান করে না।

গুরুং জাতির মধ্যে "চারজাত" ও "শোল্হাজাত" নামে দুইটী শ্রেণী বিভাগ আছে এবং এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ কন্যা আদান প্রদান চলিতে পারে না। "শোল্হাজাত" গুরুংগণ অপেক্ষা "চারজাত" গুরুংগণ আভিজাত্য ও বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ এবং নেপালের সামাজিক নিয়ম অনুসারে "শোল্হাজাত" "চারজাতকে" সর্ব্বদাই সম্মান প্রদর্শন করিবে।

গুরুংগণের মধ্যে "গ্যালে" শ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চারজাত গুরুংগণ রাজকুমারীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া গ্যালেগণের সমান কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে বাটীতে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম তাহারা জাতিতে গুরুং এবং "শোল্হাজাত" শ্রেণীভুক্ত। কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে ভদ্রবেশধারী একটি যুবক ছিলেন, তিনি কোন একটি চাবাগানে "ছোটবাবুর" কাজ করেন। বাবুটিকে বেশ মোটামুটি শিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া গুর্খালিগণের সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিলাম। "চারজাত" ও শোল্হাজাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে এক সময়ে নেপালের "ঠাকুরে" বংশীয় জনৈক রাজা গ্যালে বংশীয় কোন এক রাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন। গ্যালে রাজ নিজ কন্যার পরিবর্ত্তে অপর একটি সুন্দরী যুবতীকে "ঠাকুরে" রাজের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ঐ সুন্দরীকে রাজ-

কন্যাজ্ঞানে বিধিমত বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। কিছুকাল পরে গ্যালে রাজের চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িলে "ঠাকুরে" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া গ্যালে রাজে নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে অবিলম্বে যদি তিনি গ্যালে রাজকুমারীকে তাঁহার হস্তে সম না করেন তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। ইহাতে গ্যাবে ভীত হইয়া ঠাকুররাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ঠাকুর রাজের ঔরসে এই রাজক গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ইঁহাদেরই বংশধরগণ "চারজাত" গুরুং খ্যাত। লামাগণের নির্দ্দেশ অনুসারে দাসীমাতার গর্ভজাত সন্তানগণ "শো নামে অভিহিত হয় এবং তাহারা চিরদিনই "চারজাতের" নিকট হীনত করিয়া চলে।

গুরুং দিগের মধ্যে "ভুতীয়া" "প্লোনিয়া" প্রভৃতি আরও কয়েকটি শাখা শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সামাজিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের মধ্যে কোনরূপ বিশেষ পার্থক্য নাই।

নেপালে গুরুংগণের বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে লামাগণই—পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যত্র ব্রাহ্মণের দ্বারাই সকল প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্ম করান হইয়া থাকে। ইহা হইতে মনে হয় যে মর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশেষ কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই।

ভদ্রলোকটির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় বারটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর অধিক কালক্ষেপ না করিয়া সত্বর বাংলোতে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

বৃন্দাবন।

-:*:-

'রাধা' 'রাধা—বলে' হেথা
বাঁশীতে বাজিত ফুঁক্,
কালিন্দীরি কালো-জলে
ভাসিত সে চাঁদমুখ!
নাচিত লহরীগুলি,
কদম শিহরি' দুলি'
ধরণে সুবাসে তীরে
ঢালিত কত না সুখ।

বাজে কি তেমনি ধারা
নূপুর এ বনময়?
আজো কি হৃদয়-চোরা
বাঁশীতেই কথা কয়?
এসেছি দেখিতে আজি
সে মধুর লীলারাজি
স্মরিয়া সে প্রেম মনে
ভুখারীর বাড়ে ভুখ

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

মোগল-সন্ধ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাংলা। আজীমের প্রাসাদ নিকটস্থ নদীতীর।

আজীম ও রুস্তমদিল খাঁ দণ্ডায়মান।

আজীম। কি সুন্দর এই বাংলা দেশ! মাথার উপরে সুনীল অনন্ত আকাশ শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে ভরে উঠেছে। দূরে সুন্দরীর বসনাঞ্চলের মত হিল্লোলিত সবুজ ধানের ক্ষেতগুলি পুলকে নেচে উঠেছে। নৃত্যনিপুনা নর্ত্তকীর যৌবন চঞ্চল-চরণ-পাতে পরিপূর্ণা নদীগুলি কোথায় যেন ছুটে চলেচে। রুস্তম, শ্রাবণের ধারা শেষ হয়ে গেছে—চেয়ে দেখ শরতের তুলির কোমল স্পর্শ মাঠে মাঠে গাছের চূড়ায় কি মোহন স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে। এই সেই ভাগীরথী—ভারতের আঁখি-বিগলিত করুণাশ্রুর অনন্ত উৎস—মা, দেখেছি—সুখের দিনে তোমার বুক সন্তানের সুখে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে, উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আবার শুনেছি—দুঃখের অমানিশায় তোমার পারে দাঁড়িয়ে নিরাশ-হৃদয়ে ক্ষীণ আশার পদ সঞ্চারের মত মৃদু, অতি মৃদু তোমার করুণ ব্যথিত সঙ্গীতের সুর। এত সহানুভূতি, এত স্নেহ নিয়ে তুমি জগতে এসেছ! তাই তুমি হিন্দুর মা, তুমি আমাদের ভারতবাসী মুসলমানেরও মা। মা! আজ তোমার নীরবতা এত অধিক কেন?

(দূরে প্রেমদেবের গান ও শিবিরের দিকে অগ্রসর।)

রুস্তম! দূর থেকে কার যেন সঙ্গীত ভেসে আসছে, না?

রুস্তম। হাঁ, শাহ্‌জাদা।

(প্রেমদেবের প্রবেশ)

(গান।)

এমহা মানব তীর্থ ক্ষেত্রে
আজি কি গাহিব গান।
গৌরবময় উজল অতীত
আজি যে হেথায় ম্লান॥

যেথা একদিন জাহ্নবী তীরে
ভাসি অবিরল প্রেমাশ্রু নীরে।
বিভল নিমাই বহাল বঙ্গে
প্রেমের পূর্ণ বান ॥

যেথা নীরব দেউল তলে
বাশুলী করুণা ফলে।
ভক্তি বিভল চণ্ডীদাস
তুলিল মোহন তান ॥

অস্ত যদিও গৌরব দিন
দুখ বিভাবরী হইবে বিলীন।
আসিবে আবার শৌর্য্য বীর্য্য
যশ ও ঋদ্ধি জ্ঞান ॥

হোমানল শিখা উঠিবে জ্বলিয়া
বন্ধন পাশ যাইবে টুটিয়া।
মুক্তির বাণী ঘোষিবে আবার
জাগাতে সুপ্ত প্রাণ।

আজীম। কি সুন্দর ভাব, আর কি সুন্দর কণ্ঠস্বর! সন্ন্যাসী তোমাদের কি সবই সুন্দর।

প্রেমদেব। হাঁ, সাহজাদা, আমার মায়ের এত রূপ—কিন্তু যে হাসির আলোকে একদিন মার মুখ সমুজ্জল ছিল, সে হাসি অনেক দিন নিবে গেছে। এই রূপ দিয়েই মা তার ভাঙ্গা হৃদয়ের ব্যথাটা আপনাদের দৃষ্টি হ'তে লুকিয়ে রেখেছেন। এই রূপ দূর হোয়ে যাক্, উষর মরুভূমিতে দেশ পরিণত হোক, দুঃখ নেই; কিন্তু আমি চাই মার মুখে হাসি দেখ্‌তে, সেই হাসি—যে হাসি ফুটে উঠে প্রভাতের আলোর মত সন্তানের সফলতায় গৌরবে। অনেক দিন হতে নিবে গেছে সেই হাসি, ঘোর আঁধার, বিচ্ছেদহীন, শান্ত, স্থির চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে।

আজীম। আজ এই জ্যোৎস্নাময় রাত্রিতে, সন্ন্যাসী তোমার এই নিরাশার সুর বেসুরা বাজছে।

প্রেমদেব। সে বাজবেই শাহজাদা। আপনারা দেখছেন শুধু বাইরের রূপটাকে। যে দৃষ্টিতে ভেতরের ছবিটাও দেখতে পাওয়া যায় সে দৃষ্টিত আপনাদের নেই তবে অন্তরের ব্যাথাটা কি ক'রে বুঝবেন? এই সাত কোটী সন্তান বঙ্গমাতার দুঃখ দৈন্যের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে চলেছে। এমন শুভদিন কি আর হবে যেদিন আমরা একাল-নিদ্রা হতে জেগে উঠ্‌ব। এক নূতন উৎসব-সঙ্গীতে আমাদের জাতীয় জীবনের নবীন প্রভাত উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে।

আজীম। বুঝেছি সন্ন্যাসী, তোমার দুঃখ কত গভীর! দেশকে তুমি বড়ই ভালবাস, দেশের দুঃখ তোমার প্রাণে বড়ই বেজেছে। মহান তুমি—তোমায় নমস্কার।

প্রেমদেব। নমস্কার, শাহজাদা।

(প্রেমদেবের প্রস্থান)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। খোদাবন্দ, বাদশার পত্র নিয়ে দিল্লী হ'তে দূত এসেছে।

আজীম। যাও, কুসুম, শীঘ্র পত্রখানা এখানে নিয়ে এস।

(কুসুমের প্রস্থান)

আজীম। অনেকদিন হতে দিল্লীর কোন খবরই পাইনি।

(কুসুমের প্রবেশ।)

(কুসুমের আজীমের হস্তে প্রদান)

কুসুম। কি শাহজাদা! খবর কি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে আপনার মুখখানা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল?

আজীম। কুসুম, পিতা মৃত্যু শয্যায় পড়ে। আমাকে আজই রওনা হতে হবে। তুমি সব প্রস্তুত কর।

(কুসুমের হস্তে পত্রদান)

আজীম। হায়! পিতার স্নেহ-সিক্ত মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব কি?

রুস্তম। (পাঠ করিয়া) শাহজাদা! আনন্দ কর্ব্ব না দুঃখ কর্ব্ব কিছুই বুঝতে পারছি না। একদিকে সম্রাট বাহাদুরশ'ার মরণাপন্ন অবস্থা আর অন্য দিকে আপনার বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার সম্ভাবনা দুটা সংবাদই এক সঙ্গে এসেছে। আমার কিন্তু আনন্দের ভাগটাই বেশী।

আজীম। রুস্তম, চুপ কর।

রুস্তম। শাহজাদা, অধীনের গোস্তাকী মাফ্ কর্ব্বেন।

আজীম। তুমি শীঘ্র যাও রওনা হবার উদ্‌যোগ কর গিয়ে।

রুস্তম। (একটু অপেক্ষা করিয়া)—কিন্তু—একটা কথা ভেবে দেখুন।

আজীম। কি কথা ?

রুস্তম। আমি ভাবছি বাদশা' খোদা না করেন আপনি যদি দিল্লীতে পৌঁছবার পূর্ব্বেই ....তবে কি ভয়ঙ্কর একটা বিশৃঙ্খলাই বাধবে, তাই সহায়সম্বলহীন হয়ে ছুটে যাওয়া এখন কতটা সঙ্গত বিবেচনা কর্ব্বেন।

আজীম। কিন্তু ভেবে দেখ রুস্তম, পিতা বোধহয় আকুল নয়নে পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন কখনও আশায়, কখনও দুরাশায়, বেদনায় তাঁর সমস্ত হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর আমি এখানে রাজ্য পাবার আশায় প্রস্তুত হতে থাকব! এই কি পুত্রের কর্ত্তব্য হবে ?

রুস্তম। আপনার পিতামহ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের কথা মনে করুন, তবেই বুঝতে পার্ব্বেন আমার আশঙ্কা একেবারে মিথ্যা নাও হতে পারে। শুধু কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর্ত্তে বলছি আমার সঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য আছে আর পাঁচ হাজার যোগাড় কর্ত্তে যতটা সময় শুধু সে'কয়টা দিন।

আজীম। তোমার পরামর্শই নিলুম। শীঘ্র আয়োজন কর।

রুস্তম। বাংলায় সৈন্য সংগ্রহ এখনও অসম্ভব হয়ে পড়েনি। অস্ত্র চালনায় অনভ্যস্ত হলেও অনেক যুদ্ধে দেখেছি, বাঙ্গালী দুষ্কর কার্য্যগুলি কৌশলে অনায়াসে সাধন করেছে।

আজীম। দেখ, রুস্তম, আমার মন বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছি। শীঘ্র কাজ শেষ কর্ব্বার চেষ্টা কর দিল্লীর দিকে শুধু আমি আর তুমি যাব।

সিরাজকে বাংলায় রেখে যাব বিশ্বস্ত হোসেন তাকে রক্ষা করবে।

রুস্তম। হাঁ, সেই ভাল শাহজাদা।

আজীম। যাও, আয়োজন কর, তিন দিনের বেশী অপেক্ষা কর্তে পারব না।

(কুর্নিশ করিয়া রুস্তমের প্রস্থান)

(পটক্ষেপন)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মেবার, জয়সমুদ্রের তীরস্থ রাজপ্রাসাদ।

রাণা অমরসিংহ, মহারাজ অজিতসিংহ ও অম্বরাধিপতি জয়সিংহ।

অমরসিংহ। মহারাজ অজিতসিংহ, অম্বরাধিপতি জয়সিংহ, আপনাদের মত পূজ্য অতিথি পেয়ে আজ নিজকে কৃতার্থ মনে করেছি।

অজিতসিংহ। আমরাও মহারাণার সাক্ষাৎ লাভ করে ততোধিক কৃতার্থ।

অমরসিংহ। হাঁ, অনেক দিন পরেই দেখা হল। সেই রাজপুতদ্রোহী ঔরঙ্গজেব বাদশা'র হাত হ'তে রাজপুত জাতির স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই জয়সমুদ্রের তীরেই "ত্রিবলাত্মিকা সন্ধি" স্বাক্ষরের জন্য সকলে মিলিত হয়েছিলাম।

জয়সিংহ। এবার কি উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছিলেন মহারাণা?

অমরসিংহ। এবারের উদ্দেশ্য অন্য রকমের। সুধু আত্মরক্ষা নয়—চাই এখন আত্ম প্রতিষ্ঠা। শুন্‌তে পেলাম সম্রাট বাহাদুরশা'র শেষ সময় এসে পড়েছে। অন্য বারের মত এবারেও বোধহয় কলুষিত ভ্রাতৃযুদ্ধে দেশ আলোড়িত হয়ে উঠ্‌বে।

অজিতসিংহ। এতে কোন সন্দেহই নেই মহারাণা! এ নিশ্চয়ই ঘট্‌বে।

অমরসিংহ। সত্য, মারবাররাজ! এ বড় আশ্চর্য্যের কথা কিন্তু। মোগল শাহজাদাদের দেহে—পিতৃ রক্তের অংশটা বোধ করি বড় কম আর বড়ই তরল। কি বলেন অম্বররাজ?

জয়সিংহ। হাঁ, ঠিক্ তাই মহারাণা।

অমরসিংহ। যে কথা বল্‌ছিলাম বাহাদুরশার জীবন অবসান প্রায়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনও একেবারে সুনিশ্চিত। বাহাদুর বাদশা' যদি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পরে না এসে আগে আস্‌তেন, তবে ভারতে মুসলমানের অবসান এত দ্রুত, এত শীঘ্র ঘট্‌তে পারত না।

অজিতসিংহ, জয়সিংহ, এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর একটা হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার কল্পনাটা আপনাদের কেমন মনে হয়। মেবার শক্তির সঙ্গে মারবার আর অম্বরের শক্তির সংমিশ্রণ হলে আমার হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন একেবারে মিথ্যা হবে না। এ বিষয়ের পরামর্শের জনাই আজ আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছি।

অজিতসিংহ। মহারাণা! আপনার সঙ্কল্প মহৎ হলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ দুরাশা মাত্র। এ ভারতে এখন হিন্দু মুসলমান এ দুটো জাত প্রবল। যে ভারত যোড়া হিন্দু সাম্রাজ্য গড়বার কল্পনা আপনি কচ্ছেন তার প্রজা এই হিন্দুও হবে মুসলমানও হবে। অধিকাংশ প্রজার শুভ ইচ্ছা বা সহানুভূতির উপর রাজ্যের কল্যাণ আর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। মোগলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হিন্দুরা সুযোগ দেখে মুসলমানকে নিগ্রহ কর্ত্তে কখনও ছাড়বে না। এখনও ভেবে দেখুন আপনার সাম্রাজ্য কি অর্দ্ধ ভারত মুসলমানের সহানুভূতি আকর্ষণ কর্ত্তে পারবে? কখনও না। তা'হলে সেও এই মোগল সাম্রাজ্যের মত আতস বাজীর খেলা খেলে কোন অসীম শূন্যে মিশে যাবে।

অমরসিংহ। তবে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? বাহাদুর শা' ছিলেন রাজপুত-মাতার সন্তান, সম্রাট শাহজাহানের মত হিন্দুহিতৈষী, এখন যিনি সম্রাট হবেন, তিনি যদি হিন্দুবিদ্বেষী হন, তা'হলে কি উপায় হবে বিবেচনা করেছেন কি?

অজিতসিংহ। এ ভারতে এখন স্থায়ীরূপে একটা সুশাসিত, সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে হলে হিন্দু ও মুসলমানকে একত্রিত করে একটা আদর্শ জাতি গঠন কর্ত্তে হবে। যে সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, সে মুসলমানেরও নয় হিন্দুরও নয়, সে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই একযোগে।

অমরসিংহ। তার জন্য আপনি কি কর্ত্তে চান?

অজিতসিংহ এই বাহাদুর বাদশারই মত একজন সুবুদ্ধি সম্পন্ন শাহজাদাকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন কর্ত্তে হবে।

জয়সিংহ। মহারাজ, আমি কিন্তু মোগলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখতে চাই না। মোগল কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, উপকার করলে পুরস্কার পাবেন গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে কিম্বা হলাহলে।

অমরসিংহ। না, অম্বররাজ অজিতসিংহ যে কথা বলছেন তাই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। তবে আর এক কথা আমাদের আবার যুদ্ধে নাম্‌তে হবে। সে যুদ্ধ যদি ভীষণ হয়—যদি প্রচণ্ড শক্তি মারাট্টা আমাদের শত্রুপক্ষ অবলম্বন করে মহারাজ!

অজিতসিংহ। তাতে ভীত হবেন না, রাজপুত বিক্রমের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারে এমন সৈন্য এখনও ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয় নি।

অমরসিংহ। ভীত হই নি অজিতসিংহ; যুদ্ধটা ভীষণ হলে আমাদের বলক্ষয় যথেষ্টই হবে সে কথাই ভাবছি, যাহোক্‌ আপনি বোধ হয় এখন দিল্লী যাচ্ছেন?

অজিতসিংহ। হাঁ, আমি এখন সেখানেই যাব। বাহাদুর শা'র মৃত্যুর পর অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে একবার বুঝে আসা দরকার।

অমরসিংহ। বেশ, তাই ভাল। তারপর অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। কি বলেন মহারাজ জয়সিংহ?

জয়সিংহ। আমারও সেই মত।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—রাজপ্রাসাদ, জাহান্দার কক্ষ। জাহান্দার ও জুলফিকার।

জাহান্দার। আজীমের কোন খবর পেয়েছেন?

জুলফিকার। না, কোন খবরই পাইনি। খোদা করুন বাদশা' যেন এযাত্রা রক্ষা পান।

জাহান্দার। সে আশা একেবারেই নেই!

জুলফিকার। এত নিরাশ হচ্ছেন কেন? শাহজাদা, বাদশা' কি তাঁর মতের কোন পরিবর্ত্তন করেছেন?

জাহান্দার। জানি না, সেনাপতি! আর আমার জানবার কোন দরকারও নেই। আমার অধিকার আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

জুলফিকার। যে দিল্লীর সিংহাসন আপনার পূর্ব্বপুরুষ বাবর বাদশা' অসীম বীরত্ব আর অধ্যবসায়ের বলে জয় করেছিলেন তাকে আপনি মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলেন কি ক'রে ভেবে অবাক হচ্ছি। আপনার স্বার্থত্যাগ অতি আশ্চর্য্য।

জাহান্দার। সেনাপতি, এ ত আমার ত্যাগ নয়। যারা ঐশ্বর্য্যকে ধর্ম্মের চাইতে বড় মনে করে—যারা সুখভোগকে জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে জানে, তাদের পক্ষে এ একটা প্রকাণ্ড ত্যাগ—কিন্তু আমার কাছে নয়।

জুলফিকার। শাহজাদা, ধর্ম্মাচরণ আর রাজ্য শাসন এ দুটো কাজ কি একই সঙ্গে চল্‌তে পারে না? মহাত্মা আকবর মোগল-সম্রাট-শ্রেষ্ঠ ছিলেন—পরোপকারী ছিলেন, অশেষ গুণ তাঁর চরিত্রকে মহৎ করে তুলেছিল। তাই বলে, তিনি রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ত ছিলেন এ কথা তাঁর পরম শত্রুতেও বল্‌তে পারে না।

জাহান্দার। সেনাপতি, সকলেই কি আর আকবর বাদশা'। তিনি ছিলেন এ মোগল বংশের সব চাইতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিস্মৃতির আঁধারে কত বাদশা'র কত সুলতানের জ্যোতিঃটুকু ডুবে গেছে, ডুবে যাবে, কিন্তু এ নক্ষত্রটী চিরকাল জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌বে।

জুলফিকার। এ কথা সত্য যে সকলেই আর আকবর বাদশা' হতে পারে না। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন আপনি তাঁরই বংশধর। তিনি যেটা সম্পূর্ণ পেরেছেন, তাঁর পথ অনুসরণ কর্ল্লে, যে আপনি অন্ততঃ কতকটা সফল হবেন এ আশাটা বেশী কি? ভেবে দেখুন শাহজাদা এখনও সময় আছে।

জাহান্দার। না জুলফিকার খাঁ! আমার ভাব্‌বার কিছুই নেই। পিতার কাছে শপথ করেছি—তুচ্ছ সিংহাসনের জন্য প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌তে পার্‌ব না।

জুলফিকার। ক্ষমা করুন, শাহজাদা, এ সিংহাসন আপনারই প্রাপ্য কিন্তু বাদশাহ স্নেহে অন্ধ হোয়ে আপনার দাবীটাকে কতকগুলি কল্পিত আপত্তির জোরে অগ্রাহ্য করে দিয়ে যাচ্ছেন কিনা আজীমকে! আপনার দিকে অবিচার করা হয়নি কি, শাহজাদা?

জাহান্দার। সে চিন্তা আমার; আপনার নয়, সেনাপতি! যদি কোন দিন অনুতাপে নিরাশায় হৃদয় অধীর হোয়ে উঠে, সে আমিই সহ্য করব, আপনি নন্ সেনাপতি।

জুলফিকার। সে খুবই ঠিক কথা—শাহজাদা। সংসারে দু'এক জন আপনার মঙ্গল কামনা করে থাকে, এটা কি আপনি অসম্ভব মনে করেন?

জাহান্দার। না, সেনাপতি।

জুলফিকার। তবে আমিও তারই একজন—সে জন্যই এত করে বলছিলাম।

জাহান্দার। অপ্রিয় কথা বলেছি, অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার জন্য আপনার স্নেহ কত বেশী তা' আমি জানি সেনাপতি। এখন পিতার কাছে যাচ্ছি। আজীমের খবর পেলে জানাবেন।

জুলফিকার। যে আজ্ঞে; মিনতি করি। একবার নির্জ্জনে বসে আমার কথা ভেবে দেখ্‌বেন।

(জুলফিকার ও জাহান্দারের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দিল্লী—লালকুমারীর কক্ষ। লালকুমারী।

লালকুমারী। জোহেরা!

(নেপথ্যে—হুজুরাইন)

(গুণ গুণ ক'রিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে জোহেরার প্রবেশ)

লালকুমারী। সুর সাধার সময় এখনও আসেনি জোহেরা। রাত্তির দুপুর হ'তে চল্‌ল, এইবার খবর কর, দেখ কত দূর।

জোহেরা। (গীত)

কত দূরে কত দূরে বঁধু কত দূরে
নিশীথে বাজায় বাঁশী যমুনা কিনারে
মোহন সুরে।

লালকুমারী। গানের বাণ এখন তূণে বন্দি ক'রে শুধু ভ্রূ দুখানি ধনুর ভঙ্গিমায় বাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়। ব্যাকুল হয়ে তাঁরা যদি বাহু বাড়িয়ে দেয় তবে বু... আড়াল করে নিয়ে আসবি—তারপর গান।—যা—

জোহেরা। (গীত)

তবে যাক মিলিয়ে সে এ কাল আঁখির পাশে
যদি বঁধু মৃদু হাসে গান হ'য়ে বেজে আসে
মণি নূপুরে॥
রুণুঝুনু, ঝুণুঝুনু, ঝুণু মণি নূপুরে সখি
মণি নূপুরে॥

লালকুমারী। ভাঙ্গা গোটা একটা প্রাণের স্পন্দন চলেছে কোথায়! সোজা সরল জীবনে, না তার সশঙ্ক শঙ্কটময় গতিতে? আমি চল্‌তে চাই। আমাকে উঠ্‌তে হবে। জীবনে আমার চরম সাফল্য নাইবা এল—আসুক শুধু নিশিদিন এই ঘাতপ্রতিঘাত এই দ্বন্দ্ব বিসম্বাদ। হয়রাণ হতে হ'বে কিন্তু তবুও লড়্‌ব। জীবনের এইখানেই পদা—যুক্তি কিছু না থাক্‌তে পারে কিন্তু ছন্দ আছে। সেই অজানার নিরুদ্দেশ সন্ধানে বেরিয়েছি। সেই ছন্দের অনুসন্ধান ক'রেই ইরাণ থেকে দিল্লীতে এসেছি—রূপের ব্যবসার কর্ত্তে—চমৎকার এ কারবার! মণির মালা একটুখানি দুলিয়ে তোলা, বিলোল চোখের একটী মাত্র কটাক্ষ—বাস্‌। একি তাজ্জব! শাসকের হাতে দণ্ড নেই, মন্ত্রণাদাতার মস্তিষ্কে বুদ্ধি নেই, রক্ষকের শক্তি লোপ হ'য়ে গিয়েছে, সম্রাটের দেহরক্ষী সৈনিকের হাতের তরবারী খসে পড়্‌ল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা নীল হরফে নূতন ক'রে লেখা হ'য়ে যাচ্ছে,—বাহবা! চমৎকার—অপূর্ব্ব! ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যে—এই বিপ্লবের ফাঁকে মণিমালিনীর শত ক্ষত ব্যথায় জর্জ্জরিত বক্ষের উপর দিয়ে আমার ভাগ্যান্বেষণের বিজয়-রথ আজ নির্ম্মমের মতই আমি চালিয়ে নিয়ে যাব—শ্বেত অশ্বগুলো অবাধে ছেড়ে দিয়ে—রূপের বৈদ্যুতিক কশা তার পৃষ্ঠের উপর উদ্যত রেখে।

(জোহেরার প্রবেশ)

খবর কি বাঁদী?

জোহেরা। আমীর সাহেব, হুজরাইন আর......................

(জুলফিকার ও হামিদ খাঁর প্রবেশ)

জাফির। আর মনসবদার হোসেন হিম্মৎ হামিদ খাঁ।

লালকুমারী। (সেলাম করিয়া) আসুন খাঁ সাহেব। সেলাম। (জুলফিকার খাঁকে কুর্ণিশ করিয়া) বন্দেগি জনাব! তসরীফ রাখতে মরজি হোক।

হামিদ। ইয়ে লৌণ্ড খানামে! আরে ইয়ে তোফা! খাঁ সাহেব দেখছেন, মুখের ওপর রংয়ের কদর মতিমস্‌জিদের মতন স্রোত দিচ্ছে —রূপের জলুসে চমক লেগে যাবে।

লালকুমারী। জোহেরা! তুই খাঁসাহেবকে তোষাখানায় বসিয়ে একটু সরবৎ দে। আমি ততক্ষণ জনাব আলিকে হাওয়া করি। এতদূরের পথ পায়ে হেঁটে এসেছেন।

হামিদ। আর ঠাণ্ডা বানাতে হবে না বিবি। সরবৎ কি সিরাজীর কিছু দরকার নেই। যা দেখলুম! ওহো, একবার মুখের দিকে তাকিয়েই একদম ঠাণ্ডা—তা আমিও আর উনিও—তবে মুখে বলতে ওঁর সরম হচ্ছে—রাশভারি পয়গম্বর গোছের লোক কি না!

জোহেরা। সে খুব ঠিক কথা সাহেব। কিন্তু বাঁদীকে কি ভুলে গেলেন? এই চোখের কোণে এই ভরা বুকের উপর কি একটুও নেশা জমা নেই? ছিঃ, ভুলে গেলেন সব, এমন বেইমান!

হামিদ। আরে ছি ছি, বিবি সাহেব—হুকুম হ'লে তোমার সঙ্গে আসনাই করতে এ গোলাম রাজি আছে কিন্তু—এ বিবি তোমার বিবিজান।

জোহেরা। চলুন, ওর সঙ্গে খাতের হবে—আগে একটু ঠাণ্ডা হন।

হামিদ। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা বিবি।

লালকুমারী। জনাবের বহুৎ মেহেরবাণী যে বাঁদীর আর্জ্জি মঞ্জুর করেছেন। আপনার পয়জারের ধূলো নিয়ে বাঁদী আজ ধন্য হয়ে গেল। কিন্তু জনাব আলি এ দানের মর্য্যাদা করবার যে আমার কিছুই নেই।

জুলফিকার। তোমার এমন রূপ, এমন যৌবন—আর কি চাই!

লালকুমারী। তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ জনাব! জাঁহাপনার বিলাসীর কাছে এর দাম। আপনার মত আমীর মুসাফেরের সেবা কি এই রূপ দিয়ে করা যায়!

জুলফিকার। এ রূপে বাদশারও চলে মুসাফেরেরও চলে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখের কোণায় ঐ কুটিল দৃষ্টিটার মধ্যে কি যেন একটা উচ্চাশার বাণী স্পষ্ট করে লেখা র'য়েছে—সে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে তুমি ভাগ্যেরই সন্ধানে বেরিয়েছ।

লালকুমারী। চতুর আপনি সত্যি কথাই প'ড়েছেন। কিন্তু সব রূপসীর চোখেই—জনাব—ঐ একই কথা লেখা থাকে। আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়নে সুখ-মরীচিকার পেছনে তারা ছুটে আসে—গৃহ, ধর্ম্ম, স্বজন, সব ছেড়ে, রূপের প্রলোভন দেখিয়ে বিশ্বজয় কর্ত্তে। তবে আমার সে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আর একটা বিশেষত্ব কি দেখলেন জনাব?

জুলফিকার। না, সাধারণ সকলের মত সোজা উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, সহজ, সরল বাগ্রতায় যে তোমার দৃষ্টির মধ্যে ঐ তীব্র স্পন্দন তাড়িতের মত চ'কতে কিন্তু পলকে পলকে কেঁপে উঠছে—তা নয়। তুমি চাও ঢের বেশী একটা অসম্ভব—একটা কল্পনার অতীত—উচ্চ কিছু একটা অভ্রংলিহ; যা চাও তাকে তোমার পেতেই হবে—তা' তোমার চাই-ই। কেমন, নয় কি? বল, সত্য ক'রে; আমাকে লুকাবার চেষ্টা বৃথা।

লালকুমারী। আপনার চতুর বুদ্ধির কাছে কৌশল নিস্ফল। হাঁ, আমি জীবনটা আমার ভাগ্যের একান্ত লক্ষ্যেই একটানা ছুটিয়ে নিয়ে চলেছি। কোথায়—কতদূরে—কোনখানে এর শেষ—

জুলফিকার। জান না? কোন ভাগ্যান্বেষী তা' জানে না। কিন্তু কতখানি শক্তি আছে তোমার—তা জান ত? কতদূর ছুটতে পারবে, হিসেব কষে দেখেছ?

লালকুমারী। দেখেছি সেনাপতি, দরকার হলে চিরকাল আমি এই ভাগ্যেরই পিছনে ছুটবো। অনেক বাধা পথে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেই শত উন্নত প্রাচীরের প্রসারিত বিশাল বক্ষ পঞ্জরের প্রতিটা পাষাণ গ্রন্থি আমার নব যৌবনের জ্বালাময় অগ্নি কাঠে বিস্ফোরকের মত শতমুখ শক্তিতে বিচূর্ণিত করে সব বাঁধা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলে আমি বরাবর চল্‌বো, সম্মুখে জীবনের সন্ধানে। শুধু চাই একজন আভাষে বলে দিক এই পতিটার শেষ লক্ষ্যটা আমার কি!

জুল্‌ফিকার। এত বড় একটা প্রাণের স্পন্দন যার প্রত্যেকটা কথার মধ্যে ফুটে উঠতে পারে, দিল্লীর সিংহাসন চাওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়।

লালকুমারী। দিল্লীর সিংহাসন! যে কথা আমার মর্ম্মের মাঝখানে প্রতিধ্বনি তুলে চীৎকার করে ফিরছে। না—এ আমার স্পর্দ্ধা—অন্যায় স্পর্দ্ধা। সমাজ পরিত্যক্তা, ঘৃণিতা, নিঃসহায়া এক রমণী হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিরাট সাম্রাজ্যের সিংহাসনের আশা করে—এযে অসম্ভব খাঁ সাহেব, উন্মাদের পরিকল্পনা; আমি দিল্লীর সম্রাজ্ঞী! স্বপ্নের কথা! কিছু সম্ভাবনা নেই তার—একটা বিরাট উপহাস!

জুল্‌ফিকার। উপহাস নয়। কিন্তু জানি একটা কিছু কর্ত্তে হ'বে। অতি কঠিন! একটা নিস্তরঙ্গ, স্থির, স্বচ্ছ, সরল, সলিল প্রবাহ তোমার বসনাঞ্চলে বেঁধে রাখা চাই। পারবে? (একটু থামিয়া) হাঁ, তুমি পারবে, ঠিক পারবে। নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ সমুদ্রের ওপর তুফান তুলে দেবার মত শক্তি তোমার আছে।

লালকুমারী। তা আছে, খাঁ সাহেব। নইলে বৃথায় কি এ চোখকে চাতুরিময় ছলনার পড়া পড়তে শিখিয়েছিলাম। তবে এই বক্ষের পরিপুষ্ট উন্নত রঙ্গভূমির উপর পরিপূর্ণ যৌবনের লীলা শিহরণ, সুর গুঞ্জনের মত নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কাঁপিয়ে তুলে মুগ্ধ বিলাসীর অন্তরে লালসার ঘন আকুলতার জ্বালায় জাগিয়ে তোল্‌বার সাধনা কেন করেছিলাম? এই নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশ, পেলব, নিটোল বাহুর নীচে দোদুল গুচ্ছে এলিয়ে দিয়ে, মণিবন্ধের ওপর স্খলিত শাড়ীর শিথিল অঞ্চলখানি অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগ বেগে কাঁপিয়ে তুলে—সোহাগে বিলোলিত বাহু দু'খানি লালস রভসে প্রসারিত করে যখন বল্‌ব—ওগো আমার যৌবন বনের বিকশিত কুঞ্জ বীথিকার ব্যাকুলিত পাপিয়া! ওগো মনোমত দয়িত আমার, এই যে এই বিতত মধুর বক্ষের মাঝে নব প্রণয়ের সুললিত বাঁধন দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখব, প্রস্ফুট গোলাপ দলের পরিস্ফুট রক্তিমায় ফুলের মত ফুটে ওঠা ঠোঁট দু'খানি মিলন-সঙ্গমে উষ্ণ আকুল অধরের সহস্র রক্তের নির্ঝর ব্যাকুল রক্ত ধারায় ঝরে পড়ে সকল পিপাসা যখন মিটিয়ে দেবে তখনো কি—তখনো সে অন্ধ হয়ে এসে বন্দী হবে না এই হৃদয়ের কারাগারে?

জুল্‌ফিকার। হবে, হবে। হাঁ তুমি পার্ব্বে। কিন্তু কা'কে চাইবে জান?

লালকুমারী। কাকে চাইব?

জুলফিকার। দিল্লীর সিংহাসন এবার জাহান্দারের। কোন সুযোগে হাত ধরে নিয়ে জাহান্দারকে সিংহাসনে তুলে দিতে হবে। বুঝলে, পার্ব্বে?

লালকুমারী। পারবো, কিন্তু একবার দেখা চাই।

জুলফিকার। হাঁ, তার ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে। সন্ধ্যার নমাজের সময় মতি-মসজিদে তার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হ'তে পারে যা ক'রবার হামিদই তোমায় সব ব'লে দেবে। রাত্রি অনেক হ'ল আমি আসি—জেনো কিন্তু কৃতকার্য্য হলে এ মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী তুমিই।

লালকুমারী। আসুন জনাব, বন্দেগি। বাঁদী আপনার দয়ার চিরদিনের মত বাধিত রইল। (কুর্নিশ)

জুলফিকার। একি উন্মাদনা! আমার চোখে মুখে কে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটিয়ে দিয়েছে। আজ—এতদিন পরে—আমার আঁধার জগতে একটু আলো জ্বলে উঠেচে। এখন শুধু আমায় ছুটতে হবে। জানি নে কোথায় এর শেষ—

(লালকুমারীর প্রস্থান)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅগ্রমান্ দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

চার্ব্বাক দর্শন।

—:০:—
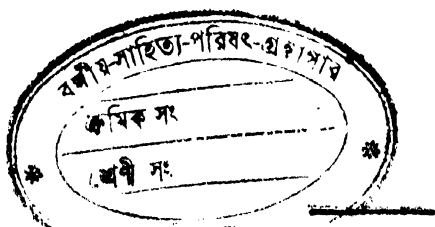
চার্ব্বাক দর্শন সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে। মহাজনগণ এই দর্শনটি সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এবার 'পরিচারিকার' পাঠকপাঠিকার নিকট উপস্থিত করিব।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় দর্শনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—চার্ব্বাক দর্শন ব্যতীত ভারতবর্ষীয় অন্যান্য সমস্ত দর্শনই ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে জড়িত; এবং চার্ব্বাক ব্যতীত অন্যান্য দার্শনিকগণ 'ধর্ম্মের জন্যই দর্শন' এই তথ্য মানিয়া চলিয়াছেন। এই জন্য চার্ব্বাক-দর্শনের রূপ হইয়াছে এক স্বতন্ত্র রকমের। আর অবশিষ্ট দর্শনগুলির মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য থাকা স্বত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যথেষ্ট সাম্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল এবং কর্ম্মভোগবাদ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চার্ব্বাক ব্যতীত ব্রাহ্মণ্য দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের একমত। চার্ব্বাক দর্শনের সুখবাদ অন্যান্য ভারতবর্ষীয় দর্শনের দুঃখবাদের সহিত তুলনা করিলে চার্ব্বাকের বিশিষ্টতা আরও ফুটিয়া উঠে।

চার্ব্বাক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন কহিয়াছেন—চার্ব্বাক নাস্তিকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য কারণ চার্ব্বাক বেদবাক্যে অবিশ্বাসী, পরলোকে অবিশ্বাসী, দেহাতিরিক্ত আত্মায় অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। বৌদ্ধ ও আর্হতেরা (জৈন) জন্মান্তর স্বীকার করিয়াও বেদবাক্য অবিশ্বাস করেন। এই জন্য তাঁহারা নাস্তিক। কারণ যাঁহারা বেদবাক্যে শ্রদ্ধা করেন না ও (and) জন্মান্তরে আস্থা প্রদর্শন করেন না তাঁহারাই ভারতে নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হয়। তথাপি হিন্দুর পুরাণ বলেন দেবগুরু বৃহস্পতিই চার্ব্বাক শরীর পরিগ্রহ করিয়া লৌকায়তিক দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন; আবার স্বয়ং বিষ্ণু বুদ্ধ শরীর গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-মতের সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং ঋষভদেব হইয়া আর্হত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় যে টীকা দিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—একের স্থানমাত্রে যে দ্বিতীয় অবস্থান করে, সেই ব্যাপ্য; যেমন বহ্নির ব্যাপ্য ধূম। বহ্নি জন্য বাষ্পের নাম ধূম; সুতরাং বহ্নি ভিন্ন ধূম থাকিতে পারে না। আর ব্যাপ্যের স্থানে যে থাকে তাহার নাম ব্যাপক। এ স্থলে মাত্রপদ দেওয়া হইল না, কারণ ব্যাপ্য যে স্থলে থাকে ব্যাপক সে স্থলেতে থাকে অন্যত্রও থাকে। এই ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্যের নিয়ত সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে। অনুমাতা (অর্থাৎ যিনি অনুমান করেন) এইরূপ ব্যাপ্য দর্শনে ব্যাপ্তির স্মরণ করে; পরে ব্যাপকের উপলব্ধি করে। অনুমিতি স্থলে ব্যাপ্যকে হেতু করিয়া ব্যাপকের সাধন করা হয়। এই জন্য ব্যাপ্য হেতু ও ব্যাপক সাধ্য। ব্যাপ্যের অবস্থিতি বিষয়ক জ্ঞানের নাম পরামর্শ। যাহাতে অনুমান করা যায় তাহার নাম পক্ষ। যথা 'পর্ব্বতে বহ্নি আছে কারণ ধূম দেখা যাইতেছে। এই পর্ব্বত পক্ষ।' ভারতবর্ষীয় দর্শন বুঝিতে গেলে ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, হেতু, পরামর্শ, পক্ষ, সাধ্য ও সাধন এই কয়েকটি শব্দের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝা উচিত৭

চার্ব্বাক দর্শনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"পুরাণকার মহারাজ বেণের যেরূপ চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, চার্ব্বাকেরও সেইরূপ চিত্র দেখিতে পাই। মহারাজ বেণ, যেমন বৈদিক ধর্ম্মের উপরে খড়্গহস্ত হইলেন; ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, পরলোকে অবিশ্বাসী ও আত্মায় অবিশ্বাসী হইলেন;—চার্ব্বাকের মতবাদেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। মহারাজ বেণ রাজশাসনে ঘোষণা করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছিলেন ও বর্ণ সঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হয় চার্ব্বাক বেণের উপদেষ্টা বা সভাপণ্ডিত ছিলেন, নয় বুদ্ধদেবের মত শিষ্যদিগের নিকট নিজের মতবাদ মুখে মুখে প্রচার করিয়াছিলেন। পরে মহারাজ অশোকের ন্যায় মহারাজ বেণও সেই মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বেণ কৃষিবিদ্যা প্রবর্ত্তক ও প্রচারক মহারাজ পৃথুর পিতা। এই বেণ ও পৃথুর নাম সুপ্রাচীন মনুসংহিতায় পর্য্যন্ত রহিয়াছে। মহারাজ বেণের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি, চার্ব্বাকের মুখে তাহাই শুনিতেছি। ইহার দ্বারা পাঠক-পাঠিকা অনুমান করিতে পারেন চার্ব্বাকের মতবাদ কত প্রাচীন। (ভারতবর্ষ, ১৩২৩, ৮০:-৫)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় সাংখ্যের পুরুষ ও নাস্তিকবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"আমাদের দেশে নাস্তিক-দর্শন যে কতকালের দর্শন তাহার কোন ঠিকানাই হয় না। উপনিষদে ও পুরাণে শুনা যায় দেবগুরু বৃহস্পতি (অথবা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা) অসুরদিগের ইহপরকাল নষ্ট করিবার জন্য, নষ্টামি করিয়া এই দর্শন অতি প্রাচীন কালে জগতে প্রচার করেন। এই জন্য নাস্তিক দর্শনের অপর নাম বার্হস্পত্য দর্শন। চার্ব্বাক এই বার্হস্পত্য দর্শনের প্রধান পাণ্ডা হইয়াছিলেন। এই চার্ব্বাক যে কে এবং কোন সময়ের লোক তাহার কোনই ঠিকানা হয় না। মহাভারতে দুর্য্যোধনের বন্ধু চার্ব্বাক বলিয়া এক রাক্ষসের নাম পাওয়া যায় (শান্তি পর্ব্ব ৩৯ অধ্যায়)। কিন্তু সেই চার্ব্বাকই যে দার্শনিক চার্ব্বাক তাহা ঠিক বলা যায় না। চার্ব্বাকের মত সমস্ত লোকেরই আয়ত্ত বলিয়া চার্ব্বাক মতকে লোকায়ত মতও বলা হইয়া থাকে। চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ্ চাণক্য তিনটি মাত্র প্রাচীন দর্শনের নাম করিয়াছেন—যোগ, সাংখ্য ও লোকায়ত দর্শন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে নাস্তিক দর্শন নিতান্ত অল্প দিনের দর্শন নহে। (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৬, ১ম, ৩৪৮)।

খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস কবি প্রতিমা নাটকে রাবণের মুখে এই কথা বলিয়াছেন—

ভোঃ, কাশ্যপগোত্রোঽস্মি সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং বার্হস্পত্যম্ অর্থশাস্ত্রং মেধাতিথেঃ ন্যায়শাস্ত্রং প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বার্হস্পত্য দর্শনের কথা ভাস কবি জানিতেন। কৌটিল্য বা চাণক্য ভাসের পূর্ব্বে আন্বীক্ষকীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কহিয়াছেন সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীক্ষকী। আর এই আন্বীক্ষকী কৌটিল্য মতে চতুর্ব্বিধ বিদ্যার এক বিদ্যা। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনুমান করেন কৌটিল্যের সময়ে বা দৃষ্টিতে ন্যায় এবং বৈশেষিক সম্ভবতঃ লোকায়ত দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ত্রয়ী নামক অপর একটী বিদ্যার অন্তর্গত ছিল বেদান্ত ও মীমাংসা। সেই জন্যই বোধ হয় কৌটিল্য, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত দর্শনের নাম করিয়া, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিকের নাম করেন নাই।

রামায়ণকার আন্বীক্ষকী দর্শনকে বিদ্যা বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই। বুদ্ধিমান্বীক্ষকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে। রাম ভরতকে সতর্ক করিয়া কহিতেছেন—কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণান্ তাত সেবতে। (প্রবাসী ১৩২২—ভারতীয় দর্শন - শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।)

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয় তাঁহার "বার্হস্পত্য-সূত্রম্" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"লোকায়ত বা চার্ব্বাক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এক বৃহস্পতির উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। অর্থ ও রাজনীতির প্রণেতা আর-এক বৃহস্পতির পরিচয় কৌটিল্যের গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ চার্ব্বাক দর্শনের প্রণেতা ও রাজনৈতিক বৃহস্পতি একই ব্যক্তি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্থানে স্থানে বৃহস্পতির মতের উল্লেখ আছে। সুতরাং কৌটিল্যের পূর্ব্বে, রাজনীতিক্ষেত্রে, বৃহস্পতি যে আপনার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কৌটিল্য বার্হস্পত্য পদ্ধতির মত উদ্ধৃত করিয়া, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। * ** ** কৌটিল্য শুক্র ও বৃহস্পতিকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।" গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজনৈতিক বৃহস্পতি বিরচিত একখানি পুস্তক ও তাহার টীকার সংবাদও ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। "বার্হস্পত্য-সূত্রটীকা" নামে একটি পুঁথি Oppest সাহেব তাহার তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন (vol I, No. 6061)। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পুঁথিটির এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। বার্হস্পত্য-সূত্রের দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; একখানি বিলাতের Royal Asiatic Societyর সংগ্রহে আছে (Winternitz; Catalogue, No. 160 (3) P. 219); দ্বিতীয় খানি মান্দ্রাজের Government Oriental Libraryতে আছে। Royal Asiatic Societyর পুঁথিটিতে দেবগিরির যাদব রাজগণের উল্লেখ আছে। এই প্রমাণের বলে Thomas সাহেব পুঁথিটিকে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা বলিতে চাহেন। কিন্তু সাহেব এ কথাও বলিয়াছেন যে এই অংশ এবং শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণব গণের তীর্থক্ষেত্রাদির বিবরণের অংশ প্রক্ষিপ্ত ধরিলে, পুঁথিটি যে বহু প্রাচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" Madras Government Oriental Libraryতে প্রাপ্ত পুস্তকখানির পরিচয় ও কিয়দংশ শ্লোক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন।—"পুঁথিটি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ১০টী সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭০টী, তৃতীয়ে ১৪৭টী, চতুর্থে ৫০টী, পঞ্চমে ৩০টী এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪টী সূত্র আছে।" কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে কয়টী শ্লোক তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন

তাহা হইতে কিছুতেই মনে হয় না যে এই বার্হস্পত্য-সূত্রম-এর বৃহস্পতি আর দার্শনিক বৃহস্পতি একই ব্যক্তি। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি কিছুতেই দার্শনিক বৃহস্পতি লিখিতে পারেন না :—

১। নিত্যকর্ম ন ত্যজেৎ।

২। যদা বেদোক্ত কর্ম্মজ্ঞানং শিবং বিষ্ণুং
শ্রেয়মপি পরিত্যজ্য সর্ব্বং শূন্যমিতি
বদন্তি তদা বৌদ্ধাভিধান পাষণ্ডী।

৩। মোক্ষপূর্ব্বান্ ত্যারং জয়ম্ ॥
শাক্তাঃ বৈষ্ণবাঃ শৈব্যা।
মহাপথবৎ বৈষ্ণবম্ ॥

৪। ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ দোষদুষ্টমপি ॥

৫। বিপরীতং ন বেদ বীর্য্য দর্পেণ ॥
(ভারতী ১৩২৫, পৃঃ ৭৬১—৭৭৪)

চার্ব্বাকের বেদ ব্রাহ্মণ মোক্ষ ও নিত্য কর্ম্মের উপর যতখানি শ্রদ্ধা তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

হতাশ্বাস।

—:•:—

এ জীবন ? কিছু নহে কিছু নহে ভাই,
শুধু ধূলা, শুধু বালি, এক মুঠি ছাই,
কিছু নহে আর
প্রদীপের ক্ষীণ শিখা ঝটিকার রাতে
নিমেষে নিভিয়া বায়ু প্রবাহ আঘাতে
নিবিড় আঁধার।
কি তাহার আদি আর কোথা তার শেষ
লুকায় অনাদি কালে ফেলিতে নিমেষ
রহস্য আলয়,
দিয়েছিল কত শোভা আলোর কিরণ
জগতের ইতিহাস আছে কি এমন
বুকে গেঁথে লয় ?
তবে এত ভালবাসা ? তবে এত মায়া ?
দেখিয়া শিখেছি শুধু দুদিনের ছায়া
ভেবে মরা ভুল
কে কবে জীবন-পথে সাথী করে লয়
পথিক-নিবাসে এ যে ক্ষণ পরিচয়
রাতে ফোটা ফুল।
এই আছে এই নেই মানব জীবন
তারপর কি আঁধার নিবিড় গহন
সীমারেখা নেই,
পথের পথিক এ যে শ্রান্ত কলেবর
বালি দিয়ে বাঁধিয়াছে পথে খেলাঘর
জীবন কি এই ?

বিশ্বাস।

—:*:—

বলো না বলো না আর মানব জীবন এই
আগাগোড়া মিছে সব স্বপন সম
একটি আশার বাণী সোণার তরীর মত
এ আঁধার সাগরে ভাসাও
ডুবিতে বসেছে যে গো অতল বারিধি তলে
নিরাশা উছলজল নিবিড়তম
আশার উজল তটে রবির কিরণ লেখা
সে ললাটে বারেক ছোঁয়াও।

একবার বল সবে মিছে নয় মিছে নয়
মিছে নয় আমাদের জীবন খেলা
এ ভাঙ্গা গড়ার মাঝে চলিতেছে যে বিধান
তুমি আমি কি বুঝিব তায়,
কোথায় পড়িছে ডাক অকালে ভাঙ্গিছে তাই
হেথাকার জীবনের হাটের মেলা
কোন্ জগতের পার কোন্ গগনের ধার
সেই লোক না জানি কোথায়!

তবু বল সেও আছে সেও আছে কোনখানে
জানা না জানার পারে আছে সে তবু
অসীমের কোলে কোলে সাঁজের ও তারাগুলি
কনক বীণায় গাহে গান
মনের সীমানা যদি ধরিতে না পারে তারে
জ্ঞানের মহিমা যদি না জানে কভু
তবু আছে সে জগত এ জগত নহে শেষ
এ জীবনে নহে অবসান!

বল শুধু বল বল আরো আলো, আরো গান,
আরো প্রাণ যাজে সেথা দিবস নিশি
সে ধরণী আরো শ্যাম সে বাতাস আরো মধু
সে আকাশ আরো বড় নীল
জনম মরণ সেথা বুকে বুকে দুটি ভাই
ইহকাল পরকাল যুগলে মিশি
রচিয়াছে সেই মহা অনাদি মাধুরী ভরা
সেথাকার অনন্ত নিখিল !

এত যে অচেনা মুখ এত যে অজানা প্রাণ
তারি মাঝে দু'চারিটি প্রাণের মণি
বুকে বুকে চেপে ধরে হাতে হাতে বেঁধে তবু
চোখে চোখে হারাবার ভয়
এত প্রেম ভালবাসা দরশ-পরশ-ঘেরা
হারানিধি-খুঁজে-পাওয়া-রতনখনি
এ পারে ও পারে যেথা অপারে মিশেছে আসি
বল সেথা হবে তা অক্ষয় !
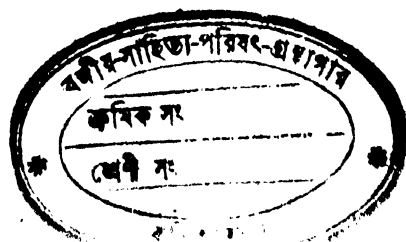
মরণ আড়াল।

-:০:

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একা—আবার অন্ধকারে,—একা! আবার সেই প্রশ্ন—এখন যাই কোথা? কি করিয়া এ বেশ পরিবর্ত্তন করি! এতক্ষণ সহৃদয় যুবকটির সঙ্গ-সাহচার্য্যে আত্ম-অবস্থা অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। মানুষ ইচ্ছা না করিলেও অজ্ঞাতে পরের উপর কতখানি নির্ভর করে, পরস্পরে সাহায্যভিক্ষারী হয়! কিন্তু এ জেল-ফেরার কয়েদীকে কে সাহায্য করিবে! দশের সুখ-সমৃদ্ধি-সহায়ক সমাজ; পরোক্ষে আত্ম-সুখের-পরিতৃপ্তি পরিপুষ্টির জনাই তাহার গঠন, তাহাতেই তাহার গৌরব! আর কয়েদী সমাজদ্রোহী—সাধারণের সেই সুখ শান্তির অন্তরায়,—অন্ততঃ লোকের তেমনি বিশ্বাস,—আশা তবে আর আমার কি আছে! মনুষ্য সমাজ আমার জন্য নয়! এমন কি পাপ করিয়াছিলাম বিধাতা! যাহার জন্য এ নিদারুণ শাস্তি! সমাজের পাপের বিরুদ্ধে একদিন দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলাম—তাই কি আমার প্রতি সমাজের এই ভীষণ প্রতিশোধ—বিধাতাও তাহার সহায়! মনটা আবার দমিয়া গেল! ভবিষ্যৎ যাহার এমন ঘন ঘটাচ্ছন্ন, তাহার কি একপদ অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয়,—না কোন ফন্দীসন্ধি মনে আসে? সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলাম। নির্জ্জন প্রান্তর, ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। একটু সাড়া শব্দ নাই। কি ভীষণ, ভয়াবহ স্তব্ধতা, কুত্রাপি একটি জীবনের চিহ্নমাত্র নাই! প্রাণহীন, প্রাণীহীন প্রান্তর—আমি তাহাতে একা! আমার মর্ম্মের বেদনা অন্যে বুঝিবে না! মনে হইতেছিল—ভূমে লুটাইয়া পড়ি! শেষ হইয়া যাক এ জীবন! বসিয়া পড়িলাম। সাধ হইতেছিল নিজকে নিজ নখে চিরিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলি, মানুষ হইয়া যদি মানুষের অধিকার না পাইলাম তবে আর জীবনের আবশ্যক!

শৃগালের প্রাহরিক চীৎকারে চমকিয়া উঠিলাম। এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া ফল! নিজের নিচেষ্ট ভাব অসহ্য হইয়া পড়িল! এই জন্যই কি শত বিপদ মাথায় করিয়া দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছি! যুবক সত্যই বলিয়াছেন—মানুষ মানুষই, ভেড়া নয়,—জীবনটাকে

স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দিবার জন্য মানুষের জন্ম হয় নাই—নিজের স্থান তাহাকে নিজে করিয়া লইতে হইবে!

উঠিয়া দাঁড়াইলাম! যত বিলম্ব ততই বিপদ! গোঁসাইগঞ্জের দিকে চলিলাম, বড় রাস্তা ধরিয়া নহে, নদীর ধারে ধারে—দো-পায়া পথে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর একটা বাগান বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকায় আঁধারেও ছায়ার মত সমস্ত দেখিতে পাইতেছিলাম। বাড়ীটা সহর হইতে কিছু দূরে, আশে পাশে অন্য বাড়ী নাই। ভাবিলাম—আর অগ্রসর হওয়া নয়—এই বাড়ীতেই চেষ্টা দেখিতে হইবে। কিসের চেষ্টা? কয়েদী জীবনের যেটা প্রধান অপবাদ, সেই চোর্য্য আজ আমার একমাত্র অবলম্বনীয়—নিরুপদ্রবে এ হেয় বেশ পরিবর্ত্তনের অন্য উপায় আর কি আছে!

সম্মুখেই ফটক—উন্মুক্ত। স্থানটি জনমানবহীন। সুযোগ বটে! ধীরে ধীরে অতি সাবধানে বাড়ীর হাতার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। মধ্যস্থলে তাহার একটি নাতিবৃহৎ পাকা-বাড়ী। চতুর্দ্দিকে অনেকখানি খোলা যায়গা। ধারে ধারে গাছপালা, ফলফুলের গাছ বোধ হয়। সেই দিকে যাওয়াই নিরাপদ ও নিজেকে গাছের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া বাড়ীখানির আঙ্কসন্ধি যতটুকু জানা যায়,—সেই চেষ্টা চাই আগে।

সত্যই সেটা ফুল-বাগান। সারি সারি কেয়ারী, ফুলের গাছ; মধ্য দিয়া সরু রাস্তা। একটা রাস্তা ধরিয়া নিঃশব্দে গুটি গুটি চলিলাম। পার্শ্বেই একটা লতা-বিতান। অন্ধকারে তাহা একটা মন্দিরের মত দেখাইতেছিল। তাহার নিকটস্থ হইতেই মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছিল। আশ্চর্য্য! এ অন্ধকারে এমন স্থানে ইহারা কাহারা!

যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করিয়া লতা-বিতানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। একটি বামা-কণ্ঠ অস্বচ্ছ, ধীর সংযত স্বরে বলিতেছে—"না—ভাই, ক্ষমা কর,—যা' হবার নয়, সে প্রস্তাবে ফল কি! এ-ভোগ আমাকে ভুগ্‌তেই হবে!"

যুবক কণ্ঠ উত্তর দিল—"ভুগ্‌তে হবে কেন? কিসে তুমি ওর অধীন? ইচ্ছা কর্‌লেইত তুমি এক মুহূর্ত্তে এ সকল ঝঞ্ঝাট—শেষ করে দিতে পার!"

এঁ! একি! কাহার কণ্ঠস্বর এ! এ যে আমার সেই সদা পরিচিত, সহৃদয়, সাহায্যকারী সাইক্লিষ্ট বন্ধুবরের স্বর! সে এমন অবস্থায় এখানে! বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া আরও নিকটে সরিয়া দাঁড়াইলাম। যুবতী উত্তর দিলেন—"যত সোজা মনে কর্‌ছ অতুল দা, ব্যাপারটা বাস্তবিক তত সোজা নয়। বাবা, ডাক্তারকে বুঝেও ঠিক বুঝ্‌তে পারেন নি, ওকে আমার হিতৈষী ভেবে, আমাকে ওর অধীন করে গেছেন,—এখন সকলের চোখে আমার ও একমাত্র অভিভাবক,—ওর হাত হতে রক্ষা পাওয়া সহজ নয়।"

যুবক বলিলেন "অভিভাবকই বটে! অভিভাবক মশাই, তাঁর কর্ত্তব্য যথেষ্ট পালন করছেন; অনেক হয়েছে—আর কেন! লোকটার প্রকৃত পরিচয় সংসারকে জানান এমনি কি অসম্ভব ব্যাপার!"

যুবতী বলিলেন "সম্ভব অসম্ভবের কথা নয় অতুল দা। তুমি, আমায় অত বেশী স্নেহ কর বলে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ভাই, আমি যদি এখন ওর অভিভাবকত্ব ঘুচাতে চাই, ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? লোকে দুষবে আমাকেই। মুখে যে যাই বলুন—মেয়েদের উপর আমাদের দেশের লোকের যতটুকু আস্থা, যে সহানুভূতি—তাতে বিচার বিবেচনা করে' মেয়েদের সম্বন্ধে যে কেউ মন্তব্য প্রকাশ করবে—সে আশা বৃথা! বিশেষতঃ ব্রাহ্মের বয়স্থা মেয়ে,—লোকগুলো যেন একটা কিছু রটাতে পারলেই বাঁচে!"

অতুল একটু উত্তেজিত হইয়াই উত্তর দিলেন "ঐ লোক লোক করেই ত সব জাহান্নমে যেতে বসেছে! আচার ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় নিজে কে কতখানি হিঁদু,—সেটা একবারে চিন্তার মধ্যে না এনেই অবাধে ওই অনাচারী, নামে-হিঁদুগুলো,—যাঁরা অন্ততঃ ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দিতে নারাজ, স্পষ্টাপষ্টি নিজেদের উদারপন্থী বলে জানিয়েছেন তাঁদের সৎসাহসিকতাকে প্রশংসার চক্ষে না দেখে তাঁদের নিন্দে করেই কৃতার্থ হবে! মূর্খগুলো,—হৃদয়হীন পাষণ্ডের দল, গতানুগতিক পথে চোখবুজে চলাকেই জীবনের সার বলে মেনেছে,—এত দিনের অব্যবহারে ওদের মনের চাবিটায় এমন মরচে ধরে গেছে যে ভুলেও বোধ হয় ওদের মনে হয় না—ওদের নিজের আবার একটা মূল্য আছে! না—ওদের বুঝবার শক্তি আছে—মানুষ কি দুঃখে—কতখানি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে—আপনার পথ আপনি দেখে! আপন ভাবে চলতে চায়!"

যুবতী যেন হাসা মুখে তরল ভাবেই বলিলেন "লোক কি করে না করে—সেটার আলোচনায় ত এখন কোন ফল হচ্ছে না অতুলদা,—দশের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে ফলটা যে তার এথ্‌খুনি এথ্‌খুনি ভাল দাঁড়াবে না সেটা ত বুঝ্‌ছ।"

অতুল বলিলেন "বুঝ্‌তে বুঝ্‌তেই ত দিন গেল বোন! কবে এ বোঝার শেষ হবে! একজন দিব্বি আরামে সমাজে গণ্য মান্য সেজে মনের সুখে অন্যের উপর অত্যাচার করে যাবে—মাতব্বরী ফলাবে—আর উৎপীড়িত মাথা তুল্‌তে চাইলেই অপরাধ! পড়ে পড়ে মার খাওয়াই কি এ দেশের ধাত হয়ে গেছে। ও স্বভাবটাকে যার যত ইচ্ছে ধন্য ধন্য করতে হয় করুক—আমি ত ওতে বাহবা দেবার এমন কিছু দেখ্‌তে পাইনে! বুঝ্‌ছি যেখানে অন্যায় অত্যাচার করছে—তার প্রতিকারের চেষ্টা করব না! কেন? কিসের জন্যে নিজকে এত হেয় করে ক্রীতদাসের মত নির্জ্জিত হয়েও গর্ব্বিত মনে করবো—তাই যদি হ'ত তবে পোষা কুকুর আমাদের সব চাইতে উচ্চ আদর্শ! মানুষের আদর্শ সেটা কিছুতেই হ'তে পারে না,—মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অধীনতায় নয়, পরের ইঙ্গিতে চলা ফেরায় নয়, ভালমন্দ বিচারে তার মনুষ্যত্ব। বিপদ ওতে আছে বলেই কি ও-পথে চল্‌তে মানা! বরং বল—চলতেই হবে তাকে ওই বিপদের মাঝ দিয়ে—তাতেই তার অস্তিত্ব—সেই রকম লোককেই আমি বলি মানুষ! এই আজ এখানে আসবার পথে একটা জেল পলাতক কয়েদীর সঙ্গে দেখা। বেচারী নয় নয়টা বছর জেলের পীড়ন নীরবে সহ্য করেছিল কিন্তু একটা মাস আর তার সইল না! খালাস হ'ত সে আর একমাস পরে কিন্তু নয় বছরে সে যা বুঝ্‌তে পারে নি তাই তাতে মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে শেষটায় তার মনকে অস্থির করে তুলেছিল সেইটাই। সে অন্য দশজন কয়েদীর মত ভাবত জেল'ত শাস্তি পাবারি যায়গা,—তাই তার যত অত্যাচার সহ্য হ'ত কিন্তু যখনি এতদিন তার মনে জাগল—কেন এ শাস্তির বিধান? শাস্তি ত বিপদগামীকে সুপথে আনবার জন্যেই,—তা ত জেলে খুবই হয়, তবে কেন—কোন অধিকারে জেলে ওরা এমন শাস্তি দেবে? গায়ের জোরে প্রবল করবে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার! মানুষ সইবে বিধির কোন্ বিধানে! অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার জেল তখন,—সে অসমসাহসে জেলে 'লঙ্কাকাণ্ড' করে সেই রাতেই পলাতক! লোকে বল্‌বে লোকটা কি ভয়ানক! জেল কয়েদীর পক্ষে যেটা অস্বাভাবিক, পড়ে পড়ে মার খা

খেয়ে পলায়ন—অবশেষে খালাস হবার একমাস পূর্ব্বে নির্ব্বোধটার হল কিনা তাতেই কুমতি ! আমি কিন্তু দশের মতকে দূর হতে নমস্কার করে ওইটাকে মেনে নিয়েছি—ওর গুণের মত গুণ। স্বভাবের ওর প্রকৃত পরিচয় পেয়েছে ও এতদিনে ! আমি তাই ওকে কারে আমার পাশে যায়গা দিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করিনি—ওকে বন্ধু বল্‌তে গর্ব্বই হয়েছে ! চলিত প্রথাকে মান্য না করে যে মানুষের অবমাননাকে আমল দেয়নি সে মনুষ্যসত্তার সন্ধান পেয়েছে—কয়েদী হ'ক সে মানুষ ! কয়েদীকে পলায়নের সাহায্য করে আমিও আইনের চোখে অপরাধী হয়েছি—এমন অপরাধ যেন জীবনে নিত্য ঘটে।"

যুবক একটু থামিয়া আবার আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন "কোথাকার কে কোন্ কয়েদী তার জন্যেও প্রাণ কেঁদে ওঠে, আর তুমি—কত আপনার, আমার বাল্যের সঙ্গিনী, নিজের বোনের অধিক—তোমার উপর ও করবে এমন অত্যাচার, তা আমি কিছুতেই সইব না - সইব না—ইচ্ছা হয় এখনি তোমায় এখান হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে যাই। কেবল তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—আমি কিছু করবার কে !"

অলকা বলিলেন "করবার তুমি কে—আর না কে—সে তুমিও জান—আমিও জানি ! সে কথায় কাজ কি ভাই ! অধৈর্য্য হয়ে হবে কি বল ? এ দিন আর চিরদিন থাক্‌বে না, এ এখন আমাকে সইতেই হবে !"

যুবক বলিলেন "ভাল ! যদি তাই ভাল বুঝে থাক ভাল ! কিন্তু শোন বলছি অলকা ! একদিন এমন সময় আসবে যখন তোমাকে বুঝ্‌তে হবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে সুফল ফলে না কখনো ! স্বার্থ নিয়ে যেখানে কথা সেখানে কি ডাক্তার অত সহজে তোমায় পরিত্রাণ দেবে ? আজ যাকে বিদ্রোহ ভাব মনে করে অত সঙ্কুচিত হচ্ছ, সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় পৌঁছে সে দিন তোমাকে এ সঙ্কোচ ছিন্ন মলিন অশুচি বস্ত্রের মত ঘৃণায় দূরে ফেলে দিয়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে ! সে কিন্তু সব বিফল ! অসময়ে মরিয়ার বৃথা চেষ্টা ; যে মানের ভয়ে আজ অধীনতাকেও শ্রেয় বলে ভাবছ সেই মান সম্ভ্রম তখন রক্ষা পাবে কি না সন্দেহ ! আমার আর জানতে বাকী নেই অলকা,—আমি বেশ বুঝেছি এখনে তোমার মঙ্গল নেই বোন !"

অলকা কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"জানি অতুলদা, তুমি আমায় কত ভালবাস, আমার জন্যে তোমার কত ভাবনা ! কিন্তু দাদা, বাবা যা করে গেছেন—আমি তার বিরুদ্ধে কি করে দাঁড়াই !"

অতুল বলিলেন—"ভাল, বোন, তাঁর একটা ভুল হয়েছিল বলেই, তার ফলাফল জেনে শুনেও কি সেই ভুলটা আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে? থাকতে হয় তুমি থাক! আমি কিন্তু তা পারবো না—তোমাকে যতদূর সম্ভব না জড়িয়ে আজ আমাকে নিজের গরজেই ডাক্তারের সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করতেই হবে! তুমি যা চাও না—আমি তা জেনেছি,—আমি আর এর প্রশ্রয় দিতে পারবো না, আর বাধা হয়ো না অলকা!"

অলকার কোন উত্তর শুনা গেল না। যুবকযুবতী লতা-বিতান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে চিত্রপিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। এ আবার কি রহস্য! কে এ অলকা? যুবক ইহার কে? কে সে অত্যাচারী ডাক্তার? জেলের বাহিরে,—স্বাধীন সামাজিক জীবনেও দেখি সেই সমস্যা—দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার! স্বাধীনতা তবে কি স্বপ্ন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

একবার মনে হইল,—না, এ বাড়ীতে আর নয়—এখনি এ স্থান পরিত্যাগ করি। হঠাৎ যদি ধরা পড়ি, আমার সহৃদয় সাইক্লিষ্ট বন্ধু তাহা হইলে কি ভাবিবেন! আমি যাহাই হই, অন্যে আমাকে যত হেয়ই মনে করুক, কিন্তু যিনি আমাকে যে কারণেই হ'ক, মানুষের গণ্ডীতে স্থান দিয়াছেন তাঁহার সমক্ষে নিজের হীনতা প্রকাশ করিয়া বিশ্বাসে তাঁহার আঘাত দিতে পারিব না! সে স্থান পরিত্যাগই শ্রেয়।

প্রাণ পলায়নপর হইলেও মন কিন্তু তাহাতে সায় দিল না। মনটা রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল,—শ্রেয় অশ্রেয়ের বিচার বিবেচনা তাহার ছিল না। মনে হইতেছিল—সোজাসুজি গিয়া বন্ধুকে অকপটে সমস্ত জিজ্ঞাসা করি! হায়! সে সুযোগ, সে শক্তি আমার যে নাই! প্রাণে তাঁহার জন্য যথেষ্ট বন্ধুত্ব প্রীতি সঞ্জিবীত হইলেও তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার আমার কোথা?

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আরও ঘণ্টাখানেক সেই স্থানে কাটাইয়া দিলাম। কোন সাড়াশব্দ নাই,—বাড়ীখানাতে জনপ্রাণী নাই যেন—অথচ বুঝিতেছি বাড়ীখানি জনহীন নহে—রহস্যময় এ ভবন!

সহসা একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। একখানি মটরকার বৈদ্যুতিক আলোকে বাড়ীর একাংশ মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাষিত করিয়া ফটকের বাহির হইয়া গেল। আরোহী সম্বন্ধে কিছুই অনুমান বা অনুধাবন করিতে পারিলাম না,—উজ্জ্বল আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারে আরোহীরআসন। কারের আলোকে দেখিলাম—দালানের দক্ষিণ দিকে একটা গাড়ী-বারাণ্ডা। সম্মুখটা তাহার পুষ্পিত লতায় আচ্ছাদিত,—সুবিন্যস্ত ভাবে সজ্জিত। সৌখীন লোকের গৃহ বটে। কিন্তু গৃহে আলোক নাই কেন? অধিবাসীবর্গইবা কোথায়? হয় ত সকলেই নিশিথ রাত্রে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত অথবা সকলেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বাগানবাড়ী,—সৌখীন প্রাণের আমোদ প্রমোদের স্থান,—গৃহস্বামী খুব সম্ভব ইয়ার বন্ধু সঙ্গে করিয়া বসন্তের হাওয়ার মত এক দিনের জন্য প্রমোদভবনে দেখা দিয়াছিল—আবার সদলবলে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। তাহা হইলেই হইয়াছে! আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর আশা নাই! পরিধের বস্ত্র যে আমার না হইলেই নয়! স্থায়ী বাসিন্দা না থাকিলে এখানে বস্ত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? মনে হইল, অন্য কোন স্থানে চলিয়া যাই কিন্তু লোকালয়ে, ঘন-বসতিতে বিপদ অধিক,—এ গৃহে কি কোন ভৃত্যও থাকে না,—তাহার বস্ত্র পাইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট!

ধীরে ধীরে অট্টালিকার সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। কোথায়ও কেহ নাই। দরজা জানালাগুলি সমস্তই বন্ধ! গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিলাম—গৃহ প্রবেশের সুযোগ নাই।

ভাবিতেছি কি করি,—হঠাৎ আয়নায় প্রতিফলিত আলোকের ন্যায়,—এক ঝলক আলোক আমার সম্মুখ দিয়া নাচিয়া গেল! চাহিয়া দেখি একটা জানালার শার্শি দিয়া গৃহাভ্যন্তরের দীপরশ্মি বাহিরে, ঠিকরিয়া পড়িয়াছে। আলোকের গতিতে অনুমান করিলাম, দীপধারী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্রুত গতিতে কোথায়ও চলিয়াছে। একটা থামের পার্শ্বে আত্ম-গোপন করিলাম। যাড়া আধঘণ্টা আর কোন সাড়া শব্দ নাই! সহসা আবার সেই আলোক রশ্মি। এবারে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল, আলোকধারী বোধহয় ফিরিয়া গেল। কোন লোকের ছায়াও দৃষ্টিগোচর হইল না,—আলোক সুদূর কোন অভ্যন্তর-কক্ষ হইতে সুবৃহৎ দরজার মধ্যে দিয়া আসিয়া শার্শিতে পড়িতেছিল। সেই আলোকে, অস্পষ্টরূপে হইলেও দেখিতে পাইতাম,—আমার সম্মুখের কক্ষটি শূন্য,—তাহার

একটা পাশের প্রকাণ্ড দরজাটি খোলা,—তাহার ভিতর দিয়া অপর কক্ষের আসবাবপত্র দেখা গেল,—আল্‌না বা আর বা কিসে কাপড় চোপড় ঝুলান আছে যেন।

আর কিছুকাল তথায় সেই ভাবে অপেক্ষা করিয়া, সংকল্প স্থির করিলাম। পায়ের নীচেই যাতায়-পাতা কঙ্কর, পাথরের খোয়া—তাহার একখানা তুলিয়া লইয়া জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। আবার সেই ভয়াবহ নীরবতা! অন্যের যাহাতে ত্রাস—আমার তাহাতে আনন্দ—সুযোগ! অতি সন্তর্পণে পাথরের আঘাতে কাচ ভাঙ্গিয়া সেই শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমার তখন কি ভীষণ অবস্থা! সমস্ত দেহটা তখন আমার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে; শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নাই যেন—কণ্ঠ-নালী শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে,—চুরির উদ্দেশ্যে এ ভাবে পরগৃহে প্রবেশ আমার জীবনে এই প্রথম! কখন বা ধরা পড়ি!

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যতদূর সম্ভব সাবধানে অপর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছি! আবার যদি সেই আলোকধারী দেখা দেয়। দিলই বা সে ত এ কক্ষে আসে না।

এক পা—দুই পা—তিন পা! এটা কি! টেবিল! পার্শ্বে ফিরিতেই চেয়ার—মরণ আর কি—পদে পদে বাধা! শব্দ হইলেই গিয়াছি! হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—টেবিলের উপরে কিছু নাই তাহার উপর দিয়া—টেবিল পার হইলেই হয়ত কাপড়ের আল্‌না! টেবিলের উপরে উঠিতেছি—একি! কি ভয়ানক! কি একটা মাথায় ঠেকিল! এঁ! মানুষের পায়ের মত,—শক্ত—হিম—এমন ভাবে ঝুলান কেন! মরা! গলায় দড়ি—ফাঁসী লটকাইয়া কি কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে! কি বিপদ! এ কি হইল! ভয়ে আমার চেতনা লোপ পায় বুঝি! টেবিল হইতে নামিতে চেষ্টা করিলাম! একখানা চেয়ার সশব্দে উল্টাইয়া পড়িল! তাহার পর কি হইল জানিনা—কেবল মনে হইতেছিল—আমাকে মহা অন্ধকার গ্রাস করিতেছে, অতল তিমির সাগরে ডুবিতেছি—আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতেছে সেই আত্মঘাতী প্রেত!

কাহার কর স্পর্শে যেন জাগ্রত হইলাম,—চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখি সম্মুখে ঝুলিতেছে সেই জীবনহীন দেহ—আবারই পার্শ্বে আলোক হস্তে একজন ভদ্রলোক। চেহারা তাহার যেমন রুক্ষ, দৃষ্টিও তাহার তেমনি ভয়ানক—আমার দিকে কুটিল কটাক্ষে কট্‌মট্ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! চক্ষু মুদ্রিত করিলাম; চৈতন্য অপেক্ষা অচৈতন্যই আমার তখন শ্রেয়!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা।

—:০:—

হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়েই এমন অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, দেশাচার বশতঃ যাঁহাদের ধারণা হইয়া আছে যে, শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা, বিশেষতঃ বেদাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা এবং ওঙ্কার উচ্চারণাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ। আমি জানি যে অনেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের বেদাদি পঠনপাঠনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন না। বর্ত্তমানে অনেকেই স্ত্রীকন্যাদিগকে শ্বশুর বাড়ী হইতে বা পর বাড়ীতে পত্রলেখা প্রভৃতি নিতান্ত অপরিহার্য্য কার্য্যে যতটুকু, আবশ্যক ততটুকুই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই বিষয় সুপ্রসিদ্ধ গুরুবংশীয় মদীয় বন্ধুবর কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে সামান্য সামান্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক অধ্যাপন করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর উভয়েরই ইচ্ছা থাকিলেও শাস্ত্রের নিষেধ ভাবিয়া তিনি তাঁহার সহধর্ম্মচারিণীকে উপনিষদাদি শিক্ষা দিতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর আমার সহিত আলোচনায় যখন বুঝিলেন যে স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, বরঞ্চ শাস্ত্রসম্মত, তখন তিনি সহস্র লোকাপবাদ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুখের বিষয় যে তাঁহাদের বংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণের বংশ; সেই বংশে ব্রাহ্মণোচিত উদারতা যথেষ্ট আছে, তাই তাঁহাকে জ্ঞাতিবিরোধ এবং তদানুষঙ্গিক লোকাপবাদও সহ্য করিতে হয় নাই।

শাস্ত্রাদি আলোচনা যতদূর করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীলোককে বেদাদি পঠনপাঠনের, সুতরাং উচ্চশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই। আদি শাস্ত্র বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষরূপ অনুমোদিত ছিল। অথর্ব্ববেদে আছে "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং" কন্যা

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি প্রাপ্ত হয়েন। কন্যা যদি উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পতি লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থে যে ইন্দ্রিয়সংযমের সহিত বিদ্যাভ্যাস, বিশেষত বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস, তাহা শ্রুতিস্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য হইতে বস্তুত পৃথক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং" (পট ৪, কং ১৫) স্ত্রী ও পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য একই প্রকার হইবে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় যে পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষে মিলিত ভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ববারা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক মন্ত্রদ্রষ্টী ঋষি ছিলেন এবং ঋত্বিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যজ্ঞ সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদিগের যখন ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেও কোন বাধা ছিল না, তখন বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জনের কার্য্যে যে তাঁহাদিগের কোনও বাধা ছিল না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাই গোভিলগৃহ্যসূত্রে যে মন্ত্র আছে যে "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে পত্নী গৃহ্য অগ্নিতে ইচ্ছা করিলে হোম করিবে," সেই মন্ত্রের টীকাকার লিখিয়াছেন যে "পত্নীকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে, কারণ পত্নী হোম করিবে এই বচনের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পত্নী বেদ অধ্যয়ন না করিয়া হোম করিতে সক্ষম হয় না।"[১] গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্রপাঠের বিস্তর উপদেশ ও অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোভিল দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞবিষয়ে মানতন্তব্য নামক আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে মতটী এই যে, গৃহকর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে গৃহে অবস্থিত গৃহকর্ত্রীর দ্বারাও উক্ত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে পারিবে—এই যজ্ঞের পূর্ব্বদিবসে উপবাস করিতে হয়, (নির্জ্জলা উপবাস বিশেষরূপে নিষিদ্ধ), এবং সেই উপবাস-দিবসের রাত্রিকালে বৈদিক ইতিবৃত্ত (যথা, ব্রহ্মাহং বা ইদমেকমগ্র আসীৎ ইত্যাদি) আলোচনা করিয়া অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্মালোচনায়

১ পুরুষার্থপ্রকাশ গ্রন্থে স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত—"পত্নীমধ্যাপয়েৎ কস্মাৎ পত্নী জুহুয়াদিতি বচনাৎ নহি খল্বনধীত্য শক্নোতি পত্নী হোতুমিতি।" পৃঃ ৬৭

যাপন করিতে হয়। বিবাহের প্রারম্ভভাগেও কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। গৃহ্যসূত্রাদির অনেক স্থলেই দেখা যায় যে নানা কার্য্যোপলক্ষেই স্ত্রীলোকদিগের বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। কেবল গৃহকর্ত্রীই যে বেদমন্ত্র পড়িয়া কার্য্য করিতেন তাহা নহে; গৃহের নাপিতানী পরিচারিকা প্রভৃতিকেও অবস্থাবিশেষে বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। এখনও হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি আছে তৎসমুদায়, বিশেষত বিবাহবিধি আলোচনা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আজ পর্য্যন্ত কেহই বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তবে অধুনা উপযুক্ত পুরোহিত এবং স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সেগুলি প্রায়ই কন্যাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই—শ্রৌতসূত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, "বেদ পত্নীকে প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করাইবে।" ২ ইহার উপর অন্য স্পষ্টতর কোন প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। আজও সেই অমূল্য সনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবাহকালে কন্যার হস্তে সচরাচর চণ্ডীগ্রন্থ রক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যখন দেখি যে, স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কোন কোন নবীন আচার্য্য উপরোক্ত সরল মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক "বেদ" শব্দের অর্থে "কুশ" অর্থ করিয়া বলিয়াছেন যে কন্যার হস্তে কুশ অর্পণ করিয়া পাঠ করাইবে। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে এই শেষোক্ত অর্থ কেমন যেন একটু অসঙ্গত বলিয়া কি বোধ হয় না?

বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের যেমন সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগকে তাহার উপযুক্ত পাত্র করিতেও বিরত হন নাই। তখন বাল্যকালে উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা যেমন পুরুষের অধিকার ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও পক্ষে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন একটী গুরুতর অধিকার ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিতেছেন যে, বিবাহের প্রারম্ভেই "বস্ত্রাচ্ছাদিত, যজ্ঞোপবীতযুক্ত কন্যাকে (অগ্নির পশ্চাতে) নিজাভিমুখ

২ বেদং পত্নৈ প্রদায় বাচয়েৎ।

করত সমীপে আনাইয়া 'প্রমে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে।" ৩ ইহা হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে তখন স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীত ধারণ এবং কুমারী অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা সামাজিক ছিল না, প্রত্যুত এ সম্বন্ধে সামাজিক বিধিই ছিল। এই মতের সপক্ষে গোভিল যে একরথী ছিলেন তাহা নহে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও উপনিত ও অনুপনীত স্ত্রীলোকের স্পষ্টই উল্লেখ আছে "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ।" এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া পরাশর স্মৃতির মাধবাচার্য্যে লিখিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল, ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদিগের রীতিমত উপনয়ন, অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষা প্রভৃতি অবলম্বনীয় এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী না হইয়া গৃহলক্ষ্মী হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের যে-সে রকমে নামে মাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। ৪ ভাষ্যকার শাস্ত্র হইতে স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার প্রথা পাইয়াছেন, কিন্তু দেশাচার বশত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের বিবাহকালে যে-সে রকমে উপনয়ন দিবার কথা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে ভাষ্যকারদিগের মতামতের জ্বালায় এত সম্প্রদায়ের এবং এত বিবাদকলহের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতেই আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক কালে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ধারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটা নিয়মিত প্রথা ছিল। এরূপ নিয়মিত প্রথা বৈদিক কালের শেষ ভাগেও প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সম্বাদ। এই দুইটী সম্বাদ এত প্রচলিত যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করি না। যাই হৌক, আমরা বেদের মধ্যে স্ত্রীলোকের যেরূপ শিক্ষার এবং যে সকল অবস্থায় স্বাধীনতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহা একটু অনুধাবন পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারে, মনের স্বাভাবিক গতি

---

৩ প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনামভ্যুদানয়ন্ • • • যাচয়েৎ প্রমে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতামিতি।

৪ "দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষা ইতি বধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।"

অনুসারেই হউক, বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের দিকে, গৃহস্থের গার্হস্থ্য সুখশান্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

এইবারে স্মৃতিগ্রন্থসমূহে, বিশেষতঃ মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায় দেখা যাউক। পূর্ব্বেই আভাস দিয়া আসিয়াছি যে মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষার বিধিনিষেধ কিছুই দেখা যায় না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে বৈদিক কাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চলিয়া আসিতেছিল, মনু তাহার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু মনুসংহিতা যে সকল উপায়ে গার্হস্থ্য সুখশান্তির বৃদ্ধি হইতে পারে সেই সকলের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল উপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীলোকের বেদবেদান্ত শিক্ষা করিয়া পণ্ডিতা হইবার অপেক্ষা পতিসেবা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি যে গৃহের সুখশান্তির অধিকতর অনুকূল, মহর্ষি মনু তাহা বুঝিয়া তাহারই জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥ ২ অ, ৬৭

স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে বৈবাহিক বিধি বৈদিক সংস্কার, পতিসেবা গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্ম অগ্নিপরিচর্য্যারূপে স্মৃত হয়। এই শ্লোক হইতেই কেহ যেন ইহা না বুঝেন যে মনু স্ত্রীলোকের উপনয়ন নিষেধ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন।* এই শ্লোকটী আমাদের যেন কতকটা অর্থবাদ বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের বোধ হয়, মনুর মতে গুরুকুলে বাস করিয়া একটা লোকদেখান ব্রহ্মচর্য্যের ভাব অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিসেবাতেই বাস্তবিক ধর্ম্মবৃত্তির সম্যক চর্চ্চা এবং বিশেষ কঠোর পরীক্ষা হয়—পতিসেবাতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের ফললাভ হয়। মনু স্ত্রীজাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও ধর্ম্মের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন "গৃহকর্ম্মে নিপুণ থাকিয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, এবং ব্যয় করিবার সময় মুক্তহস্ত হইবেন।" অন্যান্য সংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিককালে

* মনুসংহিতার ভাষ্যকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক এই শ্লোকটী স্ত্রীলোকের উপনয়ন দেবার নিষেধজ্ঞাপক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

যেরূপ স্ত্রীলোকের বাল্যকালে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা প্রথা ছিল, তাহাও যে মনুর সময়ে অনুপযোগী ও অপ্রচলিত বোধ হইয়াছিল তাহা নহে; মনুর সময়েও এই প্রথা সম্পূর্ণই প্রচলিত ছিল। তবে, মনুসংহিতার একটী শ্লোকে জাতকর্ম্ম অবধি উপনয়ন ও কেশান্ত পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ৬ আমরা যখন দেখিতেছি যে গৃহ্যসূত্রাদি বৈদিক গ্রন্থে স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার অমন্ত্রক করিবার বিধি নাই ৭ এবং বিষ্ণুসংহিতার ন্যায় প্রাচীন সংহিতাতেও মাত্র চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত বৈদিক বিধির অনুসরণে স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ৮ তখন মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকটী বেদবিরুদ্ধ এবং প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়। মনুসংহিতায় যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে, একথা অতি পক্ষপাতী, নিতান্ত orthodox লোকদিগেরও স্বীকার করিতে হইবে। মনুসংহিতার অতি প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বয়ং নবম অধ্যায়ের একটী শ্লোককে ৯ অমানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সে কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং সুতরাং আমাদিগকেও মনুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত শ্লোক স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যাহা হৌক, যদি বা উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলেও আমরা সেই

৬ অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥ ২অ, ৬৬

৭ গোভিলগৃহ্যসূত্রে কন্যার চূড়াকার্য্য অমন্ত্রক করিবার বিধি দেখা যায়। ২প্র, ৯খ, ২২-২৪

৮ এইখানে বিষ্ণুসংহিতার একটু কৌশল দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুঋষি চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বর্ণন করিয়া বলিলেন "এতা এব ক্রিয়া স্ত্রীণামমন্ত্রকাঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের এই কার্য্যগুলিমাত্র (এব নিশ্চয়ার্থে; এতা এব অর্থাৎ এইগুলিই) অমন্ত্রক অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পরেই তিনিই স্ত্রীলোকের বিবাহ বিষয়ে বলিলেন "তাসাং সমন্ত্রকো বিবাহঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বিবাহ সমন্ত্রক। ইহার পরে তিনি পুনরায় সাধারণভাবে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন প্রভৃতির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৯ ৯অ, ৯৩

শ্লোকের প্রমাণেই জানিতে পারিতেছি যে মনুসংহিতার সময়েও সমন্ত্রকই হউক অথবা অমন্ত্রকই হউক, স্ত্রীলোকের উপনয়ন প্রথা এবং সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতও অবলম্বনীয় ছিল। কেবল একমাত্র অত্রি সংহিতায় দেখি যে, স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন প্রভৃতি পাতিত্যজনক। হইতে পারে যে অত্রির মত এইরূপ ছিল; হয়তো তিনি কোন বিশেষ কারণে ঐরূপ মত স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া বেদের বিরুদ্ধে, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিরুদ্ধে, ঐ মতকে সর্ব্বগ্রাহ্য বলিয়া ধরিবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না।

সংহিতাগ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি পুরাণের মধ্যে অবগাহন করি, সেখানেও দেখি যে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোন কথাই নাই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত। সকলেই জানেন বোধ হয় যে, বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি আপামর সাধারণের সহজবোধগম্য নহে বলিয়া ব্যাসদেব অতি বিদ্বান্ হইতে অতি মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি বেদাদিশাস্ত্রসমূহের মধ্যস্থিত নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয় সকল এই মহাভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গল্পচ্ছলে শিক্ষার সুগম পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন বিধিনিষেধ নাই; কিন্তু ইহাতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের দ্রৌপদীচরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিকস্থলে পণ্ডিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বনপর্ব্বের একস্থানে আছে, "অত্র শর্ব্বা শিবা নাম ব্রাহ্মী বেদপারগা" ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জনকরাজকে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে তাঁহার পত্নীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময় যে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা সমগ্র মহাভারতের স্ত্রী-চরিত্র আলোচনা না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু অতি বিদুষী হইবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিশুশ্রূষা ও গৃহকর্ম্ম সুনিপুণ ভাবে সম্পাদন করা যে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরম ধর্ম্মজনক, তাহা ব্যাসদেব স্পষ্ট করিয়া অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যদি গৃহকে শ্রীমান্ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের পতিপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্ম-নিপুণা হইতে হইবে। মহাভারতের সময়েও বোধ হয় যে লোকেরা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষায়

বিরোধী ছিলেন না, তবে স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষার দিকেই সর্ব্বসাধারণের স্বভাবতই অধিক আগ্রহ ছিল দৃষ্ট হয়।

আমরা বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, সকলেতেই স্ত্রীশিক্ষার পরোক্ষ বিধি ও উপদেশ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একটীতেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সাধারণ অধিকার আছে, এবং দু'একটি স্মৃতি ভিন্ন বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই সেই সকল অধিকার বিলুপ্ত করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই, বরং সমর্থনই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও সেই অব্যক্ত অধিকার সুব্যক্ত হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অব্যক্ত অধিকারকে সুব্যক্ত করিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকেও যে ভাবে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়াছেন, কন্যাকে তদপেক্ষা একটুকু ন্যূন করিয়া দিতে উপদেশ দেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে "পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালনপালন করিবে, তাহার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিখাইবে। বিংশতি বৎসরাধিক বয়স্ক পুত্রদিগকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে।"* ইহার পরেই সেই স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক সুবিখ্যাত অনুশাসন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" অর্থাৎ কন্যাকেও অতি যত্নসহকারে এই প্রকার অর্থাৎ পুত্রদিগের ন্যায় পালন করিতে ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় যে তন্ত্রের কিছু পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাই তন্ত্রকারগণ তাহার সপক্ষে এই অনুশাসন করিয়া দিলেন। তন্ত্রের পূর্ব্বে অথবা সমসময়ে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন হউক বা নাই হউক, নানা কারণে, সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বিপ্লবাদির কারণে, স্ত্রীশিক্ষার যে অপ্রচলন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষের কথা আলোচনা করিবার কালে দেখিতে পাইব। তৎপূর্ব্বে আমরা দেখিয়া লই যে ব্যাকরণ প্রভৃতিতেও স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ সমর্থন প্রাপ্ত হই। পাণিনি কৃত ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্যে আছে "কাশকৃৎস্নি কর্ত্তৃক প্রোক্ত মীমাংসাকে কাশকৃৎস্না বলা যায় এবং যে ব্রাহ্মণী তাহা অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী বলা যায়।" আর "যে স্ত্রীলোকের কাছে আসিয়া লোকে অধ্যয়ন করে, তাহাকে উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়া বলা যায়।" হেমাদ্রিকৃত

চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে আছে "কুমারী কন্যাকে বিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। যে কন্যা বিদ্যাশিক্ষা করেন তিনি পতি তথা পিতৃ উভয় কুলেরই কল্যাণদায়িকা হয়েন। উপযুক্তা কন্যাকে বিদ্বান বরের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য ও ইহাই পুরাতন ঋষিদিগের মত। যাবৎ কন্যা পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্ম-শাসন অজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ পিতা সেই কন্যার বিবাহ দিবেক না।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন বিদেশীয় সভ্যতায় নারীর স্থান

(সঙ্কলন)

আজকাল আমাদের মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে "বর্ত্তমান সমাজে নারীর স্থান কোথায় এবং কি হওয়া উচিত—" এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে এবং উক্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য যত প্রকার মত সম্ভব ক্রমশঃ তাহা প্রকাশিত হইতেছে। এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মিমাংসা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও এ সকল আলোচনার যে একটা সার্থকতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যথার্থ মিমাংসায় উপনীত হইবার জন্য ইহারা সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করিয়া থাকে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আশা করি আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা সম্পূর্ণ বিফল ও অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

প্রাচীন বিদেশীয় সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা সেই সময়ের নারীজাতির সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হই। সকল সভ্যতারই প্রারম্ভ কাল হইতে পূর্ণ পরিণতির অবস্থা পর্য্যন্ত সমস্ত ধারাটীকে তিন অংশে ভাগ করা যাইতে পারে—আদিযুগ, মধ্যযুগ ও শেষযুগ। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই তিন যুগেই কোন বিশেষ দেশের বা সভ্যতার রাষ্ট্র এবং সমাজ স্বীয় আদর্শ প্রাপণের পথে অগ্রসর হয়। পরিবর্ত্তন ও বিকাশ যখন

সকল সমাজ সঙ্ঘেরই নিয়ম, সভ্যতার যুগত্রয়ে নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন তখনখুবই স্বাভাবিক।

প্রথমতঃ—বাবিলনীয় সভ্যতার কথা। বাবিলনীয় সভ্যতার আদিযুগে বাবিলনীয় নারী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে এবং স্বামী ও ভ্রাতার সঙ্গে সমান অধিকারে অধিকারিণী ছিল। মধ্যযুগে নারীর অধিকারের সীমা কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ করা হইলেও—শেষ যুগে (Neo Babylonian Age) সে তাহার পূর্ব্ব অধিকারে আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মিশরের ইতিহাসেও নারীর অবস্থা শেষভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী মিশর সভ্যতার ইতিহাস নারীজাতির বিজয়ের ইতিহাস। সার্দ্ধ ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরে নারী ও পুরুষ তুল্য গণ্য হইত। Amelineau নামে একজন লেখক বলিয়াছেন—"It is the glory of Egyptian morality to have been the first to expsess the Dignity to Woman." অর্থাৎ মিশরজাতির নৈতিকতার সম্বন্ধে এ একটী বিশেষ গৌরবের বিষয় যে নারীর মর্য্যাদা এখানেই সর্ব্বপ্রথমে ঘোষিত হইয়াছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর বিবাহজাত "সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা" মিশরে এক অজ্ঞাত বস্তু। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধয়িত্রী দীর্ঘকালস্থায়িনী এই দুই সভ্যতার সমাজ ক্ষেত্রে নারীর উন্নত অবস্থা নারীজাতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যাপার।

তারপর ইহুদী-জাতির কথা। পুরুষের দাসীত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নারী কি উপায়ে আপনাকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছিল ইহুদীর ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা তাহাই জানিতে পারি। উক্ত সভ্যতার প্রথম অবস্থায় স্বামী বিনাকারণে আপনার ইচ্ছানুসারে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিত। ঐ সমাজ, পুরুষের এ অধিকার "পিতৃতন্ত্র" (Patriarchy) শাসনলব্ধ নহে,—ইহা বিবাহজাত প্রভুত্বেরই ফল। কিছুকাল পরে যখন নারীজাতি সমাজে আপনাকে একটু প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল তখন পুরুষের এই স্ত্রী পরিত্যাগের অধিকার ক্রমশঃ খর্ব হইয়া আসিতেছিল এবং ইহার চিহ্ন ইহুদীর ধর্ম্মগ্রন্থের এক অধ্যায়ে Book of Denteronomyতে আমরা দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় ১০২৫ সনে পুরুষের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া সমাজে এমন অবস্থা আসিয়াছিল যে বৈধ কারণ ব্যতীত কিম্বা স্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন স্বামীর পক্ষে পত্নীত্যাগ কখনও সম্ভব হইত না। এবং এতৎসঙ্গে স্ত্রীরও

একটী অধিকার জন্মিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার নিজকে পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বামীকে বাধ্য করিতে পারিত। এই ভাবে ইহুদী আইন প্রণেতারা তাহাদের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকার সীমা ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিতেছিলেন।

আরব সমাজেও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকার বাড়িয়া চলিয়াছিল। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মেদিনার নিয়মানুযায়ী স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পাইবার দাবী কিছুই ছিল না, থাকিলেও তাহা অত্যন্ত সামান্য ছিল। কিন্তু কোরাণ এই নিয়মটীর পরিবর্ত্তন সাধন করে এবং নারীর অবস্থা উন্নত করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

রোমক সভ্যতার আদিযুগে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা সবিশেষ জানি না। যে সময় হইতে রোমকের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের উপর প্রথম আলোক রেখা বিচ্ছুরিত হইল সে সময়ে "পিতৃতন্ত্র"—(Patriarchy) রোমসমাজে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এই পিতৃতন্ত্রের নিয়মানুসারে নারী জাতির উপর যে এক কঠোর বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা অনেকটা 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি" এই অপ্রিয় কথাটির মত। পিতৃতন্ত্র-শাসিত সমাজের নিয়ম এই যে নারী বিবাহের পূর্ব্বে পিতার অধীন ও বিবাহের পরে সম্পূর্ণ স্বামীর বশ্য থাকিবে। সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রোমক সভ্যতারও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ হইতেছিল এবং রোমক আইনও অতি বিস্ময়জনকরূপে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিল। নারীর অবস্থার উৎকর্ষসাধন রোমক আইনের এক গৌরবময় দান। রোমক সাধারণতন্ত্রের শেষ ভাগে নারী পুরুষের তুল্য অধিকার লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালেও Antonious এর সময়ে আইন প্রণেতারা নারী ও পুরুষের তুল্য অধিকার ন্যায়ের একটি প্রধান স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। Hobhouse বলিয়াছেন "The Roman matron of the Empire was more fully the own mistress than the married woman of any earlier civilisation, with the possible exception of a certain period of Egyptian history, and it must be added than the wife of any later civilisation down to our own generation."

Juvenal ও Tacitus এর বিদ্রূপাত্মক রচনার উপর নির্ভর করিয়া—অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন যে রোমক রমণীরা স্বাধীন হইয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছিল এবং নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবনযাপন করিতেছিল। বিদ্রূপাত্মক রচনার মধ্যে কোন

সভ্যতার যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না। Hobhouse তাহার morals in Evolution গ্রন্থে বলিয়াছেন যে পূর্ণস্বাধীনতা ভোগ কালে রোমক নারীরা স্বামীর সহচরী, পরামর্শদাত্রী সখী-রূপে যথোচিতভাবে বিরাজ করিতেন—সমাজে যখন তাহাদিগকে পুরুষের বশবর্ত্তিনী হইয়া কালাতিপাত করিতে হইয়াছে তখন তাহারা যেমন ছিলেন স্বাধীনতার সময়েও তাহারা তদ্রূপ ছিলেন। স্বাধীনতা তাহাদিগের মধ্যে কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা বা সংযমহীনতা আনয়ন করে নাই।

ক্রমশঃ —

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

অশ্রুকণা!*

এখনো বহিছে অশ্রুধার
ছিত-হারা চিত-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত শোকের পাথার!
এ কি শুনি পুনরপি বিধির নির্ম্মম অত্যাচার,
লিখনে লেখনী পঙ্গু, বর্ণনায় ভাষা মানে হার।
বচনে আড়ষ্ট কণ্ঠ, শ্রবণে শ্রবণে পড়ে বাজ,
'ইহধামে নৃপ-চন্দ্র জিত-ইন্দ্র নাহি আর আজ!'
সুনীতি-অঞ্চল-নিধি, ইন্দিরার ফুল্ল-ইন্দিবর,
মেঘমুক্ত অংশুমান্ অৰ্দ্ধ পথে হ'ল হীনকর!

* কোচবিহারাধিপতি মহারাজা স্যার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের পরলোক গমন উপলক্ষে বিরচিত।

হর্ষবিষাদের এ কি নিষ্করুণ সুকঠোর ছল,
জন্মোৎসবে শোক-যাত্রা,—সুধা-হ্রদে তীব্র হলাহল!
মুহ্যমান রাজ্যবাসী চারিধারে শুধু হাহাকার,
কোন্ পাপে এত তাপ পুনঃ পুনঃ সহিছে বিহার।
কোন্ দোষে হে শাম্ভব! অকালে সকল পরিহরি,
পার্থিব ঐশ্বর্য্য শিরে ঘৃণাভরে পদাঘাত করি,
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত-নিধি মিশাইলে গিয়া সুরলোকে,
অন্ধজ্ঞান আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া চিরশোকে!

বাক্যে নহ 'নৃপমণি',—লুব্ধ চাটুকার প্রিয়ভাষ,
মর্ত্ত্যের উপাধি ধরি' করিব না তব পরিহাস!
অনেকে চিনেছে তোমা—অনেকেই বুঝিয়াছে মনে,
সত্য মিথ্যা একবার দেখ আসি আপন নয়নে।
সর্ব্বসাধারণ আজি সহায় ডাকিছে একবার,
পথের বালক কাঁদে কোলে তব উঠিতে আবার!
নিজে এসে দাও দান,—সেই অন্ধ যাচে পুনরায়,
ঋণমুক্ত করে দাও অধমর্ণ করে হায় হায়!
অই যে অনাথা কাঁদে তব শীতবস্ত্র গায় দিয়া,
ভুখারী ভিখারী তব কাঁদে ভিক্ষাপাত্র করে নিয়া!
উৎসব-প্রাঙ্গণে ডাকে—উৎসাহের পূর্ণ অবতার!
ব্যসনে—বিষাদনেত্র প্রত্যক্ষ আশীষ দেবতার!

লোক-হিত-ব্রতকল্পে অফুরন্ত হৃদয়ের বল
সহসা লুকালে কোথা, হে কৌশলি এ কোন্ কৌশল !
স্বার্থলোভে রাজ্যবাসী বিরক্ত করিছে অনিবার,
তাই কি হয়েছে রোষ ?—ক্ষম দোষ, এস একবার !

*　　*　　*

দেখে যাও শোক-যাত্রা, মসীময়ী বিহার নগরী,
গগন তপন ম্লান শোক-চিহ্ন মেঘবাস পরি' !
শ্রেণীবদ্ধ দাঁড়াইয়া অন্ত্য-ভূমি তরঙ্গিণীকূলে,
অবশ অমাত্যবর্গ শোক ভাষে ভাসি শোকাকূলে।
স্মৃতি-সূত্র আকর্ষিয়া এক দিকে টানে আপামর,
আর হস্ত ধরি ভূপে সমাদরে ডাকিছে শঙ্কর।
দক্ষিণে 'নৃপেন্দ্র' পিতা সৌম্যকান্তি প্রফুল্ল আনন,
অগ্রজ 'রাজেন্দ্র' বামে পারিজাত ভূষা সুশোভন !
পশ্চাতে অনুজ 'হিত' স্ফীত বক্ষ ভ্রাতৃসমাগমে।
চারিধারে দেববালা পুষ্পমালা বরিষে সম্ভ্রমে !
বৃথা আশা !—কার শিরে আশীষ কুসুম বরষিয়া,
ক্রমে ক্রমে দেবজ্যোতিঃ দিব্য পথে গেল মিশাইয়া !
সম্মুখে উন্মুক্ত শূল,—জ্বলিয়া উঠিল হেনকালে
শঙ্করের রক্ত-নেত্র প্রতীচীর পাণ্ডুর কপালে।
কি তীব্র বিষম জ্বালা ! দগ্ধীভূত হৃদি-অন্তস্তল,
অশ্রুকণা বরষণে শত বর্ষে হবে না শীতল
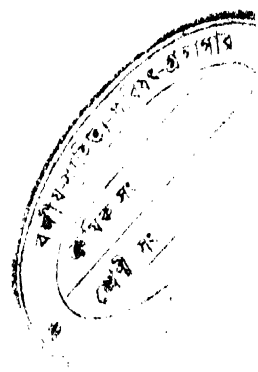
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

শোক সংবাদ।

—:o:—

কি মহাশোকে আজ কোচবিহারবাসী অভিভূত! আমরা বিগত মাসে যখন শ্রীশ্রীমহারাণী মহোদয়ার কথঞ্চিৎ সুস্থ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া কত আশায় লিখিয়াছিলাম, মহারাজ সত্বরই মহারাণীসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিল, যে অচিরে এরাজ্যে অকস্মাৎ এরূপ কঠিন কুলীশাঘাত হইবে!—এ রাজ্যের অধিবাসীবর্গকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করিয়া আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয়, প্রজাবৎসল মহামনা মহারাজ এত সত্বর অকালে মহাপ্রস্থান করিবেন! আজও যাঁহার সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি মানস-নয়নে স্পষ্ট জাজ্জ্বল্যমান, তাঁহার এ আকস্মিক অন্তর্ধান কি অসহনীয়, কি মর্ম্মন্তুদ! মহারাজের অভাবে আজ কোচবিহার রাজ্যময় যে হৃদি-বিদারক হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে—রাজপরিবার, প্রকৃতিপুঞ্জ, কর্ম্মচারীবৃন্দ, সমস্ত অধিবাসী, ধনী নির্ধন, দীন দুঃখী শত সহস্র প্রাণ এক মহাপ্রাণের মহাপ্রস্থানে আজ আত্মীয় বিয়োগজনিত শোকাপেক্ষা তীব্র মর্ম্মবেদনায় যে ভাবে আত্মহারা—মুহ্যমান, তাহা হইতেই অনুমেয় মহারাজ সকলের কত প্রিয় ছিলেন। যেই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহাকেই তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। তিনি এরূপ নিরহঙ্কার ছিলেন, তাঁহার ব্যবহার এমন মধুর ছিল যে লোকে তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা অপেক্ষা আত্মীয় বলিয়াই অধিক ভালবাসিত। তিনি ধনী ও নির্ধনকে একই চক্ষে দেখিতেন, একই ভাবে স্নেহসমাদর করিতেন—তাই তাঁহার অভাব এরূপ তীব্রভাবে সকলের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছে!

মহারাজের বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি ১৮৮৬ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন—সেই ২০শে ডিসেম্বরই দেহত্যাগ করিলেন! একে একে তিনটি ভ্রাতা, পিতা নৃপতিশ্রেষ্ঠ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের সহিত মিলিত হইলেন। সে যেন কল্যকার ঘটনা—মহারাজ রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ এই নয় বৎসর পূর্ব্বে, জিতেন্দ্র নারায়ণ দুই বৎসর পূর্ব্বে কি মহাশোকে সর্ব্বজনকে নিমজ্জিত করিয়া অকালে চলিয়া গেলেন—সে ক্ষত শুষ্ক না হইতেই আবার এই অসহ্য আঘাত!

মাতা মহারাজমাতা, মহারাণী, পিতৃহারা শিশু মহারাজকুমার মহারাজকুমারীগণ, ভ্রাতৃহারা নৃতেন্দ্র নারায়ণ কি করিয়া এই মর্ম্মান্তিক শোক সহ্য করিবেন—রাজ্যবাসী যে শোকে অধীর, আত্মহারা—সে শোকে রাজপরিবারের সান্ত্বনাজনক প্রবোধ বাক্য আর কি আছে!—কেবল সেই সর্ব্বশোকসন্তাপহারীর কৃপাই ভরসা—তিনি সমস্ত শোকার্ত্ত প্রাণকে রক্ষা করুন।

—

নিয়তি।

—:o:—

(টুর্গেনিভ হইতে)

আমি একলাটি এক মুক্ত মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে হল, কে যেন ধীরে, ধীরে—অতি সাবধানে আমার পিছু পিছু আসচে। ঘুরেই দেখি—এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা। ধূসর কম্বলে তার সারা গা ঢাকা, শুধু মুখখানা দেখা যাচ্ছে।

উঃ, কি ভীষণ চেহারা! গায়ের চামড়া তার কুঞ্চিত,—রংটা একেবারে ফ্যাকাসে হলদে হয়ে গেছে,—নাকটা অসম্ভব রকমের তীক্ষ্ণ,—দাঁতের চিহ্নও নেই! আমি তার কাছে এগুতেই সে কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুমি কে? [illegible] চাও? ভিক্ষুক? ভিক্ষা নেবে?' বুড়ী একটা কথারও জবাব দিল না। আমি তা[illegible]কে [illegible]তেই দেখি, তার চোখ দুটি একটা স্বচ্ছ আবরণ—না চামড়া দিয়ে ঢাকা। [illegible] কোন পাখীরও এমনি আবরণ দেখেছি। এ দিয়ে তারা আলোর ঝলক্ থেকে চো[illegible] দুটিকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু বৃদ্ধার এই আবরণ মোটেই নড়ে না,—চোখও যে মেলে না! আমি ভাব্লুম—এ অন্ধ!

আবার জিজ্ঞেস কর্লুম—'তুমি কি ভিক্ষা নেবে? আমার পিছু লয়েছ কেন?' পূর্ব্বের মত এবারেও সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না,—কেবল একটু কেঁপে উঠ্ল।

আমি আবার আমার নিজের পথে চল্লুম। এবারও আমার পেছনে তেমনি সাবধানী—চোরা-পা ফেলার শব্দ শুনতে পেলুম।—'আবার সেই বুড়ী!'

আমি নিজ মনেই ভাব্তে লাগ্লুম—'সে আমার অনুসরণ করছে কেন? অন্ধ কিনা, তাই বুঝি আমার পা ফেলার শব্দ শুনে চল্‌ছে,—ভরসা যে এইভাবে সে লোকালয়ে যেতে পারবে! ও, তাই হবে!'

কিন্তু কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা এসে আমাকে ঘিরে ফেললে! আমার মনে হতে লাগ্‌ল, সে শুধু আমার পিছু নেয়নি,—আমাকে যেন তার খুসী মত ডানে-বাঁয়ে ঘুরাচ্ছে,—আমি অনিচ্ছাস্বত্বেও কলের পুতুলের মত তার আদেশ মেনে চল্‌ছি!

আমি আবার চলতে সুরু ক'রলুম। কিছু দূর যেতেই দেখি, পথের মাঝখানে এক বিরাট কালো গর্ত্ত। অমনি আমার মগজে জেগে উঠ্‌ল—'এ যেন কবর! বুড়ী আমাকে এ দিকেই টেনে আন্‌ছে!' আমি তাড়াতাড়ি পিছে সরে পড়লুম। বুড়ী আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হাঁ তাই ত, সে যে দেখ্‌তে পারে! পাখী যেমন শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেম্‌নি করে সে তার বড় বড় হিংসা ভরা চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল! আবার মুহূর্ত্ত পরেই দেখি—চোখ নিশ্চল! এ কি ধাঁধায় পড়লুম!

'এ বুড়ী কি তবে আমার নিয়তি! নিয়তি?—যার হাত থেকে কারুরই মুক্তি নেই!'

আমি পাগলের মত ও-পথ ছেড়ে আর একদিকে ছুটলুম। খুব দ্রুত ছুট্‌লুম............ তবু সেই সন্তর্পিত পদ-শব্দ আমার পিছু-পিছু ছুটে আসছে! আমার [illegible]নেও দেখি আবার কালো গর্ত্ত! আবার আর এক পথে ছুট্‌লুম............তেম্‌নি পদ-[illegible]র পিছনে এবং তেমনি অন্ধকার গুহা আমার সমুখে! যে দিকেই যাচ্ছি সে দিকেই [illegible] উপায় নেই—উপায় নেই!

'থাক, আমি তোমায় ফাঁকি দেব,—কোথাও যাচ্ছি না,'—এই বলে তক্ষুণি সেখানে বসে পড়লুম। আমার বোধ হল যেন সেই বুড়ী আমার দু'হাত পিছনে চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে আছে! তার পর দেখি, কি একটা অন্ধকার ভেসে ভেসে আমার দিকে আসছে!

ভগবান্‌! যেদিকে তাকাই সেদিকেই যে এ বুড়ী!

মুক্তি নেই—মুক্তি নেই—এ যে আমার নিয়তি, এর হাত থেকে সেই জীবনে মুক্তি নেই!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজের বয়স ৮ম বর্ষ—তিনি বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বর,—নব নৃপতি শ্রীশ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন—মঙ্গলময় পিতা তাঁহার সর্ব্ব-মঙ্গল বিধান করুন।

* * * *

বিলাত হইতে কোচবিহারের নব ভূপতি শ্রীশ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর সহ মাতা শ্রীশ্রীমহারাণী বিগত ১৫ই জানুয়ারী রওনা হইয়াছেন, ফেব্রুয়ারীর প্রথমে তাঁহাদের স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইবার কথা। রাজ্যেশ্বরের শুভাগমনে এ মহাশোকে সান্ত্বনার আশায়,—কোচবিহারবাসী রাজদর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া আছে! মঙ্গলময় রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করুন।

* * * *

চতুর্দ্দিক হইতে শোক-সংবাদে আমাদিগকে আরও অধীর করিয়াছে। অল্পকাল মধ্যেই অনেক স্বনামধন্য মহাত্মা লোকান্তরিত হইয়াছেন।

বিগত ২৫শে পৌষ সোমবার সুপ্রসিদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে সত্যনাথের জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২য় পুত্র এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভারতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সিভিলিয়ান। তিনি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের বিভিন্ন জেলাতে ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও দায়রা জজরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি সুবর্ণ; 'ভারতীতে' তাঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সংস্কৃতে তাঁহার অগাধ বিদ্যা ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকার সম্পাদকত্বও

করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "তত্ত্ববোধিনী" অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। নানা ভাষার প্রাসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিগণের উক্তি তিনি এমন মনোরম মধুর ও যথোপযুক্ত ভাব সমন্বয়ে আবৃত্তি করিতেন যে তাহার তুলনা ছিলনা। সত্যেন্দ্র প্রকৃতই সুপণ্ডিত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অনেক গুণ ছিল। দানে, সামাজিকতায় এবং চরিত্রের মহত্বে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসংপ্ত আত্মীয়স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ট ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহান্ত হইয়াছে। শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র চারি ভ্রাতা। পূর্ণচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের ন্যায় 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিত লিখিতেন। তাঁহার উপন্যাস 'শৈশব-সহচরী' ও 'মধুমতী' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন,—দীর্ঘকাল কর্ম্মের পর অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরশান্তির দেশে কর্ম্মী মহাঅবসর গ্রহণ করিয়াছেন—দীর্ঘ বিরহের পর তিনি আজ ভ্রাতৃগণ সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয় সুখী হইয়াছেন এই আমাদের সান্ত্বনা।

বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও সঙ্কলনকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বিগত ১২শে পৌষ লোকান্তরিত হইয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবুর একাধিক গ্রন্থে পরলোক-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তিনি আজ পরলোকের প্রত্যক্ষদর্শী—সেই চিরশান্তি নিকেতনে তিনি সুখী হউন।

'বেহার চিত্র' প্রভৃতি প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু উদীয়মান লেখক—তাঁহার নিকট বঙ্গসাহিত্য অনেক আশা করিয়াছিলেন,—সমস্তই ফুরাইল! ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

আমরা আরও মৃত্যু বিভীষিকায় ভীত হইয়াছি, চতুর্দ্দিকে এ কি প্রাণ নাশ!

এতদিন পরে চৌরীচৌরার মামলার বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। এই মামলায় মোট দুইশত আটাশ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে ছয় জন বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই জেলে মরিয়া রাজদণ্ডের হাত এড়াইয়াছে। আর একজন এমনই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, যে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, শোনা যায় শেষোক্ত লোকটীর বাঁচিবার আশা খুবই কম। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে একশত বাহাত্তর জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই বিচারের কথা পড়িয়া সমগ্র ভারত শিহরিয়া উঠিয়াছে। বিচারের নামে ১৭২ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শুনিয়াই প্রাণ আতঙ্কে অস্থির হয়। স্বীকার করি চৌরীচৌরার হত্যাকাণ্ড অতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল, ভারতের সকলেই সমস্বরে উহার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু উহার বিচারের ফল—১৭২ জনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাণে একটা পৈশাচিক দৃশ্য জাগ্রত করে না কি? লোক-শিক্ষার কি উপায়ান্তর নাই? একত্রে এতগুলি নরের হত্যা সংবাদে মহাপ্রাণ যে আপনি আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে! প্রাণের বদলে প্রাণদণ্ড,—আবহমানকাল আদর্শ দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। দণ্ড সংশোধনের—নাশ না করিয়া,—সংস্কারই জগতের নিয়ম।

● ● ● ●

সম্প্রতি শুনা যাইতেছে আগ্রা, মিরাট, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ মুসলমান-রাজপুত নাকি হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। মুসলমান-রাজপুতগণের পূর্ব্বপুরুষগণ ছিল হিন্দু। মুসলমানের প্রতাপের সময়ে তাহারা মুসলমানের আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের জাতিপাত হয়, কিন্তু মনে প্রাণে তাহারা মুসলমান হয় নাই, তাহারা হিন্দু সমাজভুক্ত হইতেই প্রয়াসী; কেবল অলজ্ঘ্য অচলায়তন হিন্দুর সংস্কার প্রাচীর তাহাদিগকে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছরূপে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে—হিন্দুর রক্তের সন্তান হিন্দুর মাঝে ফিরিতে পারে নাই। পুরাদস্তুর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করায় মুসলমানের নিকটও তাহারা সমাদর ও সম্মান লাভ করিতে পারে নাই। সমাজে এই রাজপুতগণকে হীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে সম্প্রতি ইহারাই আবার নাকি হিন্দু সমাজে স্থান লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থা যে জন্যই হ'ক, যতটুকু উদারতা হিন্দু সমাজে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জ্ঞানে বা অজ্ঞানে দেখা দিয়াছে—তাহাতে রাজপুতগণের আশান্বিত হইবার কথা! যে সমাজে সোডা লেমোনেড আকারে মুসলমানের জল স্বচ্ছন্দে

চলিতেছে, বিস্কুট ও পাউরুটি আকারে মুসলমানের অন্ন অবাধে প্রকাশ্যে বারো আনায় গ্রহণ করিতেছে, যে সমাজের একাংশ এমন কি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ও কতিপয় ধর্ম্মসভা পর্যন্ত যে সকল হিন্দু মোপলাদের অত্যাচারে মুসলমানের অন্ন গ্রহণে বাধ্য হইয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজে পুনর্গ্রহণের পাঁতি দিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, সে সমাজের নিকট হইতে এই মুসলমান-রাজপুতগণও উদারতার আশা করিবে না কেন! যদি সত্যসত্যই ইহারা হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, কেবল সংস্কারের খাতিরে, এই পতিত সন্তানগণকে দূরে না রাখিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লওয়া এই ধ্বংসমুখ হিন্দুসমাজের উচিত। তাহা না করিয়া গোঁড়ামীকে হিন্দুত্ব ভ্রমে আমাদের সেকালের মনু-পরাশরের বিধি-নিষেধে সমাজ যদি ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে সাহসী না হন, তাহা হইলে শাস্ত্র হইতে সঙ্কীর্ণ সংস্কারকেই অধিকতর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে! শাস্ত্রে পতিতের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া পুনর্গ্রহণের পাঁতির অভাব নাই। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি বাঁধ জাতিকে যে কতখানি দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সমাজ একবার ভাবিয়া দেখুন। হিন্দুর জন্মের হার যেমন কমিতেছে মৃত্যুর হারও তেমনি বাড়িয়া উঠিতেছে। অথচ যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সমাজের লোক বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, সে সব ব্যবস্থাও সমাজের একাংশের উদারতার অভাবে এবং সঙ্কীর্ণতার জন্য সমাজ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সমাজকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে—আমাদের সমাজপতিদের এ সুযোগ ত্যাগ করা ঠিক হইবে কি?

* * * *

বিলাতীবস্ত্র আমদানী—

১৩ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বিলাতী বস্ত্র আমদানীর হিসাব।

কোরা কাপড়

	এই বৎসর	গত বৎসর
কলিকাতা	১৯৪৯০০০১ গজ	১৪২৮০০০০ গজ
বোম্বাই	১২৩৯০০০ ,,	২৩৬৭৫০০ ,,
মান্দ্রাজ	৮৩৩০০০ ,,	৪৫১০০০ ,,

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	৫৫৭৪০০০ গজ	৬১৫৭০০০ গজ
বোম্বাই	৮৭৯০০০ ,,	১৫৭১০০০ ,,
মাদ্রাজ	৮৩১০০০ ,,	৪৫১০০৪ ,,

গ্রন্থ-সমালোচনা

-:০:-

বিক্রমপুরের প্রাচীন কবি স্বর্গীয় দ্বিজরামকৃষ্ণ বিরচিত শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী,—বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ঢাকা ওয়ারি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত। ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵০ আনা।

সত্যনারায়ণের সেবাব্রত অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুসমাজে প্রচলিত, এমন কি মুসলমান সমাজেও ইহা প্রসার লাভ করিয়াছে। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বা পাঁচালী বঙ্গের অনেক ভক্ত কবি ছন্দে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন,—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার অন্যতম ও একখানি সুলিখিত পাঁচালী। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রবাবু গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

ভজার বাঁশী। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস্, এলাহাবাদ। মিঃ ইউ রায় এণ্ড সন্স্ কর্তৃক মুদ্রিত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ১।• পাঁচ সিকা।

এ যুগের শিশুদিগের সৌভাগ্য যে তাহাদের আনন্দ ও শিক্ষার জন্য বঙ্গের অনেক কৃতীসন্তান লেখনী ধারণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় বাবু জেলার কলেক্টররূপে বঙ্গের বহুদিনসঞ্চিত বহুল আবর্জ্জনা বিদূরিত করিবার জন্য যেরূপ ভাবে অদম্য চেষ্টা করিয়া স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি তেমনি বঙ্গের ভবিষ্যত আশা বালকবালিকা-

গণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ রসের সঞ্চারে তাহাদিগকে সবল সুস্থ পুষ্ট করিয়া মূল সংশোধনের প্রত্যাশী হওয়ায় বঙ্গের মঙ্গলকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছিলেন। ভজার বাঁশীর গানের সুরে এমন একটা স্বাভাবিক সরল প্রবাহ তিনি দান করিতে পারিয়াছেন, যাহাতে করিয়া কবিতাগুলিতে ছন্দের হিসাবে ত্রুটী থাকিলেও, একমাত্র সুরের দোলায়, ঝঙ্কারের তালে শিশুদের প্রাণে ছড়াগুলি আনন্দের তুফান তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

"চসমা-চোখে খেন্দু দরজি সেলাই করে খাসা
ডালে বসে' দাঁড়কাকটা দেখ্ছিল তামাসা!

•• •• ••

বাঁকা ধনুক দিয়ে খেন্দু টেঁয়চা ছোঁড়ে বাণ
কাক পালাল, হায় বেচারি গাধার গেল প্রাণ!"

যে চালাক সে নিজের পথ নিজে দেখে,—বোকাই সংসারে মরে,—যার কাজ তার সাজে—দরজির হাতে ধনুকর উঠিলে ফলে হয় তারই ক্ষতি—আর মরণ গাধার!

বইখানিতে ছবি অনেক; প্রত্যেকখানি ছবিই প্রসিদ্ধ শিল্পীর অঙ্কিত। সুন্দর। ছবি, ছাপা কাগজের হিসাবে বইয়ের মূল্য অধিক না হইলেও, বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিয়া পুস্তকের মূল্য কিছু কমাইলে অর্থসচ্ছল গ্রন্থকার "বাংলার ঘরে ঘরে ছোট ছেলে-মেয়েদের হাসির রোল" সহজেই উঠাইয়া 'সার্থক' হইতে পারিতেন।

(নব পর্য্যায়)
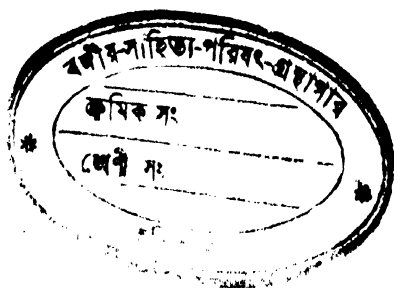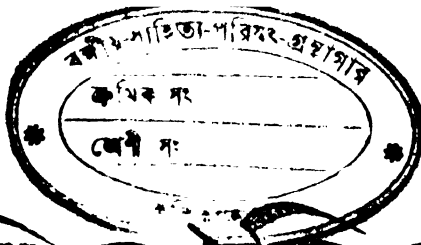
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

[illegible]ম বর্ষ। } মাঘ, ১৩২৯ সাল। ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

দিশারী

পথে পথে পথহারা ফিরিব কি আমি
যতদিন হবে না গো হে জীবনস্বামী
তোমার অমল প্রেমোদয় ?
সাঁঝের পথের পরে,
গৃহ কাজ শেষ করে
শূন্য থাল রিক্ত করে
আছি দিন যামী
পথ কি দেখায়ে দিবে হে হৃদয়স্বামী,
জীবন করিতে হেমময় ?

(২)

চরণ ছড়ায়ে আগে অজানা এ পথে,
আঁধার না মচে ধীরে রজনীর সাথে
বেদনা বাড়ায়ে আঁখি মোর।
পথ সেথা নাহি জানা,
কোথায় তোমার থানা,
একটি জ্বলিছে তারা
এ আঁধার রাতে,
জমিয়া উঠিবে শুধু তারি সাথে সাথে
বেদনা-করুণ আঁখি লোর।

(৩)

আঁধার মরণে আলো উঠিবে ফুটিয়া,
অরুণের রাঙ্গা আভা পড়িবে টুটিয়া
চরণ কমলে তব আ
সে নব কিরণে মোর
ভাঙ্গিবে কি ঘুমঘোর ?
কমলের দলে প্রাণ
রবে কি ফুটিয়া
সফল হবে কি রাঙ্গা চরণে লুটিয়া
জীবন মথিত অশ্রুরাশি ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

——:0:——

পাহাড়িয়াগণের বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার আগ্রহাতিশয্যে প্রভাতে গাত্রোত্থানকালে "অন্নপূর্ণা" নাম স্মরণ করিতে বোধহয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম নতুবা আহারে বসিয়া এরূপভাবে শুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ অদৃষ্টে ঘটিবে কেন! পাহাড়ে আইসা অবধি পাহাড়িয়া "বাহে" পাচক ব্রাহ্মণগুলির নোংরা পোষাক ও নোংরা অভ্যাস লক্ষ্য করিয়া "ইক্‌মিক্ কুকারে" স্বপাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম কিন্তু অদ্য প্রভাতে অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই বাহিরে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া অধমতারণ বাহেকে কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলাম। তিনি শুধু খিচুরি ও তরকারী রন্ধন করিয়া তাহাতে এত অধিক মাত্রায় 'খরসানী' কাঁচা লঙ্কা ও রসুন পেঁয়াজ প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে সেই অভূতপূর্ব্ব অমৃতের কিঞ্চিন্মাত্রও গলাধঃকরণ করিতে প্রাণান্তপরিচ্ছেদ। বাংলার অপর কক্ষে আমার একজন পরিচিত বন্ধু সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমার বিড়ম্বনা দেখিয়া আমাকে তাঁহার সহিত আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষুধায় উদরটা দাউ দাউ করিতেছিল সুতরাং বন্ধুবরের সদ্ভাব নিমন্ত্রণ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানেও আর এক নূতন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার পাচক নাকি 'জৈসী' ব্রাহ্মণ! আমার বিরলদন্ত 'বাহে' তাঁহার দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া কহিলেন "ও ত জৈসী বামন, ওর হাতে বানান ডাল ভাত আমাদের সংগত গুরুং প্রভৃতি গুর্খালিরাও খায় না, আপনি খাবেন কি করে? ইহা শুনিয়া বন্ধুটি কহিলেন "তুমি বাবা ওর চেয়ে কুলীন কিসে? আর ওই বা নিকৃষ্ট কিসে ছুনেই ত এক অবতার!"

প্রত্যুত্তরে সে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "হুজুর আমি ত উপাধ্যায়ের ছোঁড়া, আমার বানান ভাত ডাল কে না খাবে, আর ও ত জৈসী, বিধবা বামনির পেটে উহাদের জন্ম।

আমাদের দেশে আমরা যেগুলকে "কেশেল" ব্রাহ্মণ বলি জৈসীগণও ঠিক্ সেই সম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষিত করিলেও সমাজে ইহারা সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন বলিয়া বিবেচিত।

বন্ধুটি আমার উদারপন্থী, সুতরাং তাঁহার সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমের নিকটে ব্রাহ্মণ, বাবুর্চ্চিতে কোনরূপ ভেদাভেদ নাই, কিন্তু উপাধ্যায় বংশাবতংসের শ্রীমুখাৎ এ সংবাদ অবগত হইয়া আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। বাল্যকাল হইতে পুণ্যশ্লোক পিতার ধর্ম্মশীলতা ও শুচিতা চক্ষের সমক্ষে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি এবং যদিও নিজ জীবনকে সে পবিত্র ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারি নাই তথাপিও অজ্ঞাতে যে সমস্ত সংস্কারগুলি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে সেগুলিকে স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করিতে অন্তর স্বতঃই বিমুখ হয়, সুতরাং ঋষিকল্প পিতার পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সামান্য শারীরিক ক্লেশের জন্য আজন্ম সংস্কার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আদৌ মন সরিতে ছিল না। আমার এইরূপ ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া বন্ধু কহিলেন "আপনার prejudice আছে তা হলে ত আপনি between Scilla and Charybdis"! তাঁহার মন্তব্য শ্রবণ করিয়া আমি উত্তর করিলাম "ঠিক যে তাই তা নয়, তবে অন্ততঃ between two horns of a logical dilema। ধর্ম্মাধর্ম্ম শাস্ত্র শাস্ত্র কিছু বুঝি না, তবে আমার কতগুলি সংস্কার আছে সেগুলি আমি নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে সামান্য কারণে অমান্য করিতে চাহি না। আমার এই ধারণা যে সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের দূরদর্শিতা বলে হিন্দুসন্তানগণের ভাবী মঙ্গলের নিমিত্তই এই সকল কঠোর বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা যৎসামান্য পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া সেই সকল মহাপুরুষের বাক্য হেলায় লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছি, ফলে স্বাস্থ্য শ্রী হারাইয়া আমরা আজ এক ধ্বংসোন্মুখ জাতিতে পরিণত হইয়াছি। বৈদেশিক আচার নীতির কোনটি আমাদের দেশকালোপযোগী হইবে কোনটি নহে ইহা সম্যক বিচার না করিয়াই আমরা তাহার হুবহু অনুকরণ প্রয়াসী হইয়াছি এবং বৈদেশিক ভোগবিলাসিতার মোহে Lotus Eater দিগের মত সকল বিস্মৃত হইয়া মাতিয়া আছি। আমাদের এতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে যে আমরা যে দুর্দ্দশার কোন সীমায় উপনীত হইয়াছি ইহাও বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই এবং এ নিমিত্তই আমরা স্বাবলম্বনহীন চিরঅকর্ম্মণ্য ছায়াবাজীর পুতুলে পরিণত হইয়া দিক্‌হারা পথিকের মত শুধু হায় হায় করিতেছি।

বন্ধু বাধা দিয়া কহিলেন "আর হায় হায়-এ কাজ নাই, যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে আমি সেরূপ ব্যবস্থাই করিয়া দিতেছি। বেশ, একমাত্র ডাল ভাত ব্যতীত অপর সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি সকল পাহাড়িয়াগণ, এমন কি বিবাহিত মগের ঠাকুর গণও সকলের

সহিত একত্রে পান ভোজন করিতে আপত্তি করে না সুতরাং আপনি যখন দেশ চায়ের এত পক্ষপাতি তখন আপনাকে কিছু হালুয়া লুচি প্রস্তুত করিয়া দিক্—ইহাতে বোধ হয় আপনার কোন আপত্তির কারণ হইবে না!" তাঁহার বিধান মত সে বেলা ঐরূপ ভাবে জলযোগ করিয়া কাটাইয়া দেওয়া গেল, রাত্রিতে কুমারের পোলাও প্রস্তুত করিয়া উভয়ে নানা হাসি গল্প করিতে করিতে মহানন্দে ভোজন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে চা পান অন্তে বন্ধু দার্জিলিং যাত্রা করিলেন কিন্তু আমার কাজকর্ম শেষ না হওয়ায় আমি তাঁহার সহযাত্রী হইতে পারিলাম না। প্রবাসে নিঃসঙ্গ নিরানন্দ দিনগুলি কাটাইবার মত কোন কিছুই মিরিকে ছিল না। চা বাগানের সাহেবদিগের খেলার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক ঘেরা সুন্দর একটি টেনিস্ প্রাঙ্গন ছিল বটে কিন্তু কোন দিন কোন চা-কর প্রভুকে তথায় পদার্পণ করিতে দেখি নাই।

কোনরূপে সময় অতিবাহিত করিবার জন্য আকাশ একটু পরিষ্কার দেখিলেই মিরিকের আশপাশে বেড়াইতে বাহির হইতাম। একদিন বৈকালে পাণিঘাটা রোড ধরিয়া চলিতে চলিতে সৌরিণী পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলাম। পাহাড়ে দেশ হিসাবে সৌরিণী একখানি গ্রাম; ক্ষুদ্র একটি বাজারের উপর সামান্য কয়েকখানি মুদি ও মাড়োয়ারী দোকান, ইহা হইতেই নিকটবর্ত্তী চা বাগানের কুলীদিগের সকল প্রকার অভাব মোচন হইয়া থাকে। ফিরিবার কালে চড়াই পথে একটু কষ্ট বোধ হইতেছিল, এদিকে রাস্তার দু'ধারের ঘন বনের মধ্যে সন্ধ্যার আঁধারও বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। একস্থানে একটি বাঘধরা ফাঁদ দেখিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম, পাহাড়ের উপর মকাই ফসলের সময় একমাত্র ভল্লুকেরই উপদ্রব হয় জানি কিন্তু শার্দ্দূল প্রবর যে তরাই প্রদেশের নিবিড় জঙ্গল ত্যাগ করিয়া শৈল বিহারেও মাঝে মাঝে আগমন করিয়া থাকেন এ ধারণা আমার আদৌ ছিল না। পথের যে অংশে কালীখোলা ও খেতীখোলা নামক দু'টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা কুলুকুলু রবে প্রবাহিত হইতেছে সেই স্থানেই বনটি আরও ঘন ও অধিক বিস্তৃত, সুতরাং জল জঙ্গল উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া ব্যাঘ্রভীতি বিশেষ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক ভগবানের কৃপায় সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই নির্ব্বিঘ্নে বাংলোতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

তদবধি প্রত্যহই শুধু পার্ম্মবতালের দিকে বেড়াইতে যাইতাম, মাঝে মাঝে পথের ধারে দাঁড়াইয়া "বস্তির" বালকবালিকাগণের খেলা দেখিতাম।

একদিন ক্রীড়ারত কতকগুলি বালকবালিকা আমাকে দেখিয়া "সেলাম সাহেব" "সেলাম সাহেব" বলিতে বলিতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাদের ছিন্ন মলিন বেশ দেখিয়া প্রত্যেককে একটি একটি পয়সা দিয়া তাহাদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম "পয়সা দিয়ে কি করবে?" উত্তরে তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল "সিগারেট খাব।"

বাস্তবিকই আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই ইহারা সিগারেটের এত প্রিয় যে অনেক সময় একটি মাত্র সিগারেট বক্‌সিস্ দিয়া ইহাদিগের দ্বারা যে কোন কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়। কি শিশু, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই জামার পকেটে একটি করিয়া খোঁচা মার্কা সিগারেট প্যাকেট ও একটি দিয়াশলাইএর বাক্স সর্ব্বসর্ব্বদা মজুত থাকে, মনিবের হস্ত হইতে একটি সিগারেট পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে ইহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হয়।

তারপর দিন ভ্রমণে বাহির হইলে আবার "সেলাম সাহেব, বক্‌সিস্" বলিয়া অনেকগুলি বালকবালিকা আমাকে ঘিরিয়া লইল সুতরাং পূর্ব্বকার দিনের মত কাহাকেও নিরাশ না করিয়া সকলকেই খুসী করিয়া বিদায় করিলাম। ইহার ফলে ব্যাপার এরূপ ঘটিল যে বস্তির বালকবালিকাগণ প্রত্যহ ঠিক নিয়মিত সময়ে আমার আগমন প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা বিচার করিলাম, যখন তাহারা "সেলামকো বক্‌সিস্" বলিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত থাকিত তখন আমি কয়েকটি মাত্র পয়সা লইয়া দলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিতাম। তখন তাহারা ঐ পয়সা কুড়াইবার জন্য মারামারি ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিত আর আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে বিশেষ কৌতুক অনুভব করিতাম। একদিন এরূপ ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কির ফলে দুইটি বালকবালিকার মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটি বালিকা একটী পয়সা কুড়াইয়া পাইয়াছিল কিন্তু একটি দশম বর্ষীয় বালক হঠাৎ তাহার হস্ত হইতে পয়সাটি কাড়িয়া লইয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইল। ক্রুদ্ধা বালিকা কয়েকবার বালককে ধরিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া

"তামাম্‌কো ভাত মরা গো—খাঙ্" বলিয়া বালককে গালি দিতে লাগিল এবং ক্রোধে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল।

কৌতুক দেখিতে দেখিতে এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বালিকার শোক অপনোদন জন্য তাহার হস্তে একটি সিকি প্রদান করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বাংলোয় আসিয়া দেখি একজন এতদ্দেশীয় ফটোগ্রাফার আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা যে আমার একখানি ছবি তুলেন। ছবি উঠান কার্য্যে তিনি কতদূর পারদর্শী তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি আমাকে কয়েকখানি ছবি দেখিতে দিলেন। একখানি ছবির মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত বালক কর্তৃক লাঞ্ছিতা বালিকাটির প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বালিকাটি বিশেষ বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া বসিয়া আছে এবং পার্শ্বে পরিবারবর্গের অন্যান্য স্ত্রী পুরুষগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ছবিখানি দেখিয়া ফটোগ্রাফার মহাশয়কে পয়সা কুড়ান ব্যাপার লইয়া বালকের সহিত বালিকার মারামারির কথা বলিলাম এবং কোন উপলক্ষে এরূপ বেশ-ভূষা করিয়া বালিকার ছবি উঠান হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন যে এটি বালিকার বিবাহ দিনের তোলা ছবি এবং প্রায় আট মাস পূর্ব্বে গত অগ্রহায়ণ মাসে উঠান হইয়াছে।

বিবাহ দিনের ছবির মধ্যে বরকে দেখিতে না পাইয়া বরের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিলাম, তদুত্তরে তিনি মৃদু হাস্য করিয়া ছবির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র একটি পদার্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে "এই দেখুন বর, এই বিম্বফলের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়াছে।"

এই অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া বিশেষ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কি মশায়! বেল ফলের সঙ্গে বিয়ে হয় এ ত কখন শুনি নাই। ব্যাপার কি বলুন্, ত?

তখন তিনি কহিলেন যে বালিকাটি নেওয়ার জাতীয়া, এবং নেওয়ারগণের জাতীয় প্রথা অনুসারে বিল্ব ফলটির সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। নেওয়ার পিতামাতা মনে করেন যে অনূঢ়া কন্যা পিতৃগৃহে ঋতুমতী হইলে তাঁহাদের দেহে পাপস্পর্শ করিবে এবং এ নিমিত্তই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপে তাহার উদ্বাহ কার্য্য সমাধা করিয়া

দেয়। পরে কন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সুবিধামত (প্রায় স্থলেই কন্যার পছন্দমত) কোন উপযুক্ত যুবকের করে কন্যার্পণ করা হয়। বিবাহফলটিকে গৃহদেবতার মত গৃহের কোণে সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয়. কিন্তু কিছু কাল পরেই ফলটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই কোনরূপ বিশেষ খোঁজ খবর রাখেন না। ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে ফলের কখন মৃত্যু হয় না বলিয়া নেওয়ার রমণী চিরায়ুস্ত থাকে এবং এই সংস্কার অনুসারে এক স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

ফটোগ্রাফার মহাশয়ের ছবিগুলি দেখিয়া যতটা না হউক তাঁহার গল্প শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম সুতরাং সানন্দে ছবি তোলার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

সোমবার দিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কালিম্পং যাত্রা করিলাম, ফটোগ্রাফারটিও আমার সহানুগমন করিলেন। পথের মধ্যে পছন্দমত কোন স্থান অথবা বাগানের নদীর কোনো জলস্রোতের পারে বসিয়া ছবি উঠান হইবে স্থির করিয়াছিলাম।

উৎরাই পথে অশ্বারোহণে গমন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ দৈবক্রমে কখনও অশ্বের পদস্খলন হইলে অশ্ব ও আরোহী কাহারও চিহ্নমাত্র পারলক্ষিত হইবে না শুধু সুদূর নিম্নে কুষ্মাণ্ড আকারে পরিণত দুটি মাংস পিণ্ড মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে পারে! এ নিমিত্ত উভয়েই পদব্রজে চলিতে লাগিলাম, পশ্চাতে সহিসেরা অশ্বের লাগাম ধরিয়া লইয়া আসিতেছিল। পথ মোটেই দুর্গম বা বন্ধুর ছিল না সুতরাং দুজনে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ঝিরিক বাগানের মধ্য দিয়া অতি সহজভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া চলিলাম। রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্ব স্থিত একটি সরু নালা দিয়া ক্ষুদ্র জলস্রোত নিম্ন দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বহিয়া গিয়াছে। এ দেশের অনেক স্থানেই জলাভাব, এ নিমিত্ত পাহাড়িয়াগণ এরূপ এক একটি প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের মুখে সছিদ্র বংশখণ্ড বসাইয়া উহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত এক একটি বস্তির দিকে চালিত করিয়া লইয়া গিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা যেন এ পাষাণের দেশকে বিশেষ পর্য্যালোচনার পর এরূপ উচ্চ নীচ ও শীতপ্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নচেৎ দারুণ জলাভাব বশতঃ এদেশবাসীর যে কি ভীষণ দুর্দশা উপস্থিত হইত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন স্থলে একই স্থান হইতে বিভিন্ন বস্তি বা বাটীর দিকে জলস্রোত চালিত করিবার নিমিত্ত শাখা লাইন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। একই সময়ে দুইটি বিপরীত দিকে জলের গতি চালনা করা সম্ভবপর নহে বলিয়া প্রয়োজন বোধে কোন ব্যক্তি আসিয়া ঐ বিশেষ শাখাটিকে মূল প্রবাহের সহিত সংযোজিত করিয়া দেয় এবং আবার প্রয়োজন সাধিত হইলে উক্ত শাখা লাইনটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূল প্রবাহের বংশখণ্ডটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখে। আবশ্যক বোধ করিলে কখন কখন ইহারা সচ্ছিদ্র বংশখণ্ড সাহায্যে সরকারী রাস্তা ভেদ করিয়া এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে জলের গতি চালিত করে।

কোন কোন স্থলে এরূপ ভাবে জল প্রবাহের আংশিক গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া কোথাও বা কাষ্ঠনির্ম্মিত পিপা কোথাও বা ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌবাচ্চার সহিত ঐ জলস্রোতের সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পিপা বা চৌবাচ্চার (Closed Tank) মুখে একটি ছিপি আছে, যখন যাহার প্রয়োজন হয় তখন সে এই ছিপি ঘুরাইয়া জল বাহির করিয়া লইয়া থাকে। মাঝে মাঝে এরূপ এক একটি চৌবাচ্চার পার্শ্বে অশ্ব বা গো প্রভৃতি পশুদিগের জলপানের নিমিত্ত ইষ্টকনির্ম্মিত পানপাত্রের ব্যবস্থা আছে।

এ দেশে এরূপ এক একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে লোকে বিশেষ পুণ্যের কার্য্য বলিয়া মনে করে এনিমিত্ত কেহ যৎসামান্য অর্থশালী হইলেই নিজ নাম ও সাকিন প্রভৃতি খোদিত করিয়া এক একটি জলাধার নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। সাধারণ ভাষায় পাহাড়িয়ারা ইহাকে "ধরমকো কূপ" বলে, কোন কোন স্থলে এরূপ দু' একটি কূপ নির্ম্মাতার ভাস্কর বিদ্যার পরিচায়ক নানারূপ অঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায়।

বহু উচ্চে অথবা বহু নিম্নে অবস্থিত বস্তি হইতে জলার্থী স্ত্রী পুরুষ এই সকল স্থানে আসিয়া জল সংগ্রহ করে, এবং "নামলো" সাহায্যে জলপূর্ণ পাত্রগুলিকে পিঠে ফেলিয়া অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যায়।

বর্ষা ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে অধিকাংশ স্থলেই এরূপ জলাভাব ঘটে যে এক কলসী জল সংগ্রহ করিতে জলার্থীকে অধীর ভাবে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়।

স্নান করিতে ইহারা মোটেই অভ্যস্ত নহে এবং অবগাহন স্নান কাহাকে বলে তাহা ইহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। স্ত্রীলোকেরা সদা সর্ব্বদাই হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করে এবং মাঝে

মাঝে বক্ষের উপর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অনাবৃত করিয়া স্নান করে। পুরুষেরাও ঐরূপ ভাবে স্নান করিয়া থাকে। এই সকল কারণে ইহাদিগের দেহ হইতে কেমন এক প্রকার গন্ধ বহির্গত হয় এবং পোষাকে শাদা শাদা শূঁয়া পোকা দৃষ্ট হয়। তিন চারিদিন পোষাকগুলি অধৌত থাকিলে আমাদের গঞ্জি সার্ট প্রভৃতিতেও শূঁয়া পোকার অস্তিত্ব অনুভূত হইত এবং তাহার দংশনে আমরা অস্থির হইয়া উঠিতাম, কিন্তু পাহাড়িয়াগণ বহুকাল পর্য্যন্ত একই পোষাক পরিধান করিয়া কি প্রকারে থাকিতে পারিত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না।

যাহা হউক পাহাড়িয়াগণের জল লইবার Engineering কৌশল দেখিতে দেখিতে মাকই ও মারুয়া ক্ষেতের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিতেছিলাম। মাকই (ভুট্টা) ইহাদের প্রধান খাদ্য, এই মাকইকে ইহারা পোড়াইয়া, ভাজিয়া এবং গুঁড়া করিয়া নানা প্রকারে ব্যবহার করে, মারুয়াগুলি দেখিতে সর্ষপের মত ইহাদ্বারা শুধু পচুই মদ প্রস্তুত হয়।

ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ছোট ছোট খড়ের ঘরগুলি বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। দেওয়ালে ঝুলান মানচিত্রে গ্রামগুলি যেমন উচ্চ নীচে অবস্থিত পাহাড়ের গায় ঘর বাড়ীগুলিও তেমনি উচ্চ নীচ করিয়া নির্ম্মিত, কোনটির লতাপাতা দিয়া বেড়া দেওয়া কোনটির বা তাহার উপর মাটির লেপ দেওয়া। কেহ কেহ বা ঐ মাটীর লেপের উপর নানারূপ আলপনা দিয়া কেহ বা "খুক্‌রী" আঁকিয়া রাখিয়াছে। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যেমন ধনুর্ব্বাণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ইহাদিগের আদিপুরুষও বোধ হয় খুক্‌রী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুষের কটিদেশে পুলিশের (কনেষ্টবল) টুপিতে ও কোমরে, শার্টের বোতামে, ছবিতে আলপনায় খুক্‌রী।

যতই নীচের দিকে নামিতেছিলাম ততই গ্রীষ্ম বোধ হইতেছিল, যখন নামসু আসিয়া পৌছিলাম তখন পশমী পোষাক গায় রাখা অসহ্য হইয়া উঠিল।

নামসু, বালাসন নদীর সমতল উপত্যকা ভূমিতে মিরিক ও কার্শিয়াং উভয় স্থান হইতে প্রায় ছয় মাইল নিম্নে অবস্থিত। নামসুর ন্যায় ধুতুরিয়া পুলবাজার, শিংলা, প্রভৃতি স্থান নদীর উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত, এই সকল স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইলেও ম্যালেরিয়া বীজাণুর আবাস ভূমি।

পার্ব্বত্য প্রদেশে মফঃস্বল যাতায়াত এই সকল কারণে স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। একদিনের মধ্যেই অতিমাত্রা শীত হইতে অত্যন্ত গ্রীষ্মে এবং তদ্বিপরীত এবম্প্রকার temperature এর পরিবর্ত্তন শরীরের পক্ষে কখনও হিতকর হইতে পারে না। এই সকল উপত্যকা ভূমিতে উপনীত হইলে স্বভাবতঃই তৃষ্ণা বোধ হয় কিন্তু ঐ সময় তৃষ্ণা দমন না করিয়া জলপান করিলে হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

নামসু স্থানটি এককালে বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দু'টি চা দোকান ও একটি পচুই মদের দোকান ব্যতীত ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সহরে কি মফঃস্বলে, কি জনহীন অরণ্যে কি দুর্গম পার্ব্বত্য পথের ধারে এক একখানি চা দোকান আঁধারের আলো নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অসময়ের বন্ধুর মত শ্রান্ত পথিককে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সকল সময়ে উন্মুক্ত রহিয়াছে। সঙ্গের আর্দ্দালিরা অতি বন্ধুর সঙ্কীর্ণ "চারবকটা" Short cuto দিয়া অনেক অগ্রেই চা দোকানে পৌঁছিয়া চা পান করিতে-ছিল। আমি অশ্বটিকে তাহাদের নিকটে রাখিয়া ছবি তুলিতে বালাসন নদীর দিকে চলিয়া গেলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

জাগরণী।

অন্ধকারার বন্ধ অর্গল্ রুধ্‌বে কি তোর পথ,
চল্‌রে ছুটে আলোর পানে পুর্‌বে মনোরথ।
নাইবা এল পথের সাথী,
নাইবা ঘরে জ্বলল বাতি,
কাজ কিরে আয়, থাক্ না পড়ে উঠ্‌লো যে ঐ রব
"আঁধার সায়র পারে আজি আলোর মহোৎসব॥"

নিকষ ঘন গহন-কাল রুদ্র ভয়ঙ্কর,
ঝড়ের দোলায় দুলয়ে জটা নাচ্‌বে দিগম্বর ;
বিজলী মেয়ে সর্ব্বনাশী ;
হাস্‌বে মুহু অট্ট-হাসি ;
নিখিলবিশ্ব কাঁপায়ে গুরু ডাক্‌বে ভীষণ দেয়া
অই অতলের অথই বুকে দিস্‌রে তবু খেয়া ।

সুপ্তি মৌন নিশীথ রাতির করুণ হাহাকার ;
কি সে বেদন জাগায়ে তুলে বক্ষে বারংবার ;
অঝর ধারে নয়নধারা
ঝরচে কেন বাঁধন-হারা,
অফুট্ কোন তরুণ হিয়ার গোপন ভালবাসা
দলচে নিতি চরণতলে হায়রে সর্ব্বনাশা !

মৃত্যু-রূপী ঐ সে ভয়াল করাল কালোছায়া,
সে যে শুধুই ক্ষণিক মোহের স্বপন-ঘেরা মায়া ;
ভয় কিরে তায়, বাঁধন টুটে
চল্‌রে তবু, চল্‌রে ছুটে,
আনন্দেরি ঝরণা সেথায় ঝর্‌চে মধুর রবে,
আঁধার পারে সেই সে দেশে আলোর মহোৎসবে !

শ্রীসরোজ কুমার সেন ।

মোগল-সন্ধ্যা।

—০:০—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।
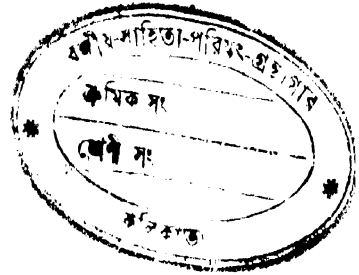
স্থান—মন্ত্রণাকক্ষ (রাজপ্রাসাদ) কাল—প্রভাত। জাহান্দার, জাহান, জুলফিকার, চিন্‌কালিচ্, অজিতসিংহ, রাজসিংহ সকলেই উপবিষ্ট।

অজিতসিংহ। শাহজাদা জাহান্দার, শাহজাদা জাহান, আপনাদের সাম্‌নে অনেক কর্ত্তব্য র'য়েছে—শোক ক'রবার সময় যথেষ্ট পাবেন কিন্তু কর্ত্তব্য করবার ঠিক সময়টী চলে গেলে তা করা আর না করা এক হয়ে পড়ে। পুরুষের জীবনে কর্ত্তব্যই সকলের বড়; হৃদয়ের বেদনা, মনের দুঃখ, চোখের জল—সব মিথ্যা। কঠোর কর্ত্তব্যই একমাত্র সত্য।

জাহান্দার। পিতা চলে গেছেন—সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য যেন বিরাট্ শূন্যতায় পীড়িত হয়ে উঠেছে এ শূন্যতা আজ কি দিয়ে পূর্ণ হবে? মারবার রাজ! নিজের হৃদয়ের মাঝে তাকিয়ে দেখ্‌ছি সেখানে সে একই দৃশ্য।

জাহান। পিতার শেষ সময়টা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে—সেই কাতর চাহনী, দীর্ঘশ্বাস—মনে হচ্ছিল আমাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে তিনি যেন যেতে চাচ্ছেন না—সে দৃশ্য মনে হ'লে চোখ জলে ভরে ওঠে।

চিন্‌কালিচ্। জাহান, শান্ত হও, মহারাজ অজিতসিংহ যে কথা বলেছেন সে কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ ক'রে স্থির হও।

মহারাজ কি শুনেছেন যে সম্রাট বাহাদুর শা শাহজাদা আজিমকে এই ময়ূর সিংহাসন দিয়ে গেছেন।

অজিতসিংহ। হাঁ, শুনেছি বৈকি, কিন্তু জানি না এ খবর কতদূর সত্য।

জাহান্দার। অবিশ্বাস ক'রবার কোনই কারণ নেই। সত্যই পিতা আজীমকে মোগল সম্রাট ক'রে গেছেন।

অজিতসিংহ। শাহজাদা—বাদশা'র ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কিন্তু বাদশা' বুদ্ধিমান হয়েও এত বড় একটা ভুল করে বসলেন ভেবে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি।

জুলফিকার। কি ভুল মহারাজ ?

অজিতসিংহ। এতদিন ধরে যে নিয়মটা চলে আসছে, তাকে অবহেলা করাটা কি ভাল হয়েছে ?

রাজসিংহ। মারবার রাজ ! আপনি কোন্ নিয়মটাকে এতদিন ধরে চলে আস্‌ছে বলছেন ? এ নিয়মের মর্য্যাদা যে তার পালনের চেয়ে ভঙ্গের দ্বারাই বেশী রক্ষিত হয়েছে। সম্রাট সাজাহান হ'তে সম্রাট বাহাদুর পর্য্যন্ত কেহই জন্মগত অধিকারের জোরে সিংহাসন পান নি—পেয়েছিলেন কেবল কৌশলে আর তরবারির জোরে।

অজিতসিংহ। তবু একটা নিয়ম যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হবে। সে থাকতে আর সিংহাসনে কারও কোন অধিকার নেই।

চিন্‌কালিচ্। সেনাপতি জুলফিকার ! তোমার কি মত ?

জুলফিকার। খাঁ সাহেব ! এতদিন ত ভাব্‌বার কোনই অবসর পাইনি আজ বাইরে এসে জগৎটাকে দেখে মনে হচ্চে যে কি যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। দুটো জিনিষ আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে একদিকে সম্রাটের মৃত্যুকালের শেষ আদেশ আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যের মঙ্গল।

জাহান্দার। সেনাপতি ! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি, পিতার কাছে শপথ ক'রেছি যে বাদশা' পদ আমি নেব না—এ সিংহাসনের জন্য গৃহ যুদ্ধ বাঁধবে আর তাতে সাম্রাজ্যের অমঙ্গল ঘটবে। আপনি যদি এই ভীত হ'য়ে থাকেন, তা' হলে বলছি যে আমার দিক হ'তে আপনাদের আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আমার কথায় যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তবে আমি আজই দিল্লী ত্যাগ করে যাচ্ছি।

জুলফিকার। শাহজাদা, আপনার কথায়ই আমাদের যথেষ্ঠ বিশ্বাস আছে। আমি অন্য ভাবে একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করছি।

জাহান্দার। আর কি ভাবে হ'তে পারে, বলুন।

জুলফিকার। মহারাজ অজিতসিংহ, সেনাপতি রাজসিংহ, আপনারা দুঃখিত হ'বেন না। যে কথাটা বল্‌তে যাচ্ছি, সে কথাটা আপনাদের—হিন্দুদের কাছে বড়ই অপ্রিয় বলে মনে হবে। যে জন্য শাহজাদা যারা সেই সময়ের মুসলমানদের চোখে একটা মুসলমান সাম্রাজ্যের বাদশা' হবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিলেন, ঠিক সেই কারণেই শাহজাদা আজিম আজ সম্রাট হবার অযোগ্য।

অজিতসিংহ। সেনাপতি জুলফিকার! আপনার কথাটা সোজা করে বল্লে এই বোধ হয় দাঁড়াবে যে—কারণ শাহজাদা আজিম হিন্দু ও মুসলমান্‌কে সমচক্ষে দেখে থাকেন সে' জন্যই তিনি মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার অনুপযুক্ত।

জুলফিকার। হাঁ, মহারাজ ঠিক্ তাই।

অজিতসিংহ! তবে বাহাদুর বাদশা'কে ভুল করবার অপরাধে বৃথাই অপরাধী কর্‌ছিলাম। বাদশা' তা হ'লে ঠিকই করেছেন।

জুলফিকার। হাঁ আপনাদের স্বার্থের পক্ষে সবই ঠিক বল্‌তে হবে সন্দেহ নাই।

অজিতসিংহ। জুলফিকার খাঁ, আমি শুধু হিন্দুর স্বার্থের দিকে চেয়ে একে ঠিক্ বল্‌ছি না, আপনাদের মঙ্গলের জন্যই একেই বাঞ্ছনীয় মনে করি। হিন্দুর মঙ্গলে মুসলমানের মঙ্গল আর মুসলমানের মঙ্গলে হিন্দুর মঙ্গল একথা কখনই ভুলবেন না। এ দুই জাতি দীর্ঘ চার পাঁচ বৎসর কাল একদেশে এক আকাশের তলে বাস করে একই অন্নেই পরিপুষ্ট হয়ে আজও যে এ তত্ত্বটা বুঝ্‌তে পারলেন্ না, এ বড়ই দুখের কথা, সেনাপতি। যে দিন হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক হয়ে গিয়ে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলে মিলে একই প্রাঙ্গণে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেশমাতার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কর্ত্তে পারবে—সেদিন যে নূতন জাতির উদ্ভব হবে তারা হবে জগতে দুর্ব্বার মহাত্মা আকবর বাদশা' এটী বুঝেছিলেন, আর সেই আদর্শ জাতিগঠনে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাদশা' ঔরঙ্গজেব সেই নির্ব্বাপিত বিরোধ বহ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করেছেন। আর আজ আপনাদের মত কূট রাজনীতিজ্ঞ সেনাপতিরা তার ইন্ধন যোগাচ্ছেন। মনে রাখবেন আগুন যখন জ্বেলেছেন যে দিন এই সাম্রাজ্যটা পুড়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে সে দিন বেশী দূরে নয়।

চিন্‌কালিচ্‌। মহারাজ, হিন্দু মুসলমানের যে বিরোধ সেত ধর্ম্মের বিরোধ। এর জন্য কেবল মুসলমানকেই দোষী করবেন না হিন্দুও সমান দায়ী।

অজিতসিংহ। হাঁ, দোষ উভয়েরই। ধর্ম্মের স্থান অন্তরেই, তার প্রতিষ্ঠা তার সাধনে, বাইরে কর্ম্মজগতে তাকে টেনে আনবার জনাই এ ভয়ানক অনর্থ ঘটেছে।

জাহান্দার। মহারাজ, আমি বেশী বুঝি নাই, আমি শুধু জানি যে মুসলমানের ভাব আর কর্ম্ম সমস্তটাই হচ্ছে তার ধর্ম্ম। সেনাপতি জুলফিকার আপনি ঠিকই বলেছেন, আজিম সিংহাসনে বসলে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের গৌরবের হানি হবে। একটা সাম্রাজ্য বড় না একটা ধর্ম্ম বড়? আমার মনে হচ্ছে জাহানই সম্রাট হবার উপযুক্ত।

অজিত সিংহ। শাহজাদা, জাহান্দার, এ সংসারে কেউ বা গড়ে কেউবা ভাঙ্গে। বাবর বাদশা' যাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আপনারা তাকে ভাঙতে সুরু করেছেন। যা হক রাজপুত জাতটা চিরকালই মোগলের মঙ্গল কামনা করে থাকে; তাই বাদশা'দের অসন্তুষ্টির ভয় না করে সকল সময়ই সত্য কথাটা বলে যায়। শাহজাদা, আমার মত এই বাহাদুর বাদশা'র আদেশ অনুসারে শাহজাদা, আজিমই আজ হতে নূতন মোগল সম্রাট। আমি আর কা'কেও সম্রাট বলে মানতে রাজি নই। চিন্‌কালিচ্‌ খাঁ! আমার এই শেষ কথা।

চিন্‌কালিচ্‌। মহারাজ, আমারও সেই মত। আজ যদি বাদশাহের আদেশ অগ্রাহ্য করি তবে ঐ যে নিভৃত শয্যা যেখানে জীবনের উন্মত্ততার ক্লান্তির পর মানুষ একটু শান্তি পায় সেই শয্যা তার কণ্টকময় হয়ে উঠবে। মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তাঁর সেই আজিমের জন্য আকুল প্রতীক্ষা, নিরাশার বেদনাহত দৃষ্টি, কিছুই আমি ভুলতে পারছি না।

জাহান্দার। খাঁ সাহেব, আমি জানতুম যে আপনার মত খাঁটী একজন মুসলমান মোগল সাম্রাজ্যে আর দ্বিতীয় নেই। আমার সে বিশ্বাস আজ ভেঙ্গে গেছে, আপনি কিনা শুধু একটা ভাবের জন্য ধর্ম্মকে অবহেলা কর্ত্তে যাচ্ছে? সেনাপতি জুলফিকার! প্রচার করে দিন আজ হতে জাহান দিল্লীর সম্রাট। মহারাজ! আপনার যদি বাধা দেবার ইচ্ছা থাকে বাধা দেবেন তাকে আমরা একটুও ভীত নই।

অজিতসিংহ। শাহজাদা, অজিতসিংহ চিরদিনই সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। এ শিক্ষা সে রাজপুতানার গৌরব বীর দুর্গাদাসের নিকট হতে সে পেয়েছে। প্রস্তুত থাক্‌বেন সেনাপতি, জুলফিকার! এসো রাজসিংহ কাজ শেষ হয়ে গেছে।

জুলফিকার। মহারাজ, মিমাংসা না হতেই চলে যাচ্ছেন.........

অজিতসিংহ। সেনাপতি, রাজনীতিতে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি, আমার বুঝতে কিছুই বাকী নেই। আপনার কি অভিসন্ধি সেও বলে পারি।

জহান্দার। শুনেছিলাম রাজপুত জাত রাজভক্ত কিন্তু এখন দেখ্‌ছি রাজপুত শ্রেষ্ঠ অজিতসিংহই বিশ্বাসঘাতক।

অজিতসিংহ। খবরদার শাহজাদা, মিথ্যা অপরাধে অপরাধী ক'রবেন না। রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক অজিতসিংহ নয়—সে আপনারা। ছিঃ—এসো রাজসিংহ।

(অজিতসিংহের এবং রাজসিংহের প্রস্থান)

চিন্‌কালিচ্‌। যা ভেবেছিলুম, তাই হলো—বাদশা ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেকের পুনরাভিনয় এবার চোখের সামনে দেখ্‌তে হল।

তুমিই না জুলফিকার বাদশার মৃত্যু শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তার শেষ ইচ্ছাটাকে পূর্ণ করবার জন্য শপথ গ্রহণ করেছিলে? আর আমি কিনা তার প্রতিবাদ করেছিলাম।

জুলফিকার বয়স অনেক হয়েছে, এ পৃথিবীটাকে এতদিন দেখে দেখে এর উপরই একটা ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, কি হিংসা, কি দ্বেষ, কি লোভ, কি অহঙ্কার পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নরকের আগুণ জ্বেলে দিয়েছে। আমিও বিদায় হই, এ অভিনয়ে আর খেলা খেল্‌বার সাধ নেই।

(চিন্‌কালিচের প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—লালকুমারীর বাটীর নিম্ন তলস্থ কক্ষ।

জোহেরা

জোহেরা। লালবিবির চাহনির ফাঁদে কি আট্‌কানোই আট্‌কেছে মন্‌সবদার! এখন ঘুরে ঘুরে এসেই বরাবর ঐ ওপরটীতে। আবার আমাকেও সাহেব যেন এড়িয়ে চল্‌তে চান্‌।

আজ বড় ফুর্ত্তি জেগেছে প্রাণে কাজ প্রায় ফাসিল। মনসবদারের সঙ্গে একচোট্ বাহার খেল্‌তেই হবে। চৌসর ওর সঙ্গে বেশ জমে—বেড়ে মস্‌গুল রকম। আর ঠিক্ সেই রকমই আমার এই পিয়ারের ছোক্‌রা নোকর—মুবাহের।

"মুবাহের!"

বিবিসাহেব! (বলিয়া ছোক্‌রা মুবাহেরর প্রবেশ)

জোহেরা। মনসবদার হামিদ খাঁ এসেছেন?

মুবাহের। বিবিসাহেব!

জোহেরা। ফিরতি পথে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তেই আমায় খবর দিবি।

মুবাহের। বহুৎ আচ্ছা (গমনোন্মুখ)

জোহেরা। এইও উল্লুক চল্লি যে?

মুবাহের। (ফিরিয়া) খাড়া হায় হুজুর।

জোহেরা। খাড়া হায়? পা বাড়িয়ে বাইরের দিকে যাওয়া মানে খাড়া হায়? তুই খাড়া হায়, গাধা!—

মুবাহের। —কুত্তা, ঘোড়া, গিধ্বর, উঠ।

জোহেরা। আমি? আমায় গাল দিচ্ছিস্ তুই? মনিবকে গালাগাল?

মুবাহের। (কাঁদ কাঁদ সুরে) আঁ্যা—হ্যাঁ তোমায় বুঝি আমি গালাগাল করছি? আমি বান্দা গোলাম।

জোহেরা। কিস্‌কা গোলাম?

মুবাহের। হাতকা গোলাম, পাওকা গোলাম, কাপ্‌ড়াকা গোলাম, চুমকি চুনটিয়া উম্‌দে পাড়্‌কা গোলাম বান্দা গোলাম!

জোহেরা। থাম্, থাম্। হিন্দি, উর্দ্দু, পার্শী নানা ভাষায় তালবে—এলেম্, বেটা মৌলবী আর কি! এরপর হয়তো বলে ফেল্‌বি,—দিল্‌কা গোলাম, জান্‌কা গোলাম।

মুবাহের। (জোহেরার মুখে হাত দিয়া) ছোঃ ছোঃ বিবি—কভি নেই, কভি নেই।

জোহেরা। ঠিক্ বাৎ?

মুবাহের। বহুৎ ঠিক্।

জোহেরা। কেয়া পাকড়্‌কে ঠিক্।

মুশাহের। কান্ পাকড়্‌কে ঠিক্।

জোহেরা। বাস! এইবার যা, ওস্তাদজীকে সেলাম দে সবৎ হ'বে।

মোজাহের। বহুৎ খুব আচ্ছা।

জোহেরা। আর বাজ্‌নাটা নিয়ে আসবি!

মোজাহের। মেরা ছোটকী?

জোহেরা। হাঁ, তোমারা ছোটকী? যো—এইসা বাজতা হায় হারামজাদ।

(ইতি মাথায় চাটি)

মোজাহের। নেহি, নেহি, হুজুর। ওস্তাদজীকে—নান্‌কী।

জোহেরা। তুহারা গাল পর যো বাজ্‌তা—ঠুনকী—এইসি লক্ষৌই ঠুংরী। উল্লুক কাঁহাকার! (গালে চটাচট্ প্রহার।)

মোজাহের। নেহি, নেহি বড়ি বিবি সাহেবানা বড়কী উ ঠন্‌ঠনিয়া কাঠ্‌কী!

জোহেরা। হুঁ ঠিক্ যো তুরন্ত লেউ টেগা।

মুজাহের। শ-দকে আচ্ছা লেকিন বহুৎ হয়রানি, উ বুঢ়্‌ঢেকা কান্‌মে বাত্তে মালুম নেই আতা।

(প্রস্থান)

জোহেরা! দেখ্‌ছি, আজ মন্‌সবদারকে! মোজাহেরের মতই ঠিক নাচাবো।

(ওস্তাদজী, পেছনে তব্‌লা লইয়া মুজাহেরের প্রবেশ)

জোহেরা। সেলাম, ওস্তাদজী, তবিয়ৎ সরিফ?

ওস্তাদজী। সেলাম—সেলাম বিবি, সরিফ!

মুজাহের। (ওস্তাদজীর সাম্‌নে তবলা রাখিয়া ঈঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে বাজাইতে হইবে।)

(প্রস্থান)

ওস্তাদজী। হুঁ, হুঁ, হুঁহো যাচ্ছে! (জোহেরার দিকে তাকাইয়া) এক্‌ঠো গজল্?

জোহেরা। উস্‌মে উম্‌রে।

ওস্তাদজী। উস্‌মে উম্‌ছ! হ্যা—হ্যা—হ্যা (হাস্য ভঙ্গীতে) উস্‌মে উম্‌ছে; বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। (নেপথ্যে) বিবি সাহেব! মনসবদার।

জোহেরা। আচ্ছা, হুঁ, (গুণ গুণ করিয়া সুর ঠিক করিয়া লইয়া গাহিল)

(গীত)

মেরে নয়না নজর তেরি মানা

ছোড়ি গইবে হামারা সো নাগরিয়া

বুতা দে তেরি রোস্‌নি—তামাম্ শোধ হুয়া জান্

হামকা পিয়ার-ঘরমে উন্‌কে মজা লুটা —হো বেইমান

(গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হামিদ প্রবেশ করিয়া)

বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, বিবি, এক্‌দম মিঠা সরবতি!

ওস্তাদজী। হাম আভি যাতা হাম্। সেলাম সাব, বিবি সেলাম!

(প্রস্থান)

(জোহেরা মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোন্মুখ)

হামিদ। মুখ ফিরিয়ে পিছন পানে কেন বিবি? আরে আম, আমি ফিরে দাঁড়াও।

(জোহেরা মুখ ফিরাইয়া একবার কুটিল ভ্রূ-ভঙ্গী করিল।)

হামিদ। ফিরে দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও, বিবি, আঁখি ভরে দেখি।

জোহেরা। ঝুটাবাদ, বেইমান। (সরোষে)

হামিদ! ঝুটাবাদ! কভি নেই।

জোহেরা। আলবৎ। আমায় কি তুমি চাও? তোমার নজর এখন দোস্‌রা মুখের উপর। আমার তামাম্ শোধ।

হামিদ। ঝুটাবাদ, ঝুটাবাদ বিবি! দুনিয়া ছুটী হলেও তামাম্ শোধ হবে না।

জোহেরা। ফের, দোস্‌রা ঘরে দস্তি জমাচ্ছ আবার।

হামিদ। আহা! বিবি। মনসবদার আমরা তুরুকসোয়ার, ঘোড়ি ঘোড়া একসঙ্গে কায়দা করি। পিয়ার আমি তোমারই—ওঁর পায়জার।

জোহেরা। শেষে এইসা পায়জার হাঁক্‌বে যে ঐ জুল্‌ফির গোড়া উপরে যাবে সাহেব।

হামিদ। হাঁকুবে? ওঃ মেরা নসীব।

জোহেরা। নসীব তোমরা?—বদমাস্. দম্‌বাজ। তোম্ আভি চলা যাও—হাম্ নেহি মাঙ্‌তা হ্যায়, বিল্‌কুল্ তুঁহারা ছল্‌বল—লেকিন্—

(গীত।)

(মেরা যৌবন) ঘুমাদে ঘুমাদেরে, বেইমান
তু ছিন্ লিয়া মেরা নয়না, তু লুট লিয়া মেরা জান্
দোস্‌রা তেরি, দিল্ পিয়ারী, আভিরে বেইমান্
টুট্ গয়ি মেরে কলিজা, হো, হো, জান্ হয়রাণ
যো গয়ি উ নেহি লৌটেগা, যৌবন গেয়া তামান্
আখিয়া কাজর রহি বাকী নেহি পাঁচরাণ।

হামিদ। ওগো, বিবি, বিবি—এই কলিজা পেতে দিচ্ছি—কাটারী বসিয়ে দাও। বহুৎ গোস্তাকী হয়েছে; মাপ কর, মাপ কর গোলামকে, আজ হ'তে আমি তোমারি—দিন্ ভর, রাত ভর, মাহিনা ভর, বরষ ভর আর উমের ভর। আর কি চাই?

জোহেরা। নাকে খৎ?

হামিদ। খৎ, খৎ নাকে খৎ।

জোহেরা। তা'হ'লে দাও এখানে খৎ।

(হামিদ নাকে খৎ দিল।)

জোহেরা। আচ্ছা, চল মতি মস্‌জিদে। বিবিকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব দেখিয়ে দেবে।

হামিদ। চল্।

জোহেরা। কিছু মনে ক'র না সাহেব।

হামিদ। আরে ছোঃ ছোঃ।

(সকলের প্রস্থান)

পটনিক্ষেপ।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গাতীরস্থ শিবির।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্যগণের গান।

ছিল গো যেদিন গগন ধরণী আলোক আকুল করা
ফাগুন যামিনী দখিন বাতাস স্নিগ্ধ গন্ধ ভরা
আজো, আজো তাই, শুধু কাছে নাই, নয়নে স্বপন দিয়া
(ওসে) আমার পরাণ প্রিয়া, সে মোর অল্প বয়সী প্রিয়া ॥
বিফল শয়নে ব্যাকুল নয়নে সারা নিশি জেগে একা
পিপাসা কাতর ব্যাকুল অধর দূরে প্রিয় নাহি দেখা
এলো কেশরাশি নীরব বাঁশরী পরশ অধীর হিয়া
(কোরাস) আমার পরাণ প্রিয়া, সে মোর অল্প বয়সী প্রিয়া।
খসিয়া লুটিছে বুকের বসন ভেঙ্গে গেছে অভিমান
আঁকে নাই গালে কুঙ্কুম রেখা, কণ্ঠে নীরব গান
তবু যে বাতাস ফেলে যায় শ্বাস কুন্তলে দোলা দিয়া
(কোরাস) আমার পরাণ—প্রিয়া, যে মোর অল্প বয়সী প্রিয়া ॥

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

(কুসুম ও আজীমের প্রবেশ।)

আজীম। কুসুম, এ কারা গাচ্ছিল?

কুসুম। আমাদের ছাউনীর বাঙ্গালীসৈন্য।

আজীম। হাঁ, নিশ্চয়ই বাঙ্গালীসৈন্য—এত আনন্দ এত প্রাণ কার আর আছে? আনন্দ তার বর্ষাকালের নদীগুলির মত দুকূল ছাপিয়ে বয়ে যায় আর প্রাণ তার সরল উদার মুক্ত আকাশের মত অবাধ।

ঐ শুন কি মধুর কণ্ঠ গঙ্গার কূলে কূলে প্রতিধ্বনি তুলে দূরে নিঝুম গ্রামগুলির উপর মিলিয়ে যাচ্ছে। আজ যুদ্ধ করতে এসেও প্রাণে ভয় নেই—কেমন নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্ক। কুসুম, কালিদাস পড়েছ?

কুসুম। কে সে, কাফের? আমি কাফেরের কোন বই পড়ি না।

আজীম। সব জায়গায় একই কথা, খালি কাফের.—কাফের,—কাফের আর যবন,—যবন,—যবন। এ দুটো কথা মন থেকে মুছে ফেলে দাও। কুসুম! কালিদাস একজন মহাকবি ছিলেন। তাঁর মেঘদূত এক অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের খনি। আজ এই সৈনিকদের সুরে সেই বিরহের ব্যথা ফুটে উঠেছে। "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘ-বিদ্যুতিত অম্বরের নীচে বসে যেমনটা কিনা মনে হয়েছিল "কান্তবিরহবিধুর যক্ষের মনে।"

কুসুম। শাহজাদা, আমাদের আজই এ স্থান ছেড়ে যেতে হবে।

আজীম। দিল্লী হ'তে কোন খবরই ত পাচ্ছি না। পিতা বেঁচে আছেন, না সব শেষ হ'য়ে কিছুই জানি না। যদি বেঁচে থাকেন, তবে কি তিনি পুত্রের এ ব্যবহার ক্ষমা করবেন? কখন না?

কুসুম। কোন অপরাধে শাহজাদা?

আজীম। তিনি মৃত্যুশয্যায় পড়ে আর আমি—আমি সিংহাসনের আশায় সৈন্য জুটিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি, একি সামান্য অপরাধ কুসুম?

কুসুম। সে ঠিক্ বটে, কিন্তু যদি তিনি এ বংশের রীতে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াইর কথা স্মরণ করেন, তবে তাঁকে ক্ষমা কর্ত্তেই হবে।

আজীম। অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে! সাম্‌নে একটা মিশ্‌মিশে কাল পর্দ্দা ঝুল্‌ছে—ওর অন্তরালে, কি হচ্ছে কারু জান্‌বার উপায় নেই। আঁধারে পা' ফেলে ফেলে চল্‌ছি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। বাইরে হোসেন আলিখাঁ অপেক্ষা কর্‌ছেন।

আজীম। তাকে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

আজীম। হোসেন, তোমাকে একটা গুরুতর কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছি—আশা আছে তুমি এ ভারটা বহন কর্ত্তে পার্‌বে।

হোসেন। শাহজাদা, কাজ যতই কঠিন হউক না কেন, এ অধীন সব কর্ব্বে শপথ করছে।

আজীম। আমি জানি হোসেন, তোমায় শপথ কর্ত্তে হবে না, যার কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে তাকে শপথের বাঁধনে বাঁধতে চাই না। রুস্তম, সিয়ারকে নিয়ে এস।

(রুস্তমের প্রস্থান)

হোসেন, সব কথা শুনেছ বোধ হয়? আমি দিল্লী যাচ্ছি—সিয়ারকে তোমার কাছে রেখে যেতে হবে। দিল্লীতে পৌঁছবার পথেও যুদ্ধ বাঁধতে পারে—তাই তাকে আর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। জানি না কি হবে!

(সিয়ার ও রুস্তমের প্রবেশ)

এসো সিয়ার কাছে এস, রুস্তম, তোমাকে বেশী বলা অনাবশ্যক মনে করি।

হোসেন। শাহজাদা, আপনার কোনই চিন্তা নাই। আপনার দয়াতেই হোসেন আজ বাঙ্‌লার শাসনকর্ত্তা—এ কথা সে কখনও ভুল্‌বে না, আজ হতে সিয়ারের সব ভা'রই আমি নিলুন।

সিয়ার। পিতা, শুন্‌ছি, আপনি নাকি দিল্লী যাবেন? আমিও যাব।

আজীম। না সিয়ার, তোমায় বাঙ্‌লাতেই থাক্‌তে হবে।

সিয়ার। আবার আপনার কবে দেখা পাব?

আজীম। শিগ্‌গিরই পাবে, এসো হোসেন, এই নাও।

(হোসেনেরজানু পাতিয়া উপবেশন : তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা আজীমের পাদস্পর্শ করে সিয়ারের হস্তধারণ।)

আজীম। এখন যাও, হোসেন।

(সিয়ার এবং হোসেনের প্রস্থান)

আজ একটু নিশ্চিন্ত হলুম। রুস্তম, কথা বল্‌তে বল্‌তে আমার স্বরতো কেঁপে উঠ্‌ছিল না।

চোখের জল অনেক কষ্টে থামিয়ে রেখেছি। সিয়ার ত এমন কিছু বোঝে নাই যে তার সঙ্গে আমার আর দেখা নাও হতে পারে। রুস্তম, তুমি বোধ হয় ভাব্‌ছে আমি এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি কেন?

রুস্তম। না শাহজাদা একটুও আশ্চর্য্য হইনি। আপনার হৃদয় যে এত স্নেহ ভালবাসা পূর্ণ তা' আমি জানি।

আকিম। শিশুকাল হতে মাতৃহীন সন্তান, এই বিশ বচ্ছর ধরে যে আমিই তার পিতামাতার দুটো স্থানই অধিকার ক'রে ছিলাম।

চল রুস্তম যাত্রার উদ্যোগ করা যক্। শিবির যে একবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, শুধু গঙ্গার অস্ফুট কল্লোল একটু একটু শুনতে পাওয়া যায়। সৈনিকেরা সব সুষুপ্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। রুস্তম, এখনই কি এদের এ শান্তিটুকু ভাঙতে হবে ?

রুস্তম। হাঁ শাহাজাদা।

আকিম। এটুকু তাদের ভোগ কর্ত্তে দেও। ব্যথা বেদনা মার হাতের মত কোমল স্পর্শে কোথায় দূর হয়ে যায়। কুস্বপ্নের ঘোরে এ শান্তি যাদের নষ্ট হয় তারা বড়ই দুর্ভাগা।

(সকলের প্রস্থান)

পটনিক্ষেপন।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গীত।

[রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া]

জানে না কেউ জানে না।

কচি কোমল ক্ষুদ্র বুকে, কেন জাগে বেদনা।

নির্ভাবনার হাসি-মুখে, খেলত যে জন শান্তি সুখে,

কে জানে তার, কোন কুহকের নিদয় ছলনা !—

হঠাৎ ব্যথা বাজ্‌ল বুকে, করুণ বিষাদ জাগ্‌ল চোখে,

ঘনিয়ে এল নেশার ঝোঁকে, প্রাণের যাতনা!

হাসির কথা, দারুণ ব্যথা, (চুপ্ চুপ্) শুন্‌তে সে মানা !!

স্বরলিপি।

—:০:—

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আশোওয়ারি মিশ্র—খেম্‌টা।

০ ১ ২´ ৩
II । । সা | {ঝা মা -পা I র্সা -া ণা | দা পা -া |
০ ০ আ সে মা ০ কে উ জা নে না ০

০ ১ ২´ ৩০
| । । মা | পা দা -পা I জ্ঞা -মা জ্ঞা | (ঝা সঋা দা)} |
০ ০ আ সে মা ০ কে উ জা নে না০ 'আ'

৩০ ০ ১০ ২´
| ঋা সা -া | {। । সা | ঝা মা পপা I ণা -া ণণা |
সে মা ০ ০ ০ ক চি কো মল্ হৃ ০ য়

৩০ ০ ১ ২´
| ধা ণা -া | । । জ্ঞা | জ্ঞা ঝা র্সর্সা I ণা -র্সা ণণা |
বু কে ০ ০ ০ ক চি কো মল্ হৃ ০ য়

৩ ০ ১ ২´
| দা পা -া | । । মা | পা দা পা I জ্ঞা -া মা |
বু কে ০ ০ ০ কে ম জা গে বে ০ দ

৩ ০ ১ ২´
| পা -া -া | । । জ্ঞা | মা পা মা I জ্ঞা -া ঋা |
না ০ ০ ০ ০ কে ম জা গে বে ০ দ

৩ ০
| (সা -া সা)} | সা -া -া | । । সা II
না ০ 'ক' ন মা ০ ০ ০ 'আ'

১০
II -া -া জ্ঞজ্ঞা | {মা দা ণণা I র্সা র্সা র্সা | সা -া -া |
০ ০ নির্ ভা ব নায় হা সি মু খে ০ ০

| া া র্সর্সা | র্ঋা ণা র্সর্সা I দা ণা দা | পা -া -া |
০ ০ নির্ ভা ব নায় হা সি মু খে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| া া পপা | দা মা পপা I জ্ঞা -মা জ্ঞা | ঋা সা -া |
০ ০ খেল্ ত রে জন্ মা ন্ ভি সু খে ০

০ ১ ২´ ৩
| া া সা | ঋা ণা সসা I সা -মা মা | মা মা -া |
০ ০ কে জা নে হায় কে ০ জা নে হা য়

০ ১ ২´ ৩
| া া দা | দা মা দদা I দণা -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
০ ০ কে জা নে হায় কে০ ০ জা নে হা য়

২´
| র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -া I ণা দা দপা | -মা জ্ঞা মদা |
কো ন্ সু খ কে খ্ নি যে যে০ ব হ ন০

০ ০
| (পা -া জ্ঞজ্ঞা)} | পা -া সা II
মা ০ 'নির্' মা ০ 'ভা'

০ ১ ২´ ৩
II া া মা | {মমা দা দা I ণা -া ণা | র্সা র্সা -া |
০ ০ হ ঠাৎ বা থা বা জ্ ল বু কে ০

০ ১ ৩ ২´ ৩
| া া র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্জ্ঞা র্সা র্ঋা I ণা -র্সা ণা | দা পা -া |
০ ০ হ ঠাৎ বা থা বা জ্ ল বু কে ০

| I I পা | দদা মা পপা I জ্ঞা -া জ্ঞা | ঋা সা -া |
০ ০ ক রুণ্ বি ষাদ্ জা গ্ ল চো খে ০

০ . . ১°
I I সসা | রা মা মা :
০ ০ ঘনি য়ে এ ল ঘ নি য়ে এ ল ০

০ . . ১
I I দদা | ণা ণা র্সা I সা জ্ঞা ঋা | ঋা র্সা -া |
০ ০ ঘনি য়ে এ ল ঘ নি য়ে এ ল ০

০ ১ ০ ২´ ৩
I I র্সা | জ্ঞজ্ঞা র্রা জ্ঞা I দা দা -া | ণা -জ্ঞা ঋা |
০ ০ নে শার্ দো কে, প্রা নে র্ ষা ত

০
(র্সা -া মা)} | র্সা -া সা | {রা মা -পা I সা -া ণা |
না ০ 'হ' না ০ জা নে না ০ কে উ জা

৩ ০ ০ ১
দা পা -া | (I I সা)} | I I জ্ঞা | জ্ঞজ্ঞা ঋা সা I
নে না ০ ০ ০ 'জা' ০ ০ তা সির্ ক থা

২´ ৩ ০ ১
র্সা র্সা -ণা | দা পা -া | I I মা | পপা মা পা I
দা রু ণ্ ব্য থা ০ ০ ০ তা সির্ ক থা

I জ্ঞা মা -জ্ঞা | ঋা সা -া | র্সা -া সর্সা | I র্সা -া I
দা রু ণ্ ব্য থা ০ চু প্ চুপ্ ০ চু প্

২´ ৩ ০ ১
I মা -া মা | পদা -ণর্সা র্সা | সা -া -া | I I I I
স্ব র্ তে গে০ ০০ মা না ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ণা -া ণ | পা -ণা দা | পা -া -া | । মা মা I
শু ন্ তে সে ০ মা না ০ ০ ০ ও গো

২´ ৩ ০ ১
I মা -া মা | জ্ঞা -া ঋা | সা -া -া | । । । I
শু ন্ তে সে ০ মা না ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ণা -া সসা | । জ্ঞা -া | মা -া মা | পা -ণা দা I
চু প্ চুপ্ ০ চু প্ শু ন্ তে সে ০ মা

২´ ৩ ০
I পা -া -া | -া -া -া | । । সা II II
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 'আ'

☞ দ্রষ্টব্য। স্বরলিপিতে তারা ※ চিহ্নিত সুরাক্ষরগুলি স্বাভাবিক (Natural) সুরে উচ্চারিত হইবে।

ভেরী

-০:০-

এখন অশ্রুভগান "ভেরী" এই সুপ্ত, নৈরাশ্য বিজড়িত অবসাদ-সিন্ধুর স্থির! কল্লোলহীনা ও স্ফূর্তিহীনা প্রবাহ থেকে সেই অনন্তশায়ী পুরুষের রচা অনন্তশয্যাজাত গুরু গম্ভীর স্বরে প্রতি কর্ণ-রন্ধ্রে ধ্বনিত হয়ে উঠবে আশার লালিমামণ্ডিত অনুভূতি নিয়ে। এই অনুভূতিই বহু দিনের তামস্রা নিশির ঘনীভূত কালিমা মুছে দিয়ে প্রাণে হিরণ্ময়ী প্রতিমার দীপ্ত ছবির ভাব-প্রবাহে সমুজ্জ্বল চন্দ্রক স্নাত বিরাট আকাশ পথে দিশারীর মত নূতন মতবাদে প্রাণ স্পন্দন করে তুলবে। তখন ভেরীর নূতন গম্ভীর ধ্বনি থাকিয়া-থাকিয়া, রহিয়া রহিয়া যে

রোমাঞ্চকারী বাদ্যনিনাদ তুলবে তাহার পরিণাম, তাহার সুসংবদ্ধ তালের উত্থান ও পতনের গতি হবে অবিশ্রাম ও অশ্রুতপূর্ব। তখন জাগরণের মুক্তি-অমৃত সকলে প্রাণভরে পান করবে। তাহাতে মানব যে চির-সত্য-সুন্দর বিশ্বছবির অপূর্ব দীপ্তির আভাস পাবে, তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে উদারশীলতার নব স্ফুরণে। এ সেই পরম পুরুষের অবদান। ভেরী বাজবেই, তীব্রস্বরে ও গুরুগম্ভীর স্বরে বাজাবে। হৃদয়ের প্রত্যেক রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহুদিনের সেই পরম পবিত্র সনাতনী ভাব মাহাত্ম্য আবার এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত হবে। এ প্রলয়ের বলিদান—পুরোহিত তার স্বয়ং প্রলয়কর্ত্তা। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, মান ও অভিমান, জাতি-বিদ্বেষ ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি পাশব শক্তিপুঞ্জের বলি হবে তখন, যখন প্রলয়ের শিব ভাবস্তিমিত নেত্রে মাতাল হয়ে নূতন প্রেম বিলাইবার জন্য উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসবে প্রত্যেক মানবের হৃদয় পদ্মে নূতন দেবীত্ব গড়ে তুলবে বলে। এ ভেরীর বাদন থামে না; এ বাদনের তান লয় সুর খনিয়া খনিয়া হৃদয় যন্ত্রে যে গম্ভীর শব্দে পুরিয়ে রেখেছে তার সীমাও পরিমাণ সাধারণ মানব-বুদ্ধি-জাত কোন মাপকাঠী মাপিতে পারে না, তাহা চির নূতন—অফুরন্ত—অসীম। তাই তার একটা অতীতের উজ্জ্বল ছবি আমরা দেখিতে পাই বাঙ্গলার নবদ্বীপে। তখন ভেরী সাত্ত্বিক ভাবে নূতন প্রেমে বুঁদ হয়ে আপনি ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ন'দের কানায় কানায় প্রেমোন্মত্ত গোরা'র ভাব-তরণীতে নূতন প্রেম সলিলের যে অবিরত ঢেউ লেগেছিল তাহার মহিমা এই দেশমাতৃকা আজও সাদরে বুকে ধারণ করে রয়েছে। সে সে গোরার অনন্ত জীব প্রেম অতীব গূঢ় কিন্তু অতীব আনন্দ উৎপাদক ও নূতনের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। আবার ভেরী উদাত্ত স্বরে প্রাণ আকুল করে ধ্বনিত হয়ে উঠবে এবার বলবে জয় গুরু মহারাজকী জয়। পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, স্থাবর, জঙ্গম নীরবে যেন কাহার অদর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন করছে। বেজে উঠো ভেরী চির-সত্য-প্রেম গদগদ স্বরে দাও তাই ঐ বিরহ-দগ্ধ হৃদয়ে তোমার গুরু মহারাজকী জয় শুনিয়ে দাও ওরা নূতন প্রাণে জীবনীশক্তি পেয়ে বেঁচে উঠুক। এবার ভেরীর গান প্রত্যেক দেশভাইকে শেখাবে।"

"ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্ণা সূনৃতে নার্জ্জবেন চ।
বশীকুর্য্যাৎ জগৎ সর্ব্বং বিনয়েন চ সেবয়া।"

এইবার ভেরীর সেখপায় ভেসে আসবে সেই পরম দয়িতের হৃদয় কন্দর হইতে নূতন

জাতীয়ত্বের রাঙ্ তায় সকলের প্রাণের আবেগকে সাত্ত্বিকতায় মুড়িয়ে বেঁধে নূতন প্রাণ দিলেন। এবার ভেরীর বাদনে আমাদের পেতে হবে তিন শক্তি। প্রথম—আত্মশক্তির স্ফুরণ, দ্বিতীয়—স্বরাজ, তৃতীয়—প্রেম। এই ত্রয়ীর মিলনে জাতির যে বনিয়াদ তৈরী হবে তাহার পরিণাম হবে দৃঢ় অটুট। যেমন লোক-মান্য তিলক ছিলেন একজন মহাতেজা, আত্মশক্তির স্ফুরণ তাঁহার তেজের সামনে সকলের ব্যক্তিত্ব নত হয়েছিল। ভারতমাতা তখনই তাই ললাটে এই "তিলক" পরে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের এ ভীষণ পরীক্ষার সময়ে সে তিলক কালের নির্ম্মম নিশ্বাসে তিরোহিত। যাউক তাতে ক্ষতি নাই, এবার ভেরী বেজেছে স্বারাজ্য ও প্রেম নিয়ে। উত্থান হবেই হবে। উত্থান ও অনন্ত প্রলয় পয়োধিজলে নূতন কর্ম্মের পোত ফিরে আসবে তখন নবীন নীলিমায় কর্ম্মের অগাধ থৈ থৈ উৎসাহ-সিন্ধু নবতেজে উথলিয়া উঠিবে। তখন অকাম স্নিগ্ধ শেফালীর মত ভেরীর গান প্রত্যেক মানবহৃদয় শুদ্ধ সত্ত্বায় ভরে তুলবে। ভেরীও সঘনে বেজে উঠবে।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভির্ন সবধ্যতে॥

দাসী।
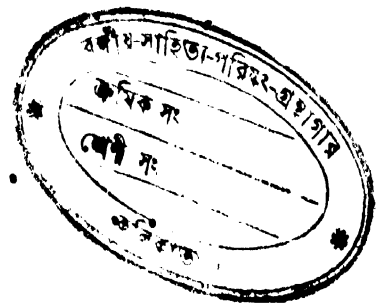
অন্ধ যখন পুরী আঁধার রাতে
রাজা তাহার এল বাসর ঘরে,
সোণার খাটে দুধের বিছানাতে
রাণী তখন ঘুমায় অকাতরে।
রাজা তারে তবুও কহে ডাকি
'আর কত ঘুম আর কত ঘুম বাকি?'

সে-ডাক নাহি পশে রাণীর কানে—
অলস ঘুমে জড়িত আঁখি দুটি ;
আলোর ডাকে নিশার অবসানে
চিত্ত-কমল উঠ্‌ল না তার ফুটি।
বিশ্ব তাহার রইল অন্ধকার,
চলিল রাজা খুলিয়া গৃহদ্বার।

স্তব্ধ যখন পুরী ঘুমের ঘোরে
প্রভু তাহার এল আঙ্গিনাতে,
মলিন-তনু জাগিয়া আপন ঘরে
রাজ-বালা সে কাটায় সারারাতে।
প্রভু তারে সুধায় ডাকি ডাকি
'আর কত কাল আর কত কাল বাকি ?'
সে-ডাক নাহি চিনিল রাজবালা,
ভয়ে তাহার পাণ্ডু হ'ল গাল ;
দিবা শেষের তরল আঁধার-ঢালা
সন্ধ্যা আসি ফেলে মায়ার জাল।
বিশ্ব তাহার রৈল হাহাকার,
চলিল প্রভু ছাড়িয়া গৃহদ্বার।

স্তব্ধ যখন পুরী উষার মুখে
বঁধু তাহার এল সে রাজ পথে,
ধ্যান মগন বসিয়া নিঝুমে
প্রিয়া তখন শান্ত মহান্ ব্রতে।
বঁধু তারে হাসিয়া কহে ডাকি,
'আর কত ধ্যান আর কত ধ্যান বাকি ?'

সে-ডাকে তারে আকুল করে আজ,
    'কে তুমি গো' সুধায় বঁধু হাসি—
বাঁশীর ডাকে কোথায় রহে লাজ—
    'কুরুকুলের দাসী তোমার দাসী।'
        বঁধুর বাহু বাঁধিল দেহ তার,
        আলোর রথ ছাড়িল পুরদ্বার।

শ্রীসরসীকান্ত দত্ত।

'শীতের রাতে।"

——:o:——

সারা দিনটা মেঘে ঢাকা, কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে; মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। মার্চ্চ মাসের প্রথমে কনকনে উত্তরে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সে দিনটা আমার বেশ মনে পড়ে; সারাদিন ঘরে বদ্ধ থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে মনটা বাহিরে আসিবার জন্য কেন জানি বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাহিরের প্রকৃতির গুরু গম্ভীর মূর্ত্তিও আমার সান্ধ্যভ্রমণের বাধা সৃষ্টি করিতে পারিল না। ওভার-কোট চাপাইয়া জুতা মোজা আঁটিয়া আসিয়া আলোক মালায় সজ্জিত সহরের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম পথে দু'চার জন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের নিকট হইতে আমার এই দুর্দ্দমনীয় স্পৃহার জন্য যে তিরস্কার লাভ করি নাই এমন নয়। হাত দুইটা কোটের লম্বা পকেটে ঢুকাইয়া দিয়া দ্রুত-পদে রেল লাইনের রাস্তা বাহিয়া বস্তির দিকে হাঁটিতে লাগিলাম—সঙ্গে কেহই ছিল না—আমি একা। দু' মাইল রাস্তা পার হইয়া আসিয়া দেখি, অন্ধকার বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; সেখানে সহরের বৈদ্যুতিক আলো নাই। রাস্তার দু পাশে স্থানীয় পাহাড়ী মুটে মজুর কুলীদের ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাড়ী; ভিতর হইতে প্রদীপের আলো দেখা যাইতেছে। আর সবত্রই কুয়াশা

আর ঘন অন্ধকারে আবৃত। এক স্থানে রেল লাইনের ধারে আট, দশটী ভুটিয়া আগুন জ্বালিয়া বসিয়া দিনের উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছে। আমি, অতি সন্তর্পনে ভয়ে ভয়ে এই ভারি দলটী বাঁচাইয়া কিছু দূরে গিয়া পাহাড়ের একটী বেঁকের মোড়ে উঁচু পাথরের ঘেরের উপর বসিয়া নিস্তব্ধ রজনীতে ঝরণার কুলু-কুলু স্বর শুনিতে লাগিলাম; সম্মুখে দূরে বহু দূরে পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে আলোক মালায় সজ্জিত দারজিলিং সহরটী কুয়াসার ভিতর দিয়া কি চমৎকার দেখাইতেছে! অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্য উপভোগান্তে যখন বাড়ীর মুখে ফিরিলাম তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, হাত পা ঠাণ্ডায় আর চলে না।

অন্ধকারে রেল লাইনের রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে যখন প্রায় ভুটিয়াদের একটী বস্তির ধারে আসিয়াছি এমন সময় রাস্তার পাশে কি যেন আমার পায়ে ঠেকিল, দাঁড়াইলাম পকেট হইতে দেশলাইটী বাহির করিয়া জ্বালিবার চেষ্টা করিলাম, তিন চারিবার ব্যর্থ হইয়া অনেক কষ্টে কাঠিটী জ্বালিয়া যাহা দেখিলাম তাহা কতকটা ভয়াবহ এবং হৃদয়বিদারকও বটে। একটী পাহাড়ী বৃদ্ধ রাস্তার পার্শ্বে পাথরের গায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া শতছিন্ন অতি মলিন বস্ত্রে আপন অঙ্গ মুড়িয়া পড়িয়া আছে। ভিতর হইতে শীতে কাতর জরাজীর্ণ বৃদ্ধটী গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে; প্রথমে ভাবিলাম, হয় ত মাতাল, মদের নেশায় পড়িয়া গিয়া তার এই দুর্দ্দশা গায়ে হাত দিতে বা ডাকিতে সেই নির্জ্জন লোকালয় শূন্য পথের মাঝে সাহস হইল না।

একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া একস্থানে পাইন গাছের ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য কি ভাবিতেছি, এমন সময় মনে হইল যেন সে উঠিয়া বসিল, দেশলাই ধরাইয়া নিকটে গিয়া ডাক দিতে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা ছোট্ট কপালের নীচে বড় বড় দুটী অলস চোখ মেলিয়া আমার দিকে অর্থহীন নিরাশা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

দেখিয়া মনে হইল না ত যে এ মদের নেশা। পথপার্শ্বের স্তুপিকৃত শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিবার চেষ্টা করিলাম, পাতা ভিজা ছিল বলিয়া আগুন জ্বলিল না। বুড়াকে নানান্ প্রশ্ন করিলাম, তাহার উত্তর নাই, কেবল অর্থহীন ছল ছল নেত্রে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মনে বড়ই কষ্ট হইল। এই শীতের দুর্দ্দান্ত রাত্রি বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সমস্ত হিমালয় শ্বেত আস্তরণে আচ্ছন্ন, বেচারী নিঃসহায় পথের পথিক বৃদ্ধ জীবনে শেষে এই ভাবেই পায়ের

খেরার পাড়ি দেবে। যদি সে কোথায়ও এতটুকু আশ্রয় না পায় তবে আজিই তাহার মরণ নিশ্চিত। বুড়াকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিলাম, আমার কথায় যেন তাহার কোনই মনোযোগ নাই। কেবল এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। তাহার এই দু'টী অদৃষ্ট পূর্ব্ব চোখের দৃষ্টি যেন আমার মর্ম্মে মর্ম্মে তাহার হৃদয়ের করুণ কাহিনী গাঁথিয়া দিতেছে। শত-দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় যেন এই দু'টী চোখের ভিতর দিয়া বাহিরে আপনাকে সম্পূর্ণ ধরিয়া আনিয়াছে।

অনেক কষ্টে তাহাকে আমার সঙ্গে আনিলাম, মুখে কথা নাই; উদ্দেশ্যহীন ভাবে পাগলের মত পথ চলিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া তাহাকে পাশের একটী ছোট্ট ঘরে থাকিবার মত স্থান করিয়া দিলাম সে তথায় আসিয়াই ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল—জিজ্ঞাসা করিলাম "চা খাবি।" কোনও উত্তর নাই। কেবল সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বেদনাময় স্থির দৃষ্টিতে বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। চাকরটাকে বলিয়া চা করাইয়া দিলাম। ক্ষুধার পীড়নে চক্ চক্ করিয়া ২।৩ গ্লাস চা নিঃশেষ করিল। মনে মনে ভাবিলাম লোকটা পাগল না হইলে এরূপ উদাসীন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক ত দেখা যায় না, নিশ্চয়ই পাগল কিন্তু তাহার মধ্যে পাগলামির কোনও প্রকার চাঞ্চল্য আমার চোখে ত ধরা পড়ে নাই। চা খাইয়া যখন অনেকটা সুস্থ হইল তখন আমি কৌতুহল নিবারণার্থে তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলাম কিন্তু সে অল্প প্রশ্নেরই জবাব দিল, তাহাতে আমার মনের সন্দেহ বাড়িল, বৈ কমিল না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার সংসারে কেউ আছে" বলিল "না"—তোমার বাড়ী? কেবল মাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। মুখে কথা ফুটিল না। আমি তাহাকে বলিলাম "তুমি আমার বাড়ী থাকিবে? এখানে কাজ কর্ম্ম কর;" তাহাতে তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া দুই বিন্দু অশ্রু সেই দুঃখ-ভার-পীড়িত বলি চিহ্নিত গণ্ডদেশ সিক্ত করিয়া ঝরিয়া পড়িল। বুঝিলাম আমার সহিত বাক্যালাপ তাহার বিস্মৃত প্রায় সুখের দিনের স্মৃতি মনের কোণে জাগাইয়া দিতেছে। সে ছিন্ন বস্ত্রের এক কোণ দিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল--"বাবু যে রকম আছি এই রকমই আমায় থাকতে দিন্, জগতে দুঃখের স্বাদ নিয়ে মরতে যেন পারি; আমার সব গেছে, আজ এক এই পাহাড়ের বুকে সবুজ ঘাসে মুখ লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছি। শীত গ্রীষ্ম সব সয়ে গেছে—আমায় বিদায় দিন। তাহার মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা শুনিয়া আমার মন ভয়ে, বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল।

অবাক্ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম কি যে দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। সে মুখের বর্ণ আকৃতি, চোখে শত-দুঃখের ইন্ধনে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা আজিও আমার চোখের সম্মুখে ভাসমান।

সে দিন দুর্য্যোগের রাত্রে কোনও মতে তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়া, মনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব চিন্তা লইয়া বিছানায় শয়ন করিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি কাচের সাসির ভেতর দিয়া আলো আসিয়া ঘরের মেঝের, লুটাইয়া পড়িয়াছে। গত রাত্রের সমস্ত কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়া আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। দূর পাহাড়ের সবুজ গায়ে ধোঁয়ার মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ মালা ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ীর নীচের নীচের রাস্তার স্থানে স্থানে বরফ জমিয়া আছে। জানালা খুলিতেই হু হু করিয়া জল কণা ভরা বাতাসের ঢেউ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। গত রাত্রের কথা মনে পড়ায় তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গেলাম—পাশের ঘরের ভেজান দরজা খুলিয়া দেখি—ঘর শূন্য—মনে নানা সন্দেহ আসিয়া জুটিল। চাকরটীকে ডাকিয়া তুলিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই কি জানিস এই লোকটা কখন চলে গেছে।" সে বলিল "বাবু আমি কিছুই টের পাই নি।" বাহিরে আসিয়া দেখিলাম সদর দরজা ভেজান রহিয়াছে; বাগানের গেটটী বন্ধই আছে। ঘরে ফিরিয়া বিছানায় বসিয়া নানা কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছি। এমন সময় চাকরটী ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে অতি মলিন, তৈলাক্ত কাগজে জড়ান, সযত্নে রক্ষিত একটী ছোট্ট রূপার কানের দুল পাইয়াছে। কাগজের গায়ে ভুটিয়া অক্ষরে কি জানি কি লেখা। পড়িতে পারিলাম না। মুড়িয়া নিজের ডেস্কের কোণে রাখিয়া দিলাম। ভাবিলাম বুড়ার খোঁজ করিয়া তাহার জিনিষ তাহার হাতে ফিরাইয়া দিব। কিন্তু আজিও তাহার কোনও সন্ধান মিলে নাই। আজ কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখনও সেটী দেওয়া হয় নাই। বোধ হয় সে তা'র কোন নিকটতম প্রাণাপেক্ষা প্রিয় লোকের স্মৃতি স্বরূপ এই ক্ষুদ্র চিহ্নটুকু বুকে ধারণ করিয়া গভীর মন কষ্টের মধ্যেও বেদনার ঘাত প্রতিঘাত সহিয়াও বাঁচিয়াছিল। আজ, আমার ঘরে সেই 'স্মৃতি'টুকু ভুলিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে জগৎ সমুদ্রে গা ভাসাইয়াছে। এইটুকুর প্রতি যখনই আমার চোখ পড়ে তখনই সমস্ত জীবনটী যেন কি গম্ভীরতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। বৃদ্ধের হৃদয়ের সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা রাশি যেন রূপোর কানের

ফুল হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয়ে তাহার জীবনের সুরের প্রতিধ্বনি বাজিয়ে তোলে; কি জানি কেন তাহার অজ্ঞাত দুঃখেও আমার মনটা ক্ষণিকের জন্য ভারাক্রান্ত হইয়া আসে।

শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার।

অজ্ঞাতে

আমার　ফুলের কুঁড়ি ফুট্‌ল কোথায়
　　কেউ কিরে তার খবর জানে
মধুর তাহার গন্ধটুকু
　　আস্‌ছে আমার গোপন প্রাণে
দুঃখ নিশি কখন কেটে
পাপড়ি যে তার পড়্‌ল ফেটে গো
গন্ধকোষে গন্ধ তাহার
　　ভর্‌ল সোহাগ আলোর টানে
চিত্ত আমার নিত্য বিভোর।
　　উঠল ভরে বুকের দাওয়া
প্রাণের মাঝে উতল হ'ল
　　গন্ধ আকুল ভোরের হাওয়া!
আমার ফুলে তোমার হাসি
　　পড়্‌ছে লুটে পুলক রাশি গো
পাগল হ'ল হৃদয় আমার
　　অমৃতরূপ সোহাগ পানে!

১১ই মাঘ।

কথিকা।

—ঃ※ঃ—

বহুকালের আগের কথা, গান্ধার-রাজচক্রাধিপ তাঁর কন্যা অপর্ণবা, তাঁরি কাহিনী।

রাজকুমারীর দেহের উপর দিয়ে ষোলটা বসন্ত বয়ে গিয়েছে। ষোল ষোলটা বসন্ত তারি—নিবিড় সোহাগ—সেই সোহাগের স্পর্শ রাজকুমারীর সারা দেহে। মাথায় চুল নয় ত যেন একরাশ চিক্-চিক্-করা কাকপক্ষ, একেবারে হাঁটুর নীচে এসে পড়েছে—চোক নয় ত যেন দুইটী পদ্মের পাপড়ি একেবারে কান পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে—চোখের তারা নয় ত যেন আষাঢ়ের মেঘ তাতে লুকোনো চক্-চক্-করা বিদ্যুৎ—বাহু নয় ত যেন মৃণাল—হাত নয় ত যেন সেই মৃণাল প্রান্তে ফোটা রক্ত পদ্ম। গণ্ড গ্রীবা বক্ষ কটি জঙ্ঘা চরণ সব ষোল ষোলটা বসন্তের নির্ভুল আদরে গড়ে উঠেছে। ষোলটা ফাগুনের আগুন দিয়ে রাজকুমারীর সারা দেহ ঘেরা।

রাজমহিষী রাজাকে বললেন—মহারাজ কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হবে।

গান্ধার-কুমারী স্বয়ম্বরা হবেন। দেশ-বিদেশে রাজাদের কাছে আমন্ত্রণ গেল। কাশী কাঞ্চি কোশল—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ—মৎস্য মগধ মিথিলা—চেদী চোল চালুক্য শতরাজ্য থেকে শত নৃপতি স্বয়ম্বর সভায় এসে বস্‌লেন। তাঁদের দেহের জ্যোতিতে অলঙ্কারের দ্যুতি চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। কত মণি মুক্তা মাণিক্য, কত চুনি পান্না মোতি। তাঁদের মাথায় মুকুট কর্ণে কুণ্ডল গলে মণিহার চন্দনরেখা। শত নৃপতি যেন শত ইন্দ্রতুল্য।

সালঙ্কারা রাজকুমারী মালা হাতে স্বয়ম্বর সভায় এসে দাঁড়ালেন রাজ-কুমারীকে দেখে শত নৃপতি মোহিত হ'য়ে গেলেন। কেউ কেউ আসনে প্রায় অচৈতন্য হ'য়ে পড়লেন।

দ্বারপালিকার মুখে রাজাদের পরিচয় চলতে লাগল। ইনি কাশীরাজ, দেহে নবীন জ্ঞানে প্রবীন; দানে কর্ণ সমান—ইনি বঙ্গাধিপ, শৌর্য্যে সিংহ করুণায় সিন্ধুসম—ইনি চেদী স্বয়ং কুবের যাঁর ধনভাণ্ডার রক্ষা করেন। এম্‌নি এম্‌নি পরিচয় দিয়ে দ্বারপালিকা রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে লাগল এক এক রাজার সামনে রাজকুমারী মালা হাতে দাঁড়ান আর সে আর সে রাজার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে,, চোখ চঞ্চল হয়ে ওঠে—তারপর রাজকুমারী যখন সেখান থেকে সরে যান তখন যেন তাঁর মুখমণ্ডলে কে মসী ঢেলে দেয়, অঙ্গের রত্নরাজি যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে ওঠে—তাঁর হেঁট মাথা বক্ষের উপর লুটিয়ে পড়ে।

এম্‌নি করে' রাজকুমারী শতেক নৃপতিকে অতিক্রম করলেন কিন্তু কারো কণ্ঠেই তাঁর হাতের মালা পড়ল না।

উজ্জ্বল দেব-সভা-তুল্য স্বয়ম্বর-সভা যেন সন্ধ্যার স্পর্শে ম্লান হ'য়ে উঠ্‌ল।

রাজপুরীর আনন্দভাব যেন নিবিড় আঁধারে ঢেকে গেল।

রাজকুমারী অন্তঃপুরে গিয়ে আপন কক্ষে অর্গল বন্ধ করলেন। শত নৃপতি অবনত মস্তকে যাঁর যাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন।

রাজা চক্রাধিপের বক্ষে রাজমহিষীর অন্তরে একটা ক্রন্দন-রোল নিবিড় হ'য়ে উঠল।

রাজকুমারীর নির্জ্জন কক্ষে বিধাতাপুরুষ আবির্ভূত হলেন। বললেন—রাজকুমারী, তোমার মনস্তুষ্টির জন্যে আমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শত নৃপতিকে একত্র করলেম কিন্তু সেই শত নৃপতির মধ্যে তুমি তোমার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেলে না! কি চাই তোমার?

রাজকুমারী কম্বুকণ্ঠ উন্নত ক'রে বললেন—মহান্! নারীর সার্থকতা কি কেবল পুরুষের গলগ্রহ হওয়ায়? ওর চাইতে মহত্তর কি আর কিছু নারীর জীবনে নেই?

বিধাতাপুরুষ জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই তোমার?

রাজকুমারী বললেন—চাই আমি স্বাধীন জীবন।

বিধাতাপুরুষ জিজ্ঞেস করলেন—মূল্য দিতে পারবে?

রাজকুমারী আগ্রহান্বিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—যে মূল্য হোক্ না আমি দিতে প্রস্তুত।

বিধাতাপুরুষ একটু হাসলেন—বললেন—আচ্ছা।

(২)

রাজমহিষী স্বপ্ন দেখলেন। এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এসে তাঁকে বলছেন—শোন্‌রে রাজমহিষি, রাজকুমারী অপর্ণবা সামান্যা নয়। তাকে পুত্রবৎ পালন করবে।

তারপর দিন রাজমহিষী স্বপ্নের কথা রাজাকে জানালেন। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞেস করলেন। মন্ত্রী বললেন—মহারাজ দৈব স্বপ্ন অনুসারে কাজ করাই কর্ত্তব্য—নইলে কে জানে কোন্ অমঙ্গল ঘটবে। দৈব কি কাজের ভিতর দিয়ে কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে চায় তা আমরা মানুষ হয়ে কি বুঝব?

সেই দিন থেকে রাজকুমারীকে শাস্ত্র ও শস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যে শাস্ত্রগুরু ও শস্ত্রাচার্য্য নিযুক্ত হলেন।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে রাজকুমারী শাস্ত্র ও শস্ত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করলেন।

রাজকুমারী যখন শাস্ত্র পাঠে বসেন তখন মনে হয় যেন কোন ব্রাহ্মণ সন্তান জ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত। রাজকুমারী যখন অসি চালনা করেন—ধনুকে তীর যোজনা করেন তখন মনে হয় এত গান্ধার-রাজকুমারী নয় এ গান্ধার-রাজকুমার। রাজকুমারী যখন কর্ণে কুণ্ডল পরে মাথায় শিরস্ত্রাণ দিয়ে দেহ কবচাবৃত ক'রে—তাঁর পৃষ্ঠে তূণ, হাতে ধনু, কটিবদ্ধ কৃপাণ নিয়ে তুরঙ্গম-পৃষ্ঠে মৃগয়ায় যান তখন মনে হয় যেন শচীনন্দন জয়ন্ত।

এমনি করে বছর দুই কেটে গেল রাজকুমারী অপর্ণার মনে ধীরে ধীরে একটা অস্বস্তি জেগে উঠতে লাগল। কি এ অস্বস্তি? কিসের জন্য এ অস্বস্তি? কি চাই রাজকুমারীর? রাজকুমারীর ধ'র' ধরি' করেও ধরতে পারে না। কেবল অস্বস্তি বেড়েই চলে।

দিনের পর দিন কাটে। বর্ষা আসে মেঘের ডমরু বাজিয়ে—শরৎ আসে সোনার আলোয় আকাশ ছেয়ে—হেমন্ত আসে তার সন্ধ্যা কালের করুণ সুর নিয়ে তার পাকা ধানের গন্ধ ছড়িয়ে—শীত আসে তার কুজ্ঝটিকা-ঘেরা রহস্য নিয়ে—বসন্ত আসে তার নব জীবনের গান নিয়ে তার সবুজ প্রাণের চঞ্চলতা নিয়ে, তা'র ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, রূপের নেশা নিয়ে। রাজকুমারীর অস্বস্তি কেবল বেড়েই চলে।

শাস্ত্রগুরু এসে চলে যায়, শস্ত্রাচার্য্য এসে ফিরে যায়, মৃগয়ার অশ্ব যেমনকার সাজান' তেমনি থাকে। রাজকুমারীর শাস্ত্র পাঠেও ভাল লাগেনা, শস্ত্র চালনাতেও প্রবৃত্তি হয় না, মৃগয়াতেও তৃপ্তি মেলে না। রাজকুমারীর যেন কি হয়েছে অথচ নিজেও জানে না যে কি!

একদিন রাজকুমারী স্বপ্ন দেখেন এই বিরাট সংসার কেবল একটা প্রকাণ্ড মায়ের মেলা। প্রত্যেক মায়ের কোলে এক একটী সুকুমার শিশু। মা ও শিশুর চোখে কি যেন একটা অত্যাশ্চর্য্য সুখের অঞ্জন টানা। কি একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে শিশু ও মায়ের জীবনের বন্ধন-গ্রন্থি। রাজকুমারী স্বপ্নের অর্থ কিছুই বুঝতে পারেন না। তাঁর অন্তরে কে যেন এক চিরজাগ্রত দেবীর মর্ম্মতল একটা ক্রন্দনরোলে হু হু করে ওঠে। শাস্ত্রব্যাখ্যায় ও শস্ত্রচালনায় যে দেবীর পূজা সমাপ্ত হয় নি! রাজকুমারীর অস্বস্তি আরও বেড়ে ওঠে।

এক এক দিন রাজকুমারী স্বপ্ন দেখেন যে, নন্দন-কাননে একটা বিরাট শিশুদের হাট লেগেছে—লক্ষ লক্ষ শিশু সব, প্রত্যেক শিশুর পাশে এক একজন নারী। নারীর সমস্ত অন্তর যেন সেই শিশু পুলক স্পর্শে পুলকিত—শিশুর কল-কণ্ঠ শিশুর কল-হাসি, শিশুর সুকুমার স্পর্শের মধ্যে যেন নারী-অন্তরের অন্তরম রহস্য গোপন হয়ে ছিল। নারী-অন্তরের সমস্ত বেদনা মথিত করে' সমস্ত অমৃত মন্থন করে' যেন নবীন ঊষার সোনালী আলোরেখার মতো জীবন নিয়ে জেগে উঠেছে তরুণ সুকুমার শিশু। নারী-অন্তরের সমস্ত সুখ ও আনন্দ যেন শিশু মূর্ত্তিতে শরীরী হয়ে উঠেছে। রাজকুমারীর অন্তরের অস্বস্তি অকূল হয়ে ওঠে।

এমনি করে' দিন যায়। ধীরে ধীরে রাজকুমারীর সখিরা জানল—তারপর সখীদের কাছ থেকে রাজমহিষী জানলেন, রাজমহিষীর কাছ থেকে রাজা শুনলেন। রাজকুমারী যে স্বয়ম্বরা হবেন।

রাজা খুসী হলেন। মন্ত্রীকে স্বয়ম্বরসভার আয়োজন করতে বললেন। দেশ বিদেশের রাজারা আমন্ত্রিত হলেন।

(৩)

সুসজ্জিত স্বয়ম্বর সভা। মনোহর সুনীল চন্দ্রাতপ মণি মুক্তা খচিত—চারিদিকে স্বর্ণ সূত্রের ঝালর ঝুলে পড়েছে—দিকে দিকে পুষ্পমালা পল্লবগুচ্ছ—দিকে দিকে নিপুন তুলিতে আঁকা আলেখ্য। অর্জ্জুনের মৎস্য-চক্র ভেদ, রামের হরধনু ভঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ এমনি সব কত কত ছবি। স্বয়ম্বর সভায় এক শত রত্নাসন। সেই শত রত্নাসনে আবার শত নৃপতি এসে বসলেন।

সালঙ্কারা রাজকুমারী মালা হাতে দ্বারপালিকার সঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় এসে দাঁড়ালেন।

কে ও? কে এ কুমারী? এই কি গান্ধার-রাজকুমারী অপর্ণবা? সে মরালনিন্দিত গতি কই? সে রাজহংসীসদৃশ গ্রীবা ভঙ্গী কই? সে মৃণালসদৃশ বাহু কই? করে সে রক্তপদ্ম কই? অধরপুটে সে কমলস্পর্শ কই? গণ্ডে সে নমনী তা কই? বক্ষে সে তরঙ্গ ভঙ্গ কই? কই কই? সে মন্মথমনোহারিনী লাবণ্যছটা কই? এই কি গান্ধার রাজকুমারী অপর্ণবা? অসম্ভব।

রাজকুমারী এসে দাঁড়ালেন ঋজু তাঁর দেহযষ্টি, চলনে তাঁর পুরুষ দৃঢ় পাদক্ষেপ, গণ্ডে তাঁর পুরুষ-সুলভ কঠোরতা, দৃষ্টিতে তাঁর অসঙ্কোচ দুর্দ্দমনীয়তা, বাহুতে তাঁর সবল মাংসপেশী—রাজকুমারী মালা ধরে আছেন যেন অসি আকর্ষণ করছেন। এই কি গান্ধার রাজকুমারী অপর্ণবা? শত নৃপতি পরস্পরের মুখ খাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

অবশেষে বিদর্ভরাজ আসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। গান্ধার-রাজকে সম্বোধন করে' বললেন—মহারাজ এই কুমারী কে?

গম্ভীর কণ্ঠে গান্ধার-রাজ উত্তর করলেন—মহারাজ এই কুমারী গান্ধার-রাজনন্দিনী অপর্ণবা।

শত নৃপতি আসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। শত নৃপতি এক বাক্যে বলে' উঠলেন—গান্ধার-রাজ, এই কুমারীর পাণিগ্রহণ করতে আমরা অপারগ—আমাদের মার্জ্জনা করবেন আর যুদ্ধার্থেও আমরা অপ্রস্তুত নই।

শত নৃপতি স্বয়ম্বর সভা ত্যাগ করে' যাঁর যাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

রাজকুমারী অন্তঃপুরে গিয়ে আপন কক্ষে অর্গল বন্ধ করে' আকুল হয়ে কক্ষতলে লুটিয়া পড়লেন।

একটা নীরব মর্ম্মস্তুদ ক্রন্দনরোল রাজপুরীর কক্ষে কক্ষে মহলে মহলে ফিরতে লাগল।

দিবা অবসান হল'। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এলো—। সারা রাজপুরী মৃত্যুর মত নিঝুম। সেদিন আর ঘরে ঘরে দীপ জ্বলল না—নহবতে নহবতে রোশনচৌকির সুর ফুটল না—দেবালয়ে আরতির শঙ্খ কাঁসর বাজল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। রাজকুমারীর কক্ষে বিধাতা পুরুষ আবির্ভূত হলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—মহান্! নারী-জীবনের এ কি অপমান!

বিধাতাপুরুষ উত্তর করলেন—নারি! পুরুষের জীবনে মুগ্ধ হয়েছিলে—পুরুষের জীবন আকাঙ্ক্ষা করেছিলে—এই তার মূল্য।

রুদ্ধকণ্ঠে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু নারীর কি মুক্তি কোন দিনই নেই—নারী কি কোনদিনই স্বাধীন হবে না ?

বিধাতাপুরুষ একটু হাসলেন—তার পর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন—রাজকুমারী এই ব্রহ্মাণ্ডে স্বাধীন কে ? সব নিয়মে বাঁধা—আমি পর্য্যন্ত।

রিজলী।		শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হৃদয়-বিলাস।

—:০:—

হৃদয় আমার বিহগের প্রায়
সুরের সরসে সন্তরে,
নব নব সুরে গান ধরে !
অন্ধকারের অতল গুহায়
চায় না থাকিতে বন্ধ,
খাঁচার আদরে কাজ নাই তার
যেথা নাই রূপ গন্ধ।
আপনার সুখে কল্পনা-পাখে
সে যে ঘোরে সব অন্তরে ;
মরুভূর বুকে নন্দন রচে
কোন্ সে যাদুর মন্তরে !
হৃদয় আমার কুসুমের মত
সুরভির রস পান করি—
মধুচাক রচে বুক ভরি।

সবারে যে টানে আপনার পানে
প্রীতির অচ্ছেদ-বন্ধনে,
যার কেহ নাই তারে দেয় ঠাঁই
আপন পরাণ নন্দনে।
সৌরভ-সুধা বিলাইয়া সবে
বেদনা-গরল আনে হরি' ;
করি মধুময় সকল হৃদয়—
রিক্ততা নিজে লয় বরি !
হৃদয় আমার প্রেম বিহ্বল,
তটিনীর মত গান গেয়ে—
আপন ছন্দে যায় বেয়ে !
কত অচেনায় করে পরিচয়,
কত স্মৃতি হৃদে সঞ্চরি ;
হারাণো গানের সন্ধান আনে,
পাহাড়ের বুক দেয় ভরি !
বিরহীর শ্বাসে বিগলিয়া পড়ে,
শীতল পরশ দেয় ছেয়ে ;—
অজানা অসীম শান্তির খোঁজে
আকুল আবেগে যায় ধেয়ে !

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বক্তব্য।*

শক্তির অপচয়—

বাসগ্যাস অগ্নি সংযোগে আলোক উত্তাপের এ ব্যবস্থা অপেক্ষা ঘোর অমানিশার অন্ধকারও ছিল যে শতগুণে শ্রেয়! জীবন প্রাণ ধন সম্পত্তি সমস্তই অগ্নিমুখে আহুতি দিয়া এ নিদারুণ আলোকের প্রার্থনা কে করিয়াছিল! এই অন্ধকারবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের কি অন্য পথ ছিল না! কে চায় তোমার ও সর্ব্ববিধ্বংসী আলোক!

তস্কর যে,—প্রতিবাসীর শত্রু যে তাহার চাটুকারিতায়,—উৎসাহ বাক্যে নিজকে এ দুষ্কার্য্যের জন্য হয়ত গর্ব্বিত মনে করিতে পার—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের অভিশাপ হইতে তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারিবে না কিছুতেই—দুঃখ দূরীকরণের নামে যে মহাদুঃখের সৃজন করিয়াছে—তাহা নিরাকরণ হওয়া কি সহজ! দেশটা ও-আগুনে ছারখার হইয়া গেল—শ্মশানে পরিণত হইল,—গৃহহীন করিল অধিবাসীকে! অনন্ত যন্ত্রণার কারণ হইয়াও অভিলাষ তোমার,—অধিবাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ!

না—না অধিবাসীর আশীর্ব্বাদ তোমার অভিষ্ট নহে—তুমি চাও তাহাদের বিত্ত,—রক্ত—শক্তি। শক্তিহীন তোমার পূজায় আত্মনিয়োগে হইবে বাধ্য—সেই তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাহা কি পূর্ণ হইবার!

মনে করিতেছ—কেন সে সাধ তোমার পূর্ণ হইবে না—কত শত শত বিপন্ন তোমার চরণে লুটাইতেছে—তোমার কৃপা ভিক্ষা করিতেছে—"তুমিই প্রভু,—অনুগ্রহপ্রার্থীকে কৃতার্থ কর!"

কিন্তু ওটা কি তাহাদের হৃদয়ের কথা; ও-কথা শুনিয়া আহ্লাদে, কৃতকার্য্যের আত্মপ্রসাদে আত্মহারা হইতেছ কেন,—ভাল করিয়া ও-স্তুতি বাক্য লক্ষ্য কর—স্বরটা তার

* 'বক্তব্যে'র মতামত বক্তার,—সুতরাং দায়ী তিনি। পঃ সঃ।

তলাইয়া বুঝ—উহার মধ্যে কতখানি তীব্র বিষ লুক্কায়িত আছে,—সুযোগ পাইলে এখনি সে তোমাকে হলাহলে জর্জ্জরিত করিবে!

স্বভাবকে উপেক্ষা করা কি এতই সহজ—প্রকৃতিকে কে উল্টাইতে পারে, অত্যাচার করিয়া লাভ করিবে শান্তি—এও কি হয়!

শত উদাহরণ সম্মুখে তোমার—একবার চাহিয়া দেখ,—কার পরিণাম কি! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে ঐ লেখা—শক্তির অপপ্রয়োগে কি ফল!

শুদ্ধ সত্য স্বরূপের অবমাননা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাও,—সে যে বাতুলতা,—গর্ব্বান্ধ হইয়া ভাবিতেছ বাহুবলে হৃদয়ের দাবি মুছিয়া ফেলিবে! সে কি কেহ পারিয়াছে! অনেক ভুল করিয়াছ, ভোগাইয়াছও অনেক; বন্ধু ফিরিয়া এস,—কুটিলতা পরিত্যাগ কর, কোল দাও, শান্তি উৎসারিত হউক! রক্ষা কর—রক্ষা কর!' নীচের দিকে ফিরিয়া চাও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিও না আর; এত দিনেও কি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ক্ষুদ্রকে বাদ দিতে গিয়া তুমিও যে বঞ্চিত হইতেছ। ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর তুমি,—দরিদ্রের যেমন আশ্রয় তুমি, দরিদ্রও তেমনি তোমার আশ্রয়; কৃষককে তুচ্ছ করিয়া, সাধারণ নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতকে উপেক্ষা করিয়া ভারতের আজ এ দশা,—কি অচিন্ত্য অবনতি। এরূপ অধঃপতিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও কি—সমদুঃখের সহানুভূতির একতায় উদ্ভব হইবে না। শিক্ষার নামে, সভ্যতার নামে এ নরমেধ যজ্ঞ কয় দিন চালাইবে! গৃহদাহী আলোকের অন্ধ গৌরবে সুপ্ত জনসাধারণকে তাচ্ছিল্য করিয়া বলিবে 'অজ্ঞ ওরা, অন্ধকারের জীব ওরা, উহাদের মরণ মঙ্গল!'

আমাদের মৃত্যুই যদি তোমার প্রার্থিত হয় তবে কেন উপকারী সাজিবার ও-ভান, ও-কপটতার কি ফল! তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য। মেকি আর চলে কয় দিন? ধরা পড়িয়াছ—সাবধান হও, স্বার্থের নামে সর্ব্বনাশ করিও না নিজের ও অন্যের! ত্যাগ বিনে অর্জ্জন হইয়াছে কোথা?—

সুখী হইতে চাও যদি ত্যাগে হও সার্থক—দানে তোমার প্রাণ পুষ্ট হউক—সংহারমূর্ত্তিতে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না কোন ক্রমেই।

সাম্যে বৈষম্য।

তবুও বলিবে সংস্কারমুক্তি, উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে ত্যাগ নীতির অভাব! এই যে গদ্যে পদ্যে, কথাবার্ত্তায়, গল্পগুজবে, (সমাজে ঠিক না হ'ক) দৈনন্দিন জীবনে একাকার-বাদ খরতেজে প্রচারিত হইতেছে ইহা নহে কি ত্যাগের নিদর্শন, নহে কি সাম্যবাদের জীবন্ত উদাহরণ! জাতির গর্ব, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ত এখন বদ্ধ কেবল সামাজিক ব্যাপারে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের প্রশ্ন কেবল পূজার মন্দিরে, সেকেলে দিদিমার নিকট—পল্লীর অন্ধকার কোণে ও-সংকীর্ণতা। আলোক উজ্জ্বল সভ্যতার যুগে কে মান্য করে ও জাতির পাঁতি—তবু বলিতে চাও—শিক্ষিত অনুদার! উপদেশক রূপে নিন্দুকের আজনয়ে কি ফল বল! পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া ঈর্ষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাকে লাঞ্ছনা করিতে শিক্ষিতের গুণকে দোষের কালিমায় ম্লান করিতে চাও যদি সে অন্য কথা কিন্তু আজ আর এ স্বদেশীর যুগে, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে বলিতে পারিবে না—শিক্ষিতের নিকট তুমি উপেক্ষিত,—সে তোমায় রাখিতে চায় দূরে!

কে বলে রাখিতে চায় দূরে! শত ধন্যবাদ তোমাকে তোমার সাম্যনীতির জন্য। কিন্তু এ সাম্য তোমার কিসের জন্য? কাহার সুখের প্রয়াসে! হে শিক্ষিত! সে সুখ তোমার না আমার? না উভয়ের?

অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থই কর—আর কৃষকের জন্যই কর পাঠশালা—সর্ব্ব অনুষ্ঠানেই যে সাম্যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য—ওগুলি সত্যই এক মহা প্রাণের উক্তির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি,—কিন্তু তোমার নিকট উক্তি মাত্র! মুক্তির পথ—ক্ষুদ্র অস্পৃশ্য আমি—আমি ত উহাতে সন্ধান পাই না। জানি না আমি অন্য দেশের ভেদাভেদের কথা, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের কি ব্যবহার—কিন্তু সোনার বাঙ্গলায় আমার তখনই বরং ছিল ও জাতিভেদেও সাম্য, শান্তি—এ সাম্যবাদেই এখনি বাজিতেছে বৈষম্য। পল্লীর প্রাণের নিন্দা,—ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণা বিধবার অপবাদ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শুচিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া মনে করিতেছ এক সঙ্গে খাইয়া ছুঁইয়াই হইয়াছ তোমরা তাহাদের অপেক্ষা উদার! মিথ্যা কথা! পল্লীর সন্তান হইয়াও

লক্ষ্য কর নাই কভু পল্লীর প্রাণ—ঐ জাতি বৈষম্যের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে কি প্রাণে প্রাণে গভীর মিলন! অযথা উচ্চ ও নীচ জাতিতে যখন তখন স্পর্শেই কি সাম্য? একে উচ্ছিষ্ট দিয়া, অন্যে তাহা গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট বলিয়াই কি বৈষম্য,—সে উচ্ছিষ্ট, দাতার চক্ষে নহে অনাদর, গ্রহীতার নিকট নহে সামান্য—সে যে স্নেহের দান—পরস্পরের মধ্যে প্রেম স্নেহ বিনিময়ের উপকরণ—সম্বন্ধ স্থাপনের পথ। এক পরিবারের ছোট বড় তাহারা—সে নহে বৈষম্য,—সাম্য তাহার অস্থিমজ্জায়—কেবল সাজ সজ্জায়—বাহ্যিক ভাবে নয় সাম্য—হাড়ে হাড়ে!

আর ঐ সে মেথর বাবুর্চির পাচিত অন্নে সাম্য—সাম্যের প্রকৃতি—মূলনীতি তাহাতে কতটুকু? মনীব চাকরের ভাবে তাহা যেখানে জর্জ্জরিত সেখানে টিকিতে পারে কি সাম্য—ত্যাগ? ত্যাগ নহে—স্থূল স্বার্থের যোগ তবে! সমতা তথায় কোথা? বাবুর্চি নহে যে ভ্রাতা, সে প্রভুর দপ্তরের ভৃত্য,—হুজুরের মজুর। পল্লীর অস্পৃশ্য কেরামত চাচা,—নিধু (চণ্ডাল) দাদা, হাড়নী মাসীর মিষ্টত্ব তথায় কোথায়? সর্ব্বজাতির সমন্বয় হোটেলে নয়,—প্রাণে। হাঁ—নদীয়াচাঁদের মত হাড়ি ডোম চণ্ডালে—পতিতে পুণ্যাত্মায় একাকার করিয়া প্রেমের বন্যা বহাইতে পার যদি এস—হাড়ির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ করিয়া মুখে মুখে তুলিয়া দাও—প্রাণে প্রাণে খেলুক মধুতার বন্যা—সে বন্যার বান ডাকে যে প্রাণে—সেখানে নিয়ম করিয়া রিজোলিউসান বলে বহাইতে হয় না সাম্য,—প্লাবিত হয় কেমন করিয়া, দেখিয়াছে তাহা একদিন জগৎ,—যবন হরিদাসে—জগাই মাধাইএ! প্রেমোদয় না হইলে—সাম্য বৈষম্য অভেদ—পলিটিক্যাল সাম্যকে বঙ্গ করিবে দূর হইতে নমস্কার,—সাম্যের নামে বৈষম্যের বৃদ্ধিতে আর আবশ্যক। অনুভূতিহীন সহানুভূতির প্রসার যত না হয় ততই মঙ্গল!

—সেবক।

মরণ আড়াল।

—:o:

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিকৃত কর্কশ কণ্ঠে ভদ্রলোকটি বলিলেন—"নরকে কি আর যায়গা ছিল না—যত আপদ জুটছ এসে এখানে! জেলের পোষাক ছাড়বারও অবসর হয় নি—সেটুকু তর্ সয় নি—জেল থেকে বেরুতে না বেরুতে আবার চেষ্টা দেখতে আমার বাড়ীতে অনুগ্রহ করা হয়েছে!"

নিরুপায়! পলায়নের আর পথ নাই। হাতে হাতে যখন ধরা পড়িয়াছি, তখন কাকুতি মিনতি করিয়া ইহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি ভাল, নতুবা আবার সেই নরক,—জেল! সাহসে মন বাঁধিয়া বলিলাম—"সত্যিই নরকেও আমার জায়গা নেই,—দেখতেই পাচ্ছেন—জেল হতে পালিয়েছি আমি; কম কষ্টে এ বিপদে ইচ্ছে করে ঝাঁপ দেই নি। এখন রাখতে হলেও আপনি, মারতে হলেও আপনি!—আবার যদি সেই জেলে পাঠান—তা হলে—তা হলে—ওঃ তারা আর আমায় আস্ত রাখবে না—তার চাইতে আপনি না হয় কেটে আমায় দু'খানা করে ফেলুন,—সকল যন্ত্রনার অবসান হ'ক।"

তিনি ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন—"খুব সোজা পথটা ত দেখিয়ে দিলে যা হোক,—তা না হলে জেলের কয়েদী,—বলেছ বেশ—তোমায় কেটে ফাঁসী কাঠে ঝোলাটা খুব সুখের হবে বৈ কি, সে চেষ্টাটা না হয় পরে দেখা যাবে,—এখন আমার জানা দরকার কোন জেল হতে মহাশয়ের আগমন?—কাগজে যে পড়ছিলেম—নসীপুর জেলে অগ্নিকাণ্ড করে' একটা পুরানো কয়েদী পলাতক, তিনি কি আপনি?"

উত্তর করিলাম "আজ্ঞা হাঁ—তবে লঙ্কাকাণ্ডটা আমার কৃতিত্বে নয়!"

তিনি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "স্বাগত! আপনাকে নিয়ে এত তোলপাড়—আর আপনি এখানে; ভাগ্যবান আমি,—আপনার জন্য দুইশো টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে,—ধরে দিলেই হাতে হাতে পাওনা। মনে হচ্ছিল—আপদ আপনি—তাল তাল—উঠে বসুন—দু'শো টাকার তোড়া আপনি!"

তাঁহার কথা শুনিয়া একদম দমিয়া গেলাম ; হা অদৃষ্ট. এ কি হইল ! বলিলাম "মরাকে আর মেরে ফল কি ! দয়া করুন, রক্ষা করুন,—কত দু'শো টাকা আপনার আসছে যাচ্ছে,—এমন বাড়ী ঘর আপনার,—টাকার কাঙাল নন নিশ্চয় আপনি—আমার স্বাধীনতা দিলে ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন—কয়েদী আমি সত্যি—চোর ডাকাত নই আমি—অদৃষ্টের তাড়নায় জেল কয়েদী—অনেক ভুগেছি, পালিয়েও নিরাপদ হই নি—আবার জেলে যেতে হয় যদি—তা হলে আর বাঁচতে হবে না—কলে কলে মারবে—তার চাইতে, সত্যই বলছি—আমায় এখনি মেরে ফেলে সব যন্ত্রণার শেষ করুন.—দোহাই আপনার—জেলে আমায় পাঠাবেন না ।"

তিনি কোনও উত্তর না দিয়া কেবল মাত্র অতি গম্ভীর ভাবে উচ্চারণ করিলেন "হুঁ !" বুঝিলাম না, আমার কাতর উক্তি নিমজ্জিতের নিরাশ প্রাণের করুণা ভিক্ষার অতি করুণ সুর তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল কি না,—সে বদন মণ্ডল এমন একটা কদর্য্য নিষ্করুণ কুঞ্চিত কর্কশভাবে মলিন যে তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রতিফলিত হইবার নহে ! তাঁহার খেনবৎ বক্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন সৃষ্টির বাহিরের, তাহার ভাব উদ্ধার করা আমার সাধ্যের অতীত ! আমি আবার বলিলাম,—আমার কণ্ঠস্বর আমার নিকটেই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল,—হৃদয় নিরাশায় নিমজ্জমুখী হইয়া যেন বলিয়া উঠিল—কার কাছে আশা কর দয়া, এ যে পিশাচ—বল প্রয়োগে পাও যদি অব্যাহতি । না—সে কি হয় ! আবার বলিলাম—'দয়া করুন ! চুরি করতে আপনার ঘরে ঢুকি নাই,—নিরুপায় হয়েই এ ভাবে চোরের মতন এ পোষাক বদ্‌লাতে এসেছি, নৈলে যে আমার পলায়েও রক্ষা নেই—আমায় সেই ভিক্ষা দিন—এ হেয় বেশ হতে আমায় অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন,—আমি প্রতিজ্ঞা করছি এখনি এ বাড়ী—এ সহর—ত্যাগ করে যাব, আমায় আর কোন দিন দেখতে পাবেন না—দূরে অতি দূর দেশে চলে যাব—সৎভাবে জীবন যাপন করব—ভগবানের শপথ—আমি চোর নই—চুরি করব না জীবনে,—রক্ষা করুন—জীবন দিন,—ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন !"

'কতুকাল তিনি নীরবে কাটাইয়া বলিলেন "ভাল কথা । আমার মঙ্গল করবার আগে তোমার মঙ্গল করাই দেখছি ভগবানের অভিপ্রেত হয়েছে—ভাল তাই হ'ক—আপদেই হ'ক আপদ শান্তি—যা বলি তুমি যদি তাতে রাজি হও তা হলে এখানেও মত বেঁচে থেকে পার

বটে,—আমারও একটু সুবিধে হয়। ভগবান করবেন আমার মঙ্গল সে ভগবানের আজও জন্ম হয় নি—যত রাজ্যের আপদ এনে জোটাচ্ছেন—দেখ্‌ছ না কি—ঝুলছে ওটা কি! অন্য যায়গায় স্থান হ'ল না ঝুলে পড়্‌ল এসে আমার বাড়ীতে,—লোকে ভাব্‌বে কি,—বেটা একবার সেটাও ভেবে দেখ্‌লে না!"

এতক্ষণ নিজের মহা বিপদে আত্মহারা হইয়া পারিপার্শ্বিক জগতকে বিস্মৃত হইয়া ছিলাম, অন্য কথা আমার স্মরণে ছিল না, দৃষ্টি ছিল না কোন দিকে। তাঁহার উক্তিতে আমার মনে পড়িল সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা। চাহিয়া দেখি—সম্মুখেই আমার, শবটা ঝুলিতেছে। দিব্য, পরিপাটী পোষাক পরিচ্ছদ পরা একটি যুবকের দেহ। লম্বা চওড়ায় আমারি মত, আমাদেরি বয়সী! কেন সে এ কার্য্য করিল! কি ভীষণ পরিণাম! ভাবিতেই শরীর শিহরিয়া উঠে!

ভদ্রলোকটি আমাকে চিন্তার অবসর না দিয়া বলিলেন "অমন ফ্যাল ফ্যাল করে হাবার মত চাচ্ছ কেন! এতে ভাববার গণবার কি আছে! এ দিক না হয় ওদিক, আবার জেলে যেতেই যদি ইচ্ছা থাকে স্পষ্ট বল—এখনি তার ব্যবস্থা করছি,—নয়—যা বলি সুবোধ বালকের মত শোন, সম্পূর্ণ ভাবে আমাকে নির্ভর করতে রাজি হও যদি তোমার সুখ স্বাধীনতা পেতে কোনই বাধা হবে না। বল এখন কি চাও,—জেল না সুখ স্বাধীনতা?"

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলাম "কি চাই তা ত প্রথম হতেই বলছি; চাই আপনার দয়া, জেলে আবার আমাকে আর না যেতে হয়,—আবার জেল!

তিনি বলিলেন "তবে যা বল্‌ব বিনা ওজরে করতে রাজি হলে! বেশ, বেশ, বুদ্ধিমান ছোকরা। তুমি ঠিক বুঝেছ—আমি তোমায় এমন কিছু করতে বলবো না—যেটা তোমার পক্ষে অসম্ভব বা কষ্টকর বরং তোমার সুখেরি হবে, ভাল ভাবে আমার কথা মত চলতে পার যদি, তুমি হবে,—ঠিক বলছি,—আমার ডান হাত,—সমস্ত বিষয়ে দেখ্‌ব আমি তোমাকে নিজের ছেলের মত!"

আমি বলিলাম "বলুন আমার কি করতে হবে,—আদেশ করুন,—আমি প্রস্তুত!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "তুমি পারবে,—তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি পারবে,—আমি লোক চিন্‌তে কাঁচা নই, সবার আগে জেলের পোষাকটার পরিবর্ত্তন দরকার,—সেটা আমার

ঘরের কাপড় চোপড়েও হ'কে পাবার কিন্তু শুধু তাতে আর চাঁ'সহ হচ্ছে না,—ঐ ছই ত ওই ঝুল্‌ছেন যিনি—তাঁর ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তোমার এই জেলের জাঙ্গায় তার উপায় করব!—হতভাগা, এমনি এখানে এসে প্রাণ দেয় নি—সব প্রেম ব্যাধি! আমার এখানে একটি মেয়ে আছে,—আমার বন্ধুর কন্যা,—বালিকার মা নেই,—বন্ধুর মরবার সময় তাকে আমার সঁপে দিয়ে গেছেন—সেই হতে আমি তাকে নিজের কন্যার মত পালন করে আস্‌ছি। এই হতভাগা ছিল ওদের প্রতিবেশী—মেয়েটার সঙ্গে ছোট বেলা হ'তে জানা শুনা,—সেই সূত্রে ওর এখানে যাতায়াত.—এদিকে মেয়েটাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল,—আমি ঐ আত্মীয়বান্ধবহীন হতভাগার হাতে মেয়ে দিতে বরাবর আপত্তি করে আস্‌ছি,—আজ আবার নিজে সেই প্রস্তাব করতে এসেছিল.—অনেক বুঝিয়ে বল্লেম—তোরা কি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী,—কত কাকুতি মিনতি করলে, তাতেও যখন ফল হলো না—রেগে মেগে আমার গাল মন্দ দিতেও ছাড়ল না! বিদায় করে দিলুম,—স্পষ্ট বলে দিলেম—আর যেন ও এ বাড়ীতে না আসে! দেখ্, তারিই এই ফল.—গলায় ফাঁস দিয়ে আমারি ঘরে ঝুলে বসে আছে! মরেও অপকার করতে ছাড়বে না,—কি মুস্কিল,—প্রেম আর কাকে বলে! মনের ইচ্ছা—মরি সেও ভাল—তবু লোকে আমার নিন্দা অপবাদ করুক,—বয়স্থা মেয়ে ঘরে—এ ঘরে ওর এমন ভাবে মৃত্যু এ কথা রাষ্ট্র হলে কি আর কারু কাছে মুখ দেখান যাবে? ভাগ্যিস্ মেয়েটাকে সময় মত অন্যত্র পাঠিয়েছিলেম—নৈলে ভাব ত এখন কি দশা হ'ত!"

দর্পণে প্রতিবিম্বের মত আমার সম্মুখে সমস্তই স্পষ্ট হইয়া উঠিল! তবে কি এ আমারি সেই সহৃদয় বন্ধু! কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যাঁর সরস বাক্য—উদাম—ঔদার্য্যে মন প্রাণ আমার প্রশংসায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁরই এই দশা! এতক্ষণ মৃতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সত্যই তিনি। অমন নিদারুণ মৃত্যু এখনও তাঁহার মুখের মাধুর্য্য সদাপ্রফুল্লভাব মলিন করিতে পারে নাই। প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল—অজ্ঞাতে যেন বলিয়া ফেলিলাম—"একি মৃত্যু তোমার—কে জান্‌ত এভাবে তোমার শেষ!"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তুমি ওকে চিন্‌তে নাকি?"

আমি আত্ম সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম, "চিন্‌ব আর কি ক'রে! জেল কয়েদীর কি বাহিরের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পথ আছে! লোকটার এ ভীষণ-পরিণাম

দেখে কত কথাই মনে হয়!"

তিনি বলিলেন "ঠিক! ঠিক! পাপ করে লোকে এমন কাজ করে!—আত্মহত্যার মত পাপ আর নাই,—মহাপাপী—পাপত আত্মহত্যার আর অন্য যন্ত্রণা পেলে না!"

একটু থামিয়া আমার হাত ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন "বুঝ্ছই ত ব্যাপারটা কি ভয়ানক—কি লজ্জা! দশের কাছে আমার যে নাম যশঃ—একথা প্রকাশ পেলে—তার কতখানি হানি হবে,—লোকের সুনাম গেলে আর থাকে কি,—সত্যিই তোমায় বল্‌ছি,—ছেলের মত আপনার জন ভেবে নিজের কথা আর গোপন করব না,—এ অপযশ হতে আমাকে তোমায় উদ্ধার করতে হবে,—শপথ কর,—এ কথা কোথাও প্রকাশ করবে না—আমিও প্রতিজ্ঞা করছি,—তুমি যে কয়েদী একথা আমা হতে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হবে না—তোমার সুখ সচ্ছন্দতার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করব,—এ দুর্ণাম হতে রক্ষা কর আমায়!"

মনে হইল, এই আর সেই কি এক ব্যক্তি,—ইহার মুখে এমন কাতর উক্তি শুনিবার আশা করি নাই। ভাবিলাম—মানীর মান এমনই অমূল্য বস্তু বটে। বলিলাম—"এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

তিনি তাড়াতাড়ি অন্য ঘর হইতে জামা কাপড় আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—চট্‌পট্‌ পরে নাও,—আর দেরী করা চল্‌বে না—অনেক কাজ, জেলের মরাটাকে জেলের পোষাক পরাতে হবে, ওকে তোমার নামে চালাতে হবে—জেলের কয়েদী এখানে এসে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে এটাতে অবিশ্বাস করবার মত কিছু হবে না,—যাকে ধরতে চারদিকে লোক ছুটেছে জেলায় জেলায় হুলিয়া হয়েছে অনুপায় হয়ে আত্মহত্যা করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়! এক সেনাক্ত করার হাঙ্গামা? তাতে গোল হবে না; তুমি আর ও একবয়েসী, লম্বায়ও প্রায় সমান সমান—আমি সব ঠিক করে নিতে পারব। আমি ডাক্তার ওর এ ভাবে মৃত্যু প্রমাণ করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। হবে ভাল—এক ঢিলে দুপাখী মারা যাবে, একবার তোমার মরা নাম বেরিয়ে গেলে আর পলাতক বলে তোমার কোন আপদ থাকবে না, আমিও দুর্ণাম হতে রক্ষা পাব। কি বল?"

বলিব আমার মাথা আর মুণ্ড। তখন তাহার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ ব্যতীত আমার অন্য উপায় ছিলনা। বন্ধুকে জেলের বেশ পরিচ্ছদ পরাইয়া বাহিরের একটা বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইয়া দিলাম। আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝাইবার নয়—বার বার মনে হইতেছিল—বন্ধু! প্রিয়তম সখা—জন্ম জন্মের পরম আত্মীয় ছিলে তুমি! এ বিপদের প্রথমেই সাহায্য করিয়াছ তুমি—হেয় কয়েদী বলে ঘৃণা কর নাই—কত যত্নে পাশে স্থান দিয়েছিলে—আর জীবনের পরপারে গিয়েও আমার মুক্তির পথ পরিষ্কার করে রেখেছ, জীবনে মরণে হে বন্ধু—কি দিয়া তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো! আত্মহত্যার অপরাধ যতই গুরুতর হ'ক,—ঔদার্য্যের মাহাত্ম্যে তুমি তা হতে মুক্ত হবে নিশ্চয়,—কি নিদারুণ দুঃখেই আজ তুমি প্রাণ দিয়াছ—মহাদুঃখহর শিব তোমায় শান্তি দিন—তাঁর নিকট এ দীনের,—এ কৃতজ্ঞের এই আন্তরিক প্রার্থনা।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

প্রাচীন বিদেশীয় সভ্যতায় নারীর স্থান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রোমক সভ্যতায় নারীর সামাজিক অবস্থা যে প্রকার ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই রোমক সভ্যতার প্রভাব ইউরোপ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। রোমক সভ্যতার বিশিষ্ট দান রোমের আইন ইউরোপের প্রায় সকল দেশেরই আইনের সংগঠন ও প্রনয়ণে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। অতএব ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে রোম-আইন-সম্মত নারীর স্বাধীনতার আদর্শও তৎপরবর্ত্তী কালের সভ্যতা ও সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু যদি সেই সময়ের ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হয় তবে দেখা যায় যে আমাদের অনুমান যথার্থ হয় নাই।

Teutonic জাতির প্রবল সমাজনীতির-সংঘর্ষে ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের প্রতিকূল প্রভাবে রোম সভ্যতার নারী স্বাধীনতার আদর্শ ভূমিসাৎ হইয়া গেল। ক্রয় বিক্রয়ের উপর Teutonic জাতির বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও এই দূষ্য প্রথা নারীর অবস্থার অবনতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহে তাহা হইলেও নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে এই প্রথারই কুফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। Teutonic জাতি যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া খ্যাত। সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও নারীজনোচিত কর্ত্তব্যগুলির প্রতি বিশ্রদ্ধা আসিয়াছিল এবং প্রেমের সাধনা এক তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম অবস্থায় নারীর অবস্থার উন্নতি সাধনের পক্ষে অনুকূল ছিল বটে কিন্তু যখন ইহা এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও দলবদ্ধ ধর্ম্মসমাজে পরিবর্ত্তিত হইল তখন ইহার সন্ন্যাসের আদর্শ ইহাকে ঘোর শত্রুরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিল এবং সেই সময়ে নারীকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখা হইত। এমন কি ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে নারী শয়তানের অংশ। Anselm এর মত স্থিরবুদ্ধি ও সুধী জন পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন যে "Femina fax est satanae."

প্রাচীন ফরাসী জাতির মধ্যে পুরুষের এক পত্নী গ্রহণ প্রচলিত থাকিলেও নারী কখনও স্বাধীন ছিল না। সে নিজের ইচ্ছানুসারে কখনও কোন জিনিষ ক্রয় বিক্রয় করিতে কিম্বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না—সকল বিষয়েই তাহাকে প্রভুর বা স্বামীর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হইত। স্বামী বিবাহের দিন তাহাকে পণ্যদ্রব্যরূপে মূল্য দিয়া ক্রয় করিত এবং বিবাহের পরের দিন স্ত্রী বিনিময়ে তাহাকে কিছু উপহার প্রদান করিত। ইহাই ছিল তাহাদের রীতি। ফরাসী আইনে একটী বিধানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—যে যদি কেহ স্বীয় অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অপর কোনও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করে তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইত এবং উক্ত কার্য্য জনিত অপরাধকে Offence against property পর্য্যায় ভুক্ত করা হইত। জার্ম্মান দেশেও স্বামী তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে পারিত এমন কি একাদশ শতাব্দীতেও স্ত্রী বিক্রয়ের কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যদিও সে সময়ে ইহা আইনানুমোদিত ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রথম অবস্থায় নারী ও পুরুষের সাম্যনীতির অনুকূল ছিল। কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্মসমাজে সন্ন্যাস-ব্রত প্রচলিত হইলে পর যখন ইহা Teutonic আচার ও প্রথার সঙ্গে সম্মিলিত হইল তখন নারীর অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কঠোর মত প্রচারিত হইয়াছিল। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে নারীর স্থান যে পুরুষের অনেক নিম্নে তাহা কতকগুলি নিয়ম ও বিধি দ্বারা সুস্পষ্ট করা হইয়াছিল। ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার জন্য পুরুষের এক নিয়ম ও নারীর অপর নিয়মের ব্যবস্থা হইয়াছিল এমন কি অনেক ধর্ম্মমন্দিরে নারীর প্রবেশের অধিকার মাত্রও ছিল না।

Donaldson তাহার "Woman" নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে "I may define man as a male human being and woman being.........what the early christians did was to strike the "male" out of the definition of man and human being out of the definition of woman." নারীর সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় আদি ধর্ম্ম-সমাজ যে এই প্রকার গর্হিত ও অপমানজনক ধারণা পোষণ করিত ইহা বড় বড় পাণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। Meyrick লিখিয়াছেন যে "We cannot but notice even in the greatest of the christian fathers a lamentably low estimate of man." অর্থাৎ নারীর সম্বন্ধে অত্যন্ত নিম্ন ধারণা এমন কি প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকের মধ্যেও দৃষ্ট হইত।

মহাত্মা St Augustine ও নারীকে সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। তাঁহার মতে বিবাহের স্বার্থকতা সংসাধিত হয় কেবলমাত্র অপত্যোৎপাদন দ্বারা। নারী ও পুরুষের সাহচর্য্য, সহানুভূতি ও প্রেমে যে উভয়েরই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পরিপোষক হইতে পারে এ ধারণা তখন সমাজে জাগরূক হয় নাই। খৃষ্টধর্ম্ম নারীর অবস্থার কতটুকু উন্নতিসাধন করিয়াছে তাহা অবধারন করিবার জন্য নারী গ্রন্থকার Lily Braun লিখিয়াছেন যে মহাপ্রাণ যীশু সমাজে নারী ও পুরুষের যৌনপবিত্রতা রক্ষার সমান উপযোগিতা সম্বন্ধে একটুমাত্র ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। যখন এক ব্যভিচারিনী যীশুর সমক্ষে বিচারের জন্য আনীত হইয়াছিল তিনি সমাগত পুরুষদিগকে বলিয়াছিলেন—"Let him who is without Sin amongst you cast the first stone." Lily Braun বলেন যে

খৃষ্টধর্ম্ম নারী ও পুরুষের সাম্যবাদের দিক হইতে শুধু এটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা বেশী আর সে কিছুই করে নাই। তিনি দুঃখ করিয়া আরও বলিয়াছেন—"Christianity which women accepted as a deliverance with so much enthusiasm and died for as martyrs, has not fulfilled their hope." অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মকে নারীজাতি তাহাদের মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল সত্য এবং অনেক নারী ইহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছে কিন্তু ইহা নারীর সকল আশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুময়ান দাশ গুপ্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

-:০:-

বিগত ২৬শে মাঘ, শুক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী যে কেবল কোচবিহারের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহা নহে, সে দিবসের স্মৃতি চির-জাগরূক থাকিবে কোচবিহারবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে। নারীর জীবনসর্ব্বস্ব পতিকে বিদেশে অকালে বিসর্জ্জন দিয়া সদ্য বিধবা যৌবনে যোগিনী মাতা মহারাণী,—সে দিন পিতৃহারা সুকুমার মহারাজা ও মহারাজকুমারী সহ, স্বামীর লীলাভূমি বেহারে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায়, মুক্তাত্মা মহারাজার পুণ্যস্মৃতিতে সর্ব্বজনকে যে তীব্র শোকে অভিভূত করিয়াছিল, প্রকৃতিপুঞ্জের, কর্ম্মচারীবৃন্দের অতিপ্রিয় নয়নানন্দকারী মহারাজের সুখ-স্মৃত দেহের পরিবর্ত্তে তাঁহার দেহাবশেষ ভস্মসম্ভার, সেই সঙ্গে আনীত হওয়ায় আশাহত প্রাণে শোকের যে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, তাহার বিলোপ সাধন করা কালের সাধ্য নাই। মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না—আমাদের মহারাজ এত সত্বর মহাপ্রস্থান করিয়াছেন! তিন মাসও অতীত হয় নাই, তিনি বিদেশে—বিলাতে গমন করেন; তাঁহার মধুর ব্যবহার, স্নেহ, অনুগ্রহ, কার্য্যকলাপ এখনও অধিবাসীবর্গের হৃদয়ে এমন জলন্ত ভাবে

জাগ্রত,—রাজভক্তের প্রাণে যে স্থানের যেটী, তেমনি ভাবে সেইটি সজ্জিত,—প্রিয়জনের গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রসে সেগুলি আজও আমোদিত, বিভূষিত,—সমস্তই সেই ভাবে বিদ্যমান, অন্তর্হিত কেবল তিনি। অসহ্য অকস্মাৎ এই তিরোধান! মুক্তের অদৃশ্য স্নেহকরস্পর্শে, অনুভূতির আবেশে হৃদয়মন বিভোর অথচ তিনি দূরে, অতিদূরে,—পরপারে! তাঁহারই এই দেহাবশেষ! তবে কি তিনি নাই,—স্মরণে আসতেই কি নিদারুণ শোকে হৃদয় শতধা করিয়া দেয়! এইরূপ ভগ্ন প্রাণে শত শত শোকার্ত্ত সেদিন ষ্টেশনে সমাগত হইয়াছিল। অগণিত জনসমাগম অথচ কাহারও মুখে কথাটি নাই। সকলেই কাতর প্রাণে ভস্মাধারবাহী স্পেশাল ট্রেণের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া, সকলেই মহারাজের শেষচিহ্ন দর্শনের জন্য উদ্গ্রীব! সে ভস্মাধার দর্শনে অনার্দ্র ছিল কম নয়নই,—উপস্থিত অনেক ইংরাজ, পরদেশী পর্য্যন্ত অশ্রু প্লাবনে গণ্ড অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—সমবেত জন সাধারণের তৎকালীন মন ভাব জমাট হইয়া এমনই মর্ম্মস্পর্শী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল! শোক-যাত্রার পুরভাগে রাজকীয় ব্যাণ্ডের ঐক্যতানিক বাদ্য রহিয়া রহিয়া শবানুগমনের হৃদয়বিদারী সুর নিক্কনে মনপ্রাণে বহিয়া আনিতেছিল শ্মশান-বৈরাগ্য—মহা ঔদাস্য! নব ভূপতি,—অতি সুকুমার শিশু আজ পিতৃহীন,—পিতৃব্যসহ নগ্নপদে পদব্রজে চলিয়াছেন,—পশ্চাতে তাঁহাদের পাট-হস্তী পৃষ্ঠে রাজোচিত আসনে মহারাজের ভস্মাধার! অসংখ্য জনসংঘ নীরবে ধীরে ধীরে তাহার অনুগমন করিতেছিল—সর্ব্বশেষে সংকীর্ত্তন,—শোক গাথায় হরিনাম মুখরিত করিয়া মহারাজার মুক্ত আত্মার কল্যাণ কামনায় হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা উৎসারিত হইতেছিল।

প্রশস্ত ময়দানে বৃহৎ পটমণ্ডপে রক্ষিত হইয়াছিল ভস্মাধার। কি আগ্রহে ভক্তিনত হৃদয়ে কোচবিহারবাসী দলে দলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রিয় মহারাজের শেষস্মৃতি ভস্মাবশেষ দর্শনে, তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে ব্যাকুল হইয়াছিল, মুক্তের সহিত সংবদ্ধ হইবার আশায়, তাঁহার আত্মার মঙ্গল উদ্দেশ্যে সর্ব্বক্ষণ হরিণাম কীর্ত্তনে ব্যগ্র হইয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন কেহ তাঁহার কাছছাড়া হইতে চাহিতে ছিল না,—ভস্মাধার ঘেরিয়া জাগিয়া কয় না করিয়া সকলে ভস্মাধার তাঁহার বারবার, পরিক্রমণ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই, প্রিয়ের বিরহ সকলকে এরূপই আকুল অভিভূত করিয়াছিল।

সেই দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে পুনঃ ভস্মাধার গঙ্গাপ্রবাহে সমর্পিত হইবার উদ্দেশ্যে কাশীতে প্রেরিত হয়। কাশীই এই রাজবংশের মহাশ্মশান,—ইঁহার দেহাবশেষও সেই মহাশ্মশানে পূর্ব্বপুরুষসহ মিলিত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জ্ঞাতিগণ স্কন্ধে ভস্মাধার রেলষ্টেশনে নীত হয়—তথায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল; গাড়ী ষ্টেশন ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নাম কীর্ত্তনের বিরাম ছিল না। সময় উপস্থিত,—রেলশকট মহারাজের শেষচিহ্ন বক্ষে লইয়া প্রস্থানোন্মুখ। মহারাণী যে ভস্ম—স্বামীর পার্থিব রজঃ—এ কয় দিন যাহা তিনি 'তাঁহার' বলিয়া গভীর আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাও বিলুপ্ত হইতে চলিল, তিনি স্বামীর সেই শেষচিহ্ন জন্মের শেষ দর্শন স্পর্শনের জন্য ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী তথায় থামান হইল,—দর্শকের মনে মহা অতৃপ্তি হাহাকার উত্থিত করিয়া শকট অন্তর্হিত হইল, মহারাণীর তৎকালের মনের অবস্থা কল্পনা করিয়া জনসঙ্ঘ কাতরকণ্ঠে বার বার হরিধ্বনি করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতে প্রয়াস পাইলেও নয়নের অশ্রু মিলাইল না—প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল। সে দৃশ্য কি হৃদিস্পর্শী!

* * *

২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী মহারাজের শ্রাদ্ধ—দানসাগর। রাজামহারাজার শ্রাদ্ধাদি যেরূপ সমারোহে সম্পন্ন হয় সেরূপ ভাবেই সমস্ত এ ক্ষেত্রেও সম্পন্ন হইয়াছে। হস্তী, অশ্ব, গো, রৌপ্যকলস, রৌপ্যাধার, মহামূল্য কৌষেয়বস্ত্র, শাল প্রভৃতি যথাশাস্ত্র উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহার সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। শিশু মহারাজা স্বয়ং এ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। (ইতিপূর্ব্বে এ সকল কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারাই সম্পন্ন করান হইত।) মহারাজের পিতৃব্য মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বক্ষণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে সস্নেহ বাহুবেষ্টন বদ্ধ করিয়াছিলেন। কার্য্য শেষ করিতে দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছিল। শিশু ক্লান্ত হইলেও প্রত্যেকটি দান উৎসর্গ যথাযথ সম্পন্ন করিতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন নাই। অমঙ্গলের আবরণেও মঙ্গল অটুট ভাবে রক্ষা করেন যিনি—সেই শিবসুন্দর, শিশু-মহারাজকে জীবনে এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ সহিষ্ণু করিয়া দীর্ঘায়ু দানে কোচবিহারকে পুনঃ রামরাজ্যে পরিণত করুন—এই প্রার্থনা।

শোকার্ত্তা মাতা মহারাণীর এই মনকষ্টের সময়ে মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনাস্বরূপ ইন্দোরাধিপতি হোলকারের ভগিনী শ্রীযুক্তা সীতা দেবী মহারাণীর সহিত কোচবিহারে আগমন করিয়া বিশেষ ভাবে কোচবিহারবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি অতি বুদ্ধিমতী বিদুষী, শাস্ত্রজ্ঞা; শতমুখে সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহার সাহচর্য্যে শোক সন্তপ্তা মহারাণী প্রাণে শান্তিধারা বর্ষিত হউক !

'যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।'

বহু বাক্ বিতণ্ডার পর বঙ্গনারীকে অবশেষে নির্ব্বাচন অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে তাহার ব্যবস্থা করা হইল,—তাঁহারা এখন সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন। এ ব্যবস্থায় সকলে সুখী বা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন বলা যায় না; নারীর অধিকার দান ব্যাপারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাক্ বিতণ্ডায় তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। সভ্যগণের মধ্যে অর্দ্ধেক ছিলেন সপক্ষে অর্দ্ধেক বিপক্ষে, সভাপতি কটন সাহেব—তাঁহার ভোট নারীর পক্ষে দিয়া তাঁহার জাতীয় গৌরবের সহিত নারীর সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বঙ্গের জন সংখ্যার অর্দ্ধাধিক নারী, তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিলে, তাঁহারা পদে পদে উপেক্ষিতা হইলে, সমাজের কখনই মঙ্গল নাই, দক্ষিণ হস্তের গৌরব রক্ষা করিতে বাম হস্তের শক্তি একবারে অস্বীকার করিলে সমাজ দেহ সম্পূর্ণ অচল না হইলেও ক্রমেই যে ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য হইবে—তাহা সকলেই জানেন—কিন্তু অনেক জানিয়াও বুঝিতে চান না—সেটা কেবল আপনাদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার খাতিরে। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী। অতি দুঃখের বিষয়, আইন কানুন করিয়া, বাহিরের প্রভাবে, চাপ দিয়া ইহাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া লইতে হয়, নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া আত্ম শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে ইহারা অপারগ। এইটি সমাজের প্রধান ব্যাধি। প্রতিপদেই চাই পরের সাহায্য ! আত্ম নির্ভরের ভাব যত দিন বঙ্গের উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততদিন এ সকল নির্ব্বাচন, অনির্ব্বাচন অধিকার স্বাধিকার প্রায় তুলাফল প্রসব করিবে ! প্রথমে মতামতি রিপণের আমলে যখন পুরুষ এই স্বায়ত্ব শাসনাধিকার লাভ করেন, তখন বঙ্গের যেরূপ উন্নতির আশায় সকলে

উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা তাহার কণিকা মাত্রও লাভ করিতে পারি নাই। 'বঙ্গে' উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব নাই, কিন্তু নির্ব্বাচন ব্যাপারে অসদুপায় উপস্থিত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী নানা প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, অভিলষিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই অনেক সৎকর্ম্মেই পরস্পরের সহায়তা সহানুভূতির অভাবে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে! বঙ্গের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যেই এই অবস্থা! মৌখিক উদারতার ত কথা হয় না—প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে কার্য্যক্ষেত্রে, তখন কেবল তুমুল বাকবিতণ্ডারই সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত—তাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গির নির্ব্বাচনের বিরোধী ইহাতে কি সূচিত হয়? হয় নারীর নির্ব্বাচন অধিকার দানের সময় আসে নাই নয়, শিক্ষিতগণেরও অনেক অনুদার। সমাজের যেখানে এ অবস্থা সেখানে বড় বেশী আশা করিতে সাহস হয় না। পুরুষের বারো আনা যেখানে অশিক্ষিত, উপেক্ষিত, নারীর চৌদ্দ আনা যেখানে আত্মজ্ঞান বঞ্চিত সে দেশে প্রথমে তাহাদের উন্নতির প্রকৃত ব্যবস্থা না হইলে দেশের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত!

এঅবস্থায় কতিপয় শিক্ষিতা নারীর হস্তে যদি শাসন সংরক্ষণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কোন অচিন্ত্য বিধানে প্রদত্ত হইত তাহা হইলেও দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত না,—আইন বলে প্রাণ জাগেনা—প্রাণ জাগ্রত না হইলে মনুষ্যত্বের অনুভূতি না হইলে, স্বাস্থ্যাদির জ্ঞান আপনার মধ্যে জাগ্রত না হইলে শক্তিপ্রয়োগে কোন সুফল লাভের আশা নাই। আইন অর্থেই পরের শক্তিপ্রয়োগ।

দেশের আত্মশক্তি জাগ্রত হউক। মাতৃশক্তি সর্ব্ব শক্তির মূলে, সন্তানের শিক্ষার আদি স্থান মাতা, সবল মাতা, তাঁহারা বুদ্ধি বিদ্যায় অনন্ত শক্তিতে অতুল প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হইলে—গৃহে গৃহে শক্তির সঞ্চারের ব্যবস্থা হইলে বঙ্গ স্বর্গে পরিণত হইবে।

মাতৃ জাতির অধিকার প্রসারে আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি আত্মহারা হই নাই—অনন্ত দায়িত্ব লইয়া যাঁহাদের জীবন—তাঁহাদের পক্ষে নির্ব্বাচন অধিকার বড় বেশী নয়,—সন্তানের জাতির রক্ষা—সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণে তাঁহাদের উপযুক্ত হইতে হইবে যে!

বঙ্গ ছারখার হইতে বসিয়াছে। যে অনুপাতে বঙ্গের মৃত্যু হার ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে,—এরূপ চলিলে বঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইবে—আর কত দিন! সে খোঁজ বাঙ্গলার কয়জন রাখেন? সরকারী স্বাস্থ্য বিবরণীতে প্রকাশ—১৯২১ সনে হাজারকরা জন্মহার ২৮ মৃত্যুহার ৩০·১ অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা ২টী বেশী। বুঝুন ব্যাপার! এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশু ১২২০৯ টি কোন কোন জিলায় হাজারটির মধ্যে সাত শত শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশের মৃত্যুর কারণ ধনুষ্টঙ্কার বা প্রেতে পাওয়া ব্যাধি! এই ব্যাধির মূল কারণই আমাদের অজ্ঞতা—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত কম যে অনেক স্থলেই এই পীড়াকে ব্যাধি না বলিয়া শিশুকে ভূতে পাওয়া মনে করা হয় ও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে বঙ্গে আশা—বালকবালিকা অকালে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়! সূতিকাগারের অতি কুব্যবস্থা,—অশিক্ষিতা গ্রাম্যধাত্রীর অজ্ঞতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব—নানা প্রকার কুসংস্কার শিশুর অকাল মরণ ঘটাইয়া বঙ্গকে জনহীন করিতে বসিয়াছে। এদিকে দৃষ্টি না দিয়া বাহ্যিক উন্নতির চেষ্টায় কি ফল,—উদার নৈতিকগণই বুঝুন—কেবল বক্তৃতা,—কথা কাটাকাটি! মাতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য অনন্ত অফুরন্ত স্নেহ নিত্য বিরাজিত,—নারীজাতি শিশুর মঙ্গলের জন্য স্বভাবে সদা উন্মুখ—যাহাতে তাঁহাদের শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, যাহাতে তাঁহারা সর্বপ্রকারে মাতৃত্ব গৌরবে উন্নত হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে হওয়া আবশ্যক,—নতুবা শ্মশানে আর সখের সিংহাসন প্রতিষ্ঠার ফল কি!

বিধাতার বিধানে যাহারা এক—তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টিতে ফল নাই। অধিকার সাধিকারে ফল পরে হইবে—এখন চাই সাহচর্য্য,—নতুবা মৃত্যু নিশ্চয়। বঙ্গের এ মৃত্যুর কারণ কেবল অশিক্ষিতা মাতাও নয় ধাত্রীও নয়—আর শত সহস্র হেতুতে এ মৃত্যু বরণ! যে দেশের লোকের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, পথ্য নাই,—জীবনে যাহারা মৃতবৎ,—অহরহ যাহারা রোগে ভোগে—ম্যালেরিয়া,—প্লেগ বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিত্যই অর্দ্ধাশন অনশন,—তাহাকে আর—রক্ষা করিবে কে! বাহিরের বাবুগিরী—কোঁচার বহর কমাইয়া নিজের দেশের বস্তুতে তুষ্ট হইতে না পারিলে—দেশের শিল্পী, দেশের অজ্ঞ কৃষককে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিয়া নিজের ও পরের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধান না হইলে মৃত্যু এ জাতির অনিবার্য্য।

জন্মঅভিশপ্তা।

(সাহিত্য-ভারতী শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী প্রণীত।)

আজকাল উপন্যাসের যেরূপ ছড়াছড়ি তাহার মধ্যে ভাবের বা শিক্ষার ছড়াছড়ি সেরূপ নাই। অলীক গল্প সমাহারকেই এখন আমরা সাদরে উপন্যাস বলিয়া বরণ করিয়া

নষ্ট। নীতিশিক্ষা বিশিষ্ট বিষয় সৃষ্টি হইতে হাস্যপরিহাসপূর্ণ নীতিবিহীন বিষয়গুলিই এখন সাধারণের প্রীতির সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। নীতিবিহীন গল্প বা উপন্যাসকে সৎসাহিত্য বলা যাইতে পারে না বা তাহার দ্বারা সাহিত্য সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। একদিকে পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখা সাহিত্যিকের যেমন প্রয়োজন অন্যদিকে তাহাদের মনোবৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন ও শিক্ষাদান বিষয়েও লেখক লেখিকাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা উচিৎ।

যে পুস্তক পাঠে পাঠকপাঠিকার মনোরঞ্জন ও শিক্ষালাভ হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত মূল্যবান।

শিক্ষালাভ প্রধানতঃ দুইদিক্ দিয়া হইয়া থাকে। এক হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া আর এক দুঃখ দারিদ্র্যাদির মধ্যদিয়া। এই উভয় পথের শেষোক্তটীতেই আশুফল লাভ হইয়া থাকে।

হাস্যপরিহাসের ভিতর দিয়া অভাব, অভিযোগ, সুখ, দুঃখের বিবরণ যতটা জ্ঞাত হওয়া ক্রন্দনের ভিতর দিয়া তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করা যায়। মানুষ যখন আঘাত পায় তখনই সে বুঝিতে পারে আঘাতের যন্ত্রণা কত তীব্র।

"জন্ম অভিশপ্তার" অশ্রুধারার মধ্য দিয়া আজ সেই শিক্ষার বিকাশ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গললনাগণের নির্য্যাতন চিত্র লেখিকা যেরূপ স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। আমার মনে হয় এই অশ্রুই "জন্ম অভিশপ্তা"র শ্রেষ্ঠ মূল্য।

পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার কাহিনী পরিস্ফুট হইয়াছে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পুরুষ প্রকৃতই আজ নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচারে অকুণ্ঠিত। কিন্তু সংযমের মূর্ত্তি, রমণী, আজও তার নারীত্ব তার ধর্ম্ম, তার উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া যায় নাই, লেখিকা জন্ম অভিশপ্তায় তাহা প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই ঘটনা—এই কাহিনী বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না। ভারত একদিকে যেমন নারীত্বের খনি অন্যদিকে তেমনি বহু পশুরও আবাস স্থল। পল্লীর কোলে পলে পলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত সহস্র রমণী পতির অন্যায় অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়াও পতি পূজায় পরাঙ্মুখ হন নাই ভারতে এ ঘটনার অভাব নাই। জন্ম অভিশপ্তায় তিনটী উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। একটী হীন পথাবলম্বী, নীচমনা পুরুষের; একটী সতী সাধ্বী পবিত্র হৃদয়া সরলা রমণীর আর একটী সরলা গুরুভক্তি পরায়ণা বালিকার। এই তিনটী চরিত্রের প্রথম চরিত্রটী ঘৃণাই এবং শেষোক্ত চরিত্রদ্বয় আদর্শ স্থানীয় ও পূজাই।

"একদিকে পাপ পথচারী পুরুষের নির্ম্মম অত্যাচার আর একদিকে পতিব্রতা রমণীর অপূর্ব্ব আত্ম সংযম, অটল আত্মনিষ্ঠা অপূর্ব্ব আত্মজ্ঞান—অতুলনীয় সারল্য। প্রকৃতই ভারতে আজ এমন দিন আসিয়াছে যেদিনে আমরা শক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি নারীর সম্মান ভুলিয়া গিয়াছি এবং তাহাদের উপর অন্যায় অত্যাচারে সঙ্কুচিত নই। গ্রন্থ কর্ত্রী "জন্ম অভিশপ্তা"র অশ্রুধারার মধ্য দিয়া আজ পুরুষকে পুরুষের ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর নারীকে? নারীকে তাহার উজ্জ্বল চিত্রের মাধুর্য্য, মূল্য, দেখাইয়া দিয়াছেন।

ভারতের শত সহস্র দুরবস্থাগ্রস্থ পরিবারের উৎপীড়ন কাহিনী আজ জন্ম অভিশপ্তার প্রত্যেক বিন্দু অশ্রুজলের মধ্যে প্রতিভাত। লেখিকা আজ এই উপন্যাসের অশ্রুধারার মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন—পুরুষ নারীর সারল্যমণ্ডিত পবিত্র জীবনকে কিরূপ বিপন্ন করিয়া তুলে।

আজ আমরা নারীর প্রতি এমনই অত্যাচার করিতেছি। এতদিন পরে লেখিকার জন্ম অভিশপ্তা পুরুষ সমাজকে অনুতপ্ত করিয়া যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে হইলে নারীর দুঃখে বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ও কেবল নারীর দুঃখ মোচনের চেষ্টাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়

জগদ্ধাত্রী দেবী স্বামীর কত অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। কোনদিন বিরক্তির ভাব তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। শত অত্যাচার শত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তিনি স্বামীকে কুপথ হইতে বিরত করিবার জন্য নীরব পন্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন। এইখানেই তাঁহার নারীত্ব এইখানেই তাঁহার পতিপ্রাণতা। আর নারীর সহস্র অনুরোধেও যখন পুরুষ তাহার ভ্রম, তাহার অন্যায় বুঝিতে চেষ্টা করেনা সেই খানেই তাহার পশুত্বের চিত্র ফুটিয়া উঠে।

যে কল্পনার আশ্রয় লইয়া লেখিকা মনুষ্য সমাজের নরপশুদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ও সফলকাম হইয়াছেন সেই কল্পনা কল্পনা বলিয়া আমার মনে হয়না। অনেক নির্য্যাতিতা রমণীর আত্ম-সংযম, নারীত্ব এখনও ভারতকে সতী সাবিত্রীর দেশ বলিয়া পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। লেখিকাকে তাঁহার জন্ম অভিশপ্তার মূল্যস্বরূপ এই হেয় হতভাগের এক ফোঁটা অশ্রুজল উপহার দিতেছি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী।

(নব পর্য্যায়)
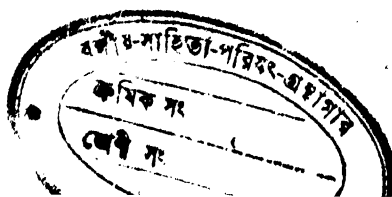
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল। { ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

মজ্জমান।

—:*:—

অলস দেহ শক্তি নাহি আর মুঠায়,
ভাসতে নারি আর যে ধরি ঘাস কুটায়।
এসো ভবপারের নেয়ে
এসো অভয় তরী বেয়ে
বাঁচাও বাঁচাও যাই যে ডুবে
লহরে শরীর লুটায়।

(২)

ব্যাকুলতায় ধরি হে যায় সেই ডোবে
মরণ হাসে, মরছি হে মনঃক্ষোভে।
শিথিল দেহ অলস প্রাণে
চেতাও চরণ পরশ দানে
পাষাণ যাতে মানুষ করে
কাঁটাতে কুসুম ফুটায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

গোঁড়ামি।

—:০:

ধর্ম্মে সমাজে ও রাজনীতিতে সকল দেশেই এক শ্রেণীর মানুষের আচরণে এমন একটা বিশেষ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যাহা অন্ধ সংস্কারের রূপান্তর মাত্র এবং যাহার সহিত যুক্তির কোনই সম্পর্ক নাই। এই মনোভাবটিকে আমরা গোঁড়ামি বলিয়া থাকি। মানব-মন সাধারণতঃ নানা সংস্কারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরা এবং এই প্রাচীর ভেদ করিয়া নূতন কোন ভাবের মনোমধ্যে প্রবেশ প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সংস্কার মাত্রই যে খারাপ তাহা বলিতেছি না। তবে যখন মানুষ তাহার বদ্ধমূল সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নবভাব গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়ে তখন যে তাহার জ্ঞান বা সত্যলাভের পথে একটা ঘোর অন্তরায় উপস্থিত হয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার প্রকৃত মানসিক ও নৈতিক উন্নতিও হইতে পারে না। তাই, এই সংস্কারমূলক গোঁড়ামির প্রাচীর একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলা সম্ভব না হইলেও তাহার মধ্যে ছিদ্র করিতে হইবে যাহাতে বাহিরের আলোক মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। মানুষের মনে যে যে কারণ হইতে মিথ্যা প্রশ্রয় লাভ করিতে পারে সেগুলিকে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ বেকন idols নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই idol গুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া না ফেলিলে যে সত্য দেবতার সন্ধান মিলিবে না এই কথা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জগতে যখনই কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া নূতন জ্ঞান, সত্য ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখনই তাঁহাকে মানুষের এই গোঁড়ামির সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং যতদিন না তিনি মানবমনের পুঞ্জীভূত অন্ধ-সংস্কারগুলি দূর করিতে পারিয়াছেন ততদিন প্রায়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর হাতে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইতে হইয়াছে। শিক্ষিত পাঠকের নিকট উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইউরোপে চিরকাল নূতন জ্ঞান ও ধর্ম্মকে নির্যাতনের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া মানুষের চিত্তরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সেখানে জ্ঞান সম্বন্ধে গোঁড়ামির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে। এখন আর কোন জ্যোতির্ব্বেত্তাকে শয়তানের সহচর বলিয়া উৎপীড়িত হইতে হয় না, কিংবা

কোন প্যাসিফিস্টকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া জ্ঞানপ্রচারের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের গোঁড়ামি কতকটা শিথিল হইলেও এখনও বিলক্ষণ প্রবল রহিয়াছে। জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিকল্প টল্‌ষ্টয় খ্রীষ্টধর্ম্মের সমস্ত অনুশাসনগুলি dogmas সম্পূর্ণরূপে মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এই মত তিনি স্বীয় রচনাবলীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে Excommunicate করা হইয়াছিল, এবং মৃত্যুর পর তাঁহার পবিত্র দেহ গীর্জ্জাপ্রাঙ্গনে সমাহিত হইবার অধিকার পায় নাই। এতদিন পরে রুষিয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট এই ঘোর অন্যায়ের প্রতিবিধান করিয়াছে। তাঁহার দেহ উত্তোলিত করিয়া মহাসম্মানে চার্চের মধ্যে সমাহিত করা হইয়াছে। ফ্রান্সেও এই ব্যাপার দেখি। সেখানে আনাতোল ফ্রাঁন্স আজ ভল্‌টেয়ারের ন্যায় নির্ভীকভাবে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার Revolt of Angels প্রভৃতি পুস্তক যিনি পড়িয়াছেন তিনিই ইহা অবগত আছেন। তাঁহার এই অপরাধের জন্য ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তিনিও Excommunicated হইয়াছেন, এবং তাঁহার পুস্তকগুলি পাপ ও অধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া প্রকাশ্যে পোড়ানো হইয়াছে।

আমাদের দেশে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বড় বেশী উৎপীড়িত হয় নাই। কিন্তু এখানে আর এক ক্ষেত্রে—সমাজে—অতিরিক্ত গোঁড়ামি প্রকাশ পাইয়াছে; এবং তাহার ফলে আমাদের জাতীয় উন্নতি বিশেষরূপে ব্যাহত হইয়াছে। কোন্ এক আদিম যুগে গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে জাতিভেদমূলক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'বর্ণ' শব্দ হইতেই বুঝিতে পারা যায় তখন জাতিতে জাতিতে প্রকৃত পার্থক্য খুব বেশী ছিল। সুতরাং তখন জাতিভেদ এখনকার মত একটা অর্থহীন ভেদনীতি মাত্র ছিল না। তথাপি বশিষ্ট বিশ্বামিত্রের কলহে এবং পরশুরামের ক্ষত্রিয় দ্বেষে পরস্পরের মধ্যে একটা বিলক্ষণ বিরোধের ভাব সূচিত হয়। তখনকার জাতিভেদ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা আরও দেখিতে পাই যে অসবর্ণ বিবাহ সমাজে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এরূপ বিবাহ নিন্দিত হইত না, এবং অসবর্ণ পিতামাতার সন্তান পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইত। ক্ষত্রিয় শান্তনু ও যযাতি যথাক্রমে ধীবরকন্যা সত্যবতী ও ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণ জরৎকারু অনার্য্য বাসুকীর ভগ্নীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজকন্যাদের স্বয়ম্বর সভায় জাতিভেদ ছিল না। দ্রৌপদীর

স্বয়ম্বরে পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। সীতার স্বয়ম্বরে রাক্ষসরাজ রাবণ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই কথাগুলি আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ করিবার সময় অসিয়াছে। আধুনিক হিন্দুসমাজে একদিকে যেমন জাতিতে জাতিতে গুণকর্ম্মগত পার্থক্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অপরদিকে তেমনই আবার এই মিথ্যা পার্থক্যকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া বিবাহাদিতে তাহা চিরস্থায়ী করিবার একটা বিপুল চেষ্টা হিন্দুর জাতিতে বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাঃ গৌর অন্তর্জ্জাতিক বিবাহ বিষয়ক যে আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে যে কত প্রতিবাদসভা হইতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই। এই সকল সনাতন পন্থী হিন্দু ধুরন্ধরগণ মনে করেন যে জাতিভেদ নামক সুপ্রথাটির গায়ে যদি একটুও আঁচড় লাগে তাহা হইলে ধর্ম্ম ও সমাজ রসাতলে যাইবে। অন্ধসংস্কারের দাস জগতে আর এমন কোথাও আছে কি? আমরা মুখে বলি যে আমরা শাস্ত্র মানিয়া চলি, এবং যখনই কোন সংস্কারের কথা উঠে, তখনই শাস্ত্রের প্রমাণ লইয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিই বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা মানি একটিমাত্র শক্তিকে, তাহা হইতেছে লোকাচার। এই লোকাচারের সঙ্গে যুক্তি খাটে না, তর্ক চলে না। ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যকে এই লোকাচার পদদলিত করিতেছে, সনাতন ধ্বজাধারীগণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। দেশের প্রকৃত মঙ্গল কিসে সেদিকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই, চারিদিকে যে কদাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা নাই, আছে কেবল অভ্রভেদী গোঁড়ামির প্রাচীর তুলিয়া সকল প্রকার নূতন ভাবের বন্যা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস।

হিন্দুর গোঁড়ামি খুব বেশী উৎকট ভাবে প্রকাশ পায় তাহার ছুৎমার্গ নামক সনাতন মার্গের বিধিনিষেধ গুলিতে। স্বামী বিবেকানন্দ বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম এখন আর বেদে নাই, বেদান্তে নাই উপনিষদে নাই, গীতায় নাই, আছে শুধু তাহার ভাতের হাঁড়িতে। পানভোজনে পদে পদে জাতি ও ধর্ম্মনাশের ভয়ে যাহারা নিরন্তর নিম্নজাতি ও বিধর্ম্মীর স্পর্শ এড়াইয়া চলিবার জন্য ব্যস্ত তাহাদের মন কত অনুদার, তাহাদের প্রীতির গণ্ডী কত সঙ্কীর্ণ তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান কি ভয়ানক অসত্যে প্রতিষ্ঠিত তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারে। তথাকথিত উচ্চজাতিগণের মধ্যের সামাজিক বা ব্যক্তিগত ক্রিয়া কলাপে এই সাধারণ

নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিবেন না, তা' সে দু'জনের মধ্যে যতই কেন বন্ধুত্ব থাকুক না এবং কায়স্থটি যতই কেন আদর্শ পুরুষ হউন না। কিন্তু এক অতি কদাচারী, ঘোর দুশ্চরিত্র পৈতাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ যদি রাঁধিয়া দেয় তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণেরই সে অন্ন আহার করিতে আপত্তি নাই। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্য বলিয়া যে সকল জাতি সমাজে কোণ ঠেসা হইয়া রহিয়াছে তাহাদের কথা ভাবিলেও আমাদের এই সুপবিত্র, সনাতন হিন্দুধর্ম্মটির মাহাত্ম্য বেশ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের বক্ষ হইতে দূর করিতে না পারিলে আমাদের স্বরাজ লাভের আশা সুদূরপরাহত! মহাত্মাজীর এই শিক্ষা স্বত্বেও কি একজনও গোঁড়া হিন্দু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন?

স্ত্রীজাতির প্রতি আচরণেও আমরা যে এই চিরাগত অন্ধসংস্কারেরই দাসত্ব করিয়া আসিতেছি তাহা আর চোখে আঙুল দিয়া কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। নারীজাতি নাকি এতই অসার, তাহাদের চরিত্র নাকি এতই দুর্ব্বল যে ঘরের মধ্যে তাহাদিগকে বন্ধ করিয়া না রাখিলে তাহারা ভ্রষ্টা হইয়া যাইবে। এই অর্গলবদ্ধ সতীত্বের মূল্য যে কতটুকু তাহা এই সনাতনপন্থী হিন্দুরাই বলিতে পারেন। আবার তাহারাই এই হিন্দু নারীকে জগতের মধ্যে আদর্শস্থানীয়া বলিয়া দেবী নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্যের এই চমৎকার সামঞ্জস্যের দিকে যদি কেহ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইলে তখনই তাঁহারা যুক্তিটা একটু বদ্‌লাইয়া লইয়া বলিয়া থাকেন, 'হিন্দুনারী ত দেবী বটেই। তাঁদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে? তবে কি না, পুরুষগুলা বড় বদ্‌, তাদের কলুষ দৃষ্টির অন্তরালে নারীদের রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য।' আসল কথা যে তাহা নহে, হিন্দু সমাজের মনের ভাব যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা নারীর প্রতি প্রযুক্ত নির্দ্দয় বিধিনিষেধ গুলি হইতেই প্রমাণিত হয়। নির্জ্জলা একাদশী ও আমিষাহার পরিত্যাগ না করিলে বিধবা নাকি তাহার প্রবল প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে পারিবে না। তথাপি, তাহার পুনরায় বিবাহ দিবার কথা যদি কেহ বলে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। তখনই বিধবাকে আবার দেবীর পাদপীঠে উঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইতে থাকে, 'এই দেখ আমাদের ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী, তপঃক্লিষ্টা, মহিমময়ী নারী! তোমরা কিনা এই দেবীকে আবার

ভোগলালসার পথে টানিয়া আনিতে চাও! ধিক্ তোমাদের।' কিন্তু এই ধিক্কার যে প্রকৃত পক্ষে তাহাদেরই প্রাপ্য তাহা যদি গোঁড়ারা উপলব্ধি করিতে পারিত তাহা হইলে দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইত।

হিন্দু জাতি ধ্বংসের পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। প্রতি দশবৎসরে লোক গণনায় ইহার সত্যতা অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এই অধঃপতনের গতিরোধ হইতে পারে শুধু আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের ঐকান্তিক চেষ্টায়। কারণ তাহা হইলে আমাদের সামাজিক অন্যায়, অসত্য ও অধর্ম্মগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইয়া উঠিব, যুক্তিহীন বিচার আর গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিবে না, অনিষ্টকর কুপ্রথাগুলির অচিরে উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর হইবে, এবং যাহা সাময়িক বা যুগবিশেষোপযোগী তাহাকে সনাতন আখ্যা দিয়া, যাহা চিরন্তন ও দেশকাল নিরপেক্ষ তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া হিন্দুত্বের অবমাননা করিব না। ভগবান যেন আমাদের এই মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের শক্তি দান করেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মতি-মস্‌জিদের দেউরীর পার্শ্ব।

জোহেরা ও লালকুমারী।

লালকুমারী। এই খানেইত ঠিক, জোহেরা।

জোহেরা। এই খানেই বিবি। এই যে এই কোণায় দাগ দিয়ে রেখে সাম্‌নে ঐখানে রুমাল ফেলে নিশানা রেখেছি।

লালকুমারী। কিন্তু শাহজাদা আস্‌বেন ত ঠিক।

জোহেরা। আসবেন, আসবেন বিবি, সবুর করো। এত অধীর হলে কেন?

লালকুমারী। এত অধীর হলুম কেন? জোহেরা নিরাশার বেদনা এসে মাঝে মাঝে হৃদয়টাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে যায়, বুক ফেটে কান্নার সুর বেরিয়ে পড়ে। গান গাইতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ি প্রাণের সাড়া পাই না। নৃত্যের মাঝে পা আর চলতে চায় না— নুপুরের ঝঙ্কার হঠাৎ থেমে যায়—মনে হয় বৃথাই এ গান,—বৃথাই এ নৃত্য; এরূপ মিথ্যা, এ যৌবন মিথ্যা, যে রূপের পায় বাদশা'র কোহিনূর শোভিত পা লুটিয়ে পড়ে না, যে যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গে একটা বাদশা' তলিয়ে যায় না, সে রূপ বা যৌবনের কদর কি? কই এখনও ত এলেন না, তোরা কি আমায় নিয়ে সকলে খেলা করচিস, জোহেরা।

(হঠাৎ) ঐ যে জোহেরা। এই কি শাহজাদা জাহান্দার! এত রূপ! এত কান্তি।

জোহেরা। (দেখিবার অভিনয় করে) হাঁ, হাঁ বিবি ঠিক হ'য়ে দাঁড়াও। একটুখানি সাম্‌নে ঝুঁকে ঘাড়টা বেঁকিয়ে এইখানে দাঁড়াও—যেন চোখে চোখে দেখা হয়।

(জোহেরা ও লালকুমারীর প্রস্থান।)

জাহান্দার। একি স্বপ্ন, না মায়া! কি দেখলাম—কে এই হুরী? শরতের নির্ভাজ নীল আকাশে লঘু, স্বচ্ছ, শুভ্র মেঘখণ্ডের মত তড়িত পদে দিগন্তরালে এক নিমেষেই উধাও হ'য়ে গেল—বসন্তের বাতাসের মত আমার সমস্ত প্রাণ আবেশে ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

এত রূপ কখনও ত আমার চোখে পড়ে নাই; এ যে প্রভাতের অরুণাচলে উষার মত সুন্দর—প্রশান্তসাগর বক্ষে জোছনা বিকাশের মত দীপ্ত; ফাল্গুনের কুঙ্কুম-রাগ-রঞ্জিত পরিপূর্ণ ধরার মত আপনাতে আপনি পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত।

পিতার কাছে দিল্লির সিংহাসনকে তুচ্ছ বলেছি—কৈ এ রমণীকে আর তুচ্ছ বলতে পারছি না। রূপে কি এতই নেশা... ....তাইত......মসজিদে এসেছি নমাজ পড়তে, একেবারে ওকথা ভুলে গেছি। ছিঃ, জাহান্দার এক ডুবে দশহাত জলের তলে নেমে পড়েছে?

(জাহান্দারের প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপণ)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—নাসিরুদ্দিনের দরগা। কাল—অপরাহ্ন।

ফকীর নসিরুদ্দিন উপবিষ্ট।

লালকুমারী ও জোহেরা।

ফকীর নসিরুদ্দিন। মা, তোমার মঙ্গল হোক্, সকল কামনা পূর্ণ হোক্।

লালকুমারী। (চমকিত হ'য়ে) আমার সকল কামনাই কি পূর্ণ হবে ফকীরসাহেব?

ফকীর। খোদার কৃপায় তোমার সকল অভিলাষ, সকল বাসনা সার্থক হবে। মা দিল্লিশ্বরী হওয়াও যদি তোমার কামনা হয় তবে তুমি তাই হবে। আমার কথা মিথ্যা হবার নয়।

লালকুমারী। একি শুনলুম ফকীর সাহেব, আপনার কথা মিথ্যা হবার নয় তবুও কেমন যেন একটা আশঙ্কা, কেমন একটা ভয় হচ্ছে, যে কথা আজ আমি শুনলেম্ এ যেন জাগরণে শুনিনি—কে যেন স্বপ্নের মাঝে বীণার তারে ঘা দিয়ে মিথ্যা ঝঙ্কারের সৃষ্টি করেছে।

ফকীর। মা, শান্ত হও, মন স্থির কর।

(জাহান্দারের প্রবেশ)

কে, শাহজাদা জাহান্দার?

জহান্দার। হাঁ—আচ্ছা বলুন দেখি, ধর্ম্ম বড় না সাম্রাজ্য বড়। একদিকে—ধর্ম্ম অপর দিকে এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য—যদি এ দুটোর ভেতর কোন একটীর মঙ্গল বেছে নিতে হয় তবে কোন্‌টাকে নিতে হবে খাঁ সাহেব?

নসিরুদ্দিন। এ প্রশ্নের মীমাংসা বড়ই কঠিন—কোন পথ শ্রেয় তা নির্দ্ধারণ করা বড়ই শক্ত।

জাহান্দার। পিতা মৃত্যুকালে আজীমকেই সিংহাসন দিয়ে যেতে চান, এতে আমার কোনই ক্ষোভ নেই, কিন্তু একটা চিন্তা। আজীমের কাছে মুসলমান আর কাফেরে কোন তফাৎ নাই—সে সিংহাসনে বস্‌লে পর মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গল হলেও হতে পারে বটে কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের ক্ষতি যথেষ্টই হবে।

ফকীর। শাহজাদা! তুমি ভুল বুঝেছ সকল ধর্ম্মেরই মূলের কথা এক। তোমার নিজের ধর্ম্মকেই ভালবাসলে অন্যের ধর্ম্মটাকে যে ঘৃণা কর্ত্তে হবে এর কোন কারণই নেই; আর তাতে কোরে নিজের ধর্ম্মটার ত কোন গৌরবই বাড়বে না, বরং ধর্ম্মের চিরন্তন সত্য-টাকেই অবমাননা করা হবে। সমদর্শী হতে পারলে সাম্রাজ্যের মঙ্গল, ধর্ম্মের গৌরব দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

জাহান্দার। (একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া) শীঘ্রই দিল্লী ছেড়ে চলে যাব। কোথায় যাব এখনও কিছু ঠিক্ করিনি। খোদার এই বিস্তৃত আকাশের তলে কত জায়গা পড়ে আছে, আমার কি কোথাও একটু স্থান হবে না, ফকীর সাহেব!

ফকীর। জাহান্দার, খোদা সকলকেই কৃপা ক'রে থাকেন। বোধহয় তুমি একটু স্থির হতে পেরেছ, মা। এঁকে চেন, মা? ইনি শাহজাদা জাহান্দার।

লাল্‌কুমারী। হাঁ, চিনি।

ফকীর। মা উচ্চাশা উন্নতির মূল হলেও তাতে প্রাণে শান্তি আসে না। শাহজাদা জাহান্দার, যদি সম্রাট হবার জন্য লালায়িত হত তবে আজ তাঁর হৃদয়ে কি বিপ্লবই বেধে যেত প্রাণে কি তুমুল ঝড়ই উঠ্‌ত। দেখ কি শান্তিতে আজ তাঁর প্রাণ পূর্ণ। সন্ধ্যা হয়ে এল ঐ দিনের আলো সূর্য্যাস্তের লোহিতরাগ ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে কি মধুর সন্ধ্যা, জগতের প্রাণে শান্তি ও মাধুর্য্য শতধারে ঢেলে দিক্। আমি মসজিদে যাই।

(ফকীর সাহেবের প্রস্থান)

জাহান্দার। তুমি কি দিল্লীর সেই প্রসিদ্ধ বাইজী লাল্‌কুমারী যার সঙ্গীতে দিল্লী মুখরিত, যার রূপের আলোতে নগর আলোকিত?

লাল্‌কুমারী। কেন মিথ্যা প্রশংসায় লজ্জা দিচ্ছেন শাহজাদা?

জাহান্দার। এ মিথ্যা প্রশংসা নয় লাল্‌কুমারী, এ তোমার যথার্থ পাওনা, আজ তোমায় দেখে বুঝেছি, কেন রূপে এত নেশা, কেন মানুষ এর জন্য পাগল হয়ে ছুটোছুটী করে বেড়ায়?

লাল্‌কুমারী। আপনি কেন দিল্লী ত্যাগ করে যাবেন?

জাহান্দার! সে কি তুমি বুঝবে? আমার সব বাঁধন একেবারে ছিঁড়ে গেছে—সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে চলেছ—আমায় তুমি বুঝবে না।

লালকুমারী। শাহজাদা, বাইরে হতে সকল জীবনই সুখের বলে মনে হয়, মাঠের ভেতর সবুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা-গাছগুলি দূর হতে চোখে পড়ে না। সত্যি, বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে চলেছি, শাহজাদা—কিন্তু তৃষ্ণায় গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে জলটুকুও পাইনি। শাহজাদা, শুধু আপনি বলবেন না আমার কিসের দুঃখ। কতদিন বাতায়ন পথে যেন কার প্রতিক্ষায় কাটিয়েছি—কতনিশি ফুলশয্যা আমার জাগরণে কণ্টক শয্যা হয়েছে—তারপর—একদিন উজল প্রভাতে অতিথি আমার আসল হৃদয় দুয়ারে আঘাত করে সুপ্তির জড়িমা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁরি জন্যে পাতা আসনখানি জুড়ে বসল। কে সে অতিথি আজ আমায় আর জিজ্ঞাসা করবেন না। শাহজাদা, দিল্লী ছেড়ে যাবার আগে এ দাসীর কুটীরে একবার দেখা দেবেন।

জাহান্দার। বেশ, তাই হবে লালকুমারী।

লালকুমারী। এ দয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

(জাহান্দারের প্রস্থান)

(জোহেরার প্রবেশ)

জোহেরা। কেমন, তোর আশা ত মিটল! এখন আমায় কি পুরস্কার দিবি বল্।

লালকুমারী। আজ তুই যা' চাইবি তাই তোকে দেব।

জোহেরা। আমি আর কিছু চাইনে—চিরকাল মনে রাখিস্ তবেই হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ, কাল—রাত্রি।

জুলফিকার ও হামিদের উভয়ের উভয় দিক হইতে প্রবেশ।

হামিদ। (প্রবেশ করিয়া) বন্দেগী জনাবালী!

জুলফিকার। কি, হামিদ! খবর কি?

হামিদ। খবর আর নূতন কিছু নেই—এদিকে কাজ ত প্রায় হাসিল।

জুলফিকার। সে কি ?

হামিদ। হাঁ, কাজ একরকম হাসিল, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—এখন শুধু তীরে বসে ঢেউ গোণা—তবে জনাব! আমার পাওনাটা—ঐ যে যা বলেছিলেন (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) তা ভোলেন নি ত ?

জুলফিকার। না হামিদ—ভুলি নি—জুলফিকার যা প্রতিজ্ঞা করে তা জীবনে কখনও ভোলে না। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির এখনও ঢের দেরী, এ কেবল জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক। যে দিন এ অভিনয় শেষ হয়ে যাবে (একটু কাছে আসিয়া নীম্নস্বরে) যে দিন শাহজাদা জাহান্দার দিল্লীর বাদশা হবেন...

হামিদ। (নিম্ন স্বরে) নামে বাদশা হবেন কিন্তু কার্য্যতঃ হবেন আপনি।

জুলফিকার। সে দিন বুঝবে, হামিদ্! তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা' পূরণ করব এক সুবার সুবাদার তুমি নিশ্চয়ই হবে।

হামিদ। কেয়াবাৎ, আর চাই কি ?—আচ্ছা খাঁ সাহেব! নাটকের প্রথম অঙ্ক হতে শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই কি এক শৃঙ্খলের মত পরস্পর সুসমঞ্জস ভাবে গ্রথিত হয় ?

জুলফিকার। হাঁ ঠিক তাই।

হামিদ। তবে আর চিন্তা কি যদি প্রথম অঙ্কেই হালটা শক্ত করে ধরে তার গতি যথাযথ নির্দ্দেশ করতে পারা যায় তবে—

জুলফিকার। হাঁ বুঝেছি, তুমি একটু ভুল করলে—একই প্রারম্ভের পরিণতি বিভিন্ন হ'তে পারে; সেই বিভিন্ন পরিণতি বিচিত্র অভিনব পথে লক্ষ্যাবিত্ত হয়। হামিদ! এ জীবন-নাট্যের-গ্রন্থকার তুমি, তুমি এ'কে নূতন ঘটনার সৃষ্টি করে' যে ভাবে নিয়ে যাবে এ ঠিক সে ভাবেই শেষ হবে।

হামিদ। আমি খাঁ সাহেব! না আপনি ?

জুলফিকার। আমিও আছি তবে তোমার সাহায্য ভিন্ন......

হামিদ। আপনার কোনও চিন্তা নাই জনাবালী—সে বাইজী যেমন রূপবতী তেমনই চতুর—তাতে আবার পূর্ব্ব হতেই সে উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তিনী।

জুলফিকার। হাঁ তার স্বার্থবুদ্ধিই এই অভীষ্ট সাধনের সহায় হবে—(একটু চিন্তিত ভাবে)—কিন্তু......

হামিদ। কিন্তু, কি নবাব!

জুলফিকার। প্রথম দিনের পরিচয়েই বুঝেছি সে বাইজী কত বড় উচ্চাভিলাষিনী বুদ্ধিমতী।

হামিদ। সেও আমাদের পক্ষে সুবিধারই কথা তাতে আবার কিন্তু কেন?

জুলফিকার। আপাততঃ তাই, কিন্তু ভবিষ্যতে কি, জানি না—যদি তার উচ্চাভিলাষ একটা সম্রাটকে পদানত করেই ক্ষান্ত না হয়—যদি সে সাম্রাজ্ঞীর বিলাসিতায় তুষ্ট না হয়ে—নুরজাহানের মত—সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে।

হামিদ। অসম্ভব সামান্য একটা নর্তকী, শুধু বসনভূষণেও বিলাস সম্ভোগের যার তৃপ্তি.....

জুলফিকার। তুমি তাকে বোঝনি, হামিদ!—যা হ'ক পরের ব্যবস্থা পরে হবে—এবার তোমায় যুদ্ধে যেতে হতে পারে।

হামিদ। (একটু চমকিত ভাবে) যুদ্ধে—?

জুলফিকার। এমন চমকে উঠ্‌লে যে?

হামিদ। এত বড় সুসংবাদটা আপনি হঠাৎ বলে ফেল্লেন কিনা।

জুলফিকার। (ঈষৎ হেসে) সুসংবাদ না দুঃসংবাদ, হামিদ!

হামিদ। তা যাই হ'ক কথাটা শুনেই মনে হল যেন একখানা খোলা তলোয়ার আমার চোখের সামনে ঘুরে গেল। কোথায় যেতে হবে?

জুলফিকার। বাংলার দিকে—শাহজাদা আজিম দশ সহস্র বাঙ্গালী সৈন্য নিয়ে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তাকে বাধা দিতে হবে।

হামিদ। দশ হাজার বাঙ্গালী সৈন্য—পুরুষ সৈন্য নিশ্চয়।

জুলফিকার। সে আবার কি হামিদ!—অবগুণ্ঠনবতী, অন্তঃপুরিমতা বঙ্গনারীর সঙ্গে বোধ হয় তোমার কোনও পরিচয় নেই।

হামিদ। খুব আছে জনাবলী—আছে বলেই ত শাহজাদা আজীমকে দোষ দিচ্ছি—যদি দশহাজার বাঙ্গালী সৈন্য না নিয়ে এসে তিনি একশতজন বাঙ্গালী রমণীকে নিয়ে আসতেন তবে বিপক্ষ মোগল সৈন্যদের মধ্যে এক মহামরক উপস্থিত হত—সেই একশত নারীর দু'শত নয়ন হতে মুহুর্মুহু যে বিদ্যুৎবর্ষণ হত তা' অনলস্রাবী সহস্রাধিক কামানের চাইতেও দুর্দ্ধার হয়ে উঠত, শাণিত কুঠারের সামনে তরুণ গাছগুলির মত মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে একেবারে ধারাশায়ী হ'ত।

জুলফিকার। বাংলাকে যখন তোমার এত ভয় তখন ঐ বাংলাতেই তোমাকে সুবাদার হতে হবে।

হামিদ। বাঃ, আমিও তাই চাই জনাব, প্রতিদিনে তবে সহস্রবার করে মরব আর সহস্রবার বাঁচব কি সুন্দর জীবন—প্রতিদিনই যেন একটা নূতন কবিতা।—আচ্ছা, যুদ্ধে যাওয়ার কথাটাই বল্লেন যুদ্ধ করতেও কি হবে—

জুলফিকার। হাঁ, নিশ্চয় :—

হামিদ। তবে একটা বড় রকমের ক্ষোভ থেকে যাবে—যদি যুদ্ধ করতেই হয় তবে ঐ কাপুরুষগুলোর সঙ্গে না করে বীর রাজপুতের সঙ্গে করলেই ভাল হ'ত, খরচ করে যে বিদ্যাটা শেখা হয়েছে তার ব্যবহার কিনা ঐ কাপুরুষগুলোকে কেটে করতে হবে।

জুলফিকার। হামিদ! বুদ্ধি থাকলে তলোয়ার একটীবার না ঘুরিয়েও যুদ্ধ জয় করা যায়—।

হামিদ। বেশ সে বুদ্ধিটাই শিখিয়ে দিন না কেন? যারা বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই আঁৎকে উঠবে তাদের কাছে বীরত্ব দেখান আর উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে দেওয়া একই কথা।

জুলফিকার। গিয়ে রুস্তম খাঁকে হাতে করতে চেষ্টা করবে। প্রত্যেক মানুষেরই একটা মূল্য আছে—সে মূল্যটা দিতে পারলেই তাকে কেনা যায়—বুঝলে

হামিদ। হাঁ বুঝেছি, আর বলতে হবে না—এ ছোট বিদ্যাই আপনার কাছ থেকে শেখা তার মধ্যে প্রথমটা তলোয়ার ঘোরানো আর দ্বিতীয়টা এই বহুমূল্য রণকৌশল—তলোয়ারে খরচে পড়ে গেছে বটে মগজে ত পড়ে—নি।

(জাহান্দার ও জাহানের প্রবেশ)

জুলফিকার। এই যে বন্দণী শাহজাদা

জাহান্দার। সেনাপতি নগরে ঘোষণা করে দিন জাহান দিল্লীর সম্রাট! নাগরিকেরা আজ রাত্রি দীপমালায় তাহাদের গৃহ সুশোভিত করুক আর কাল সন্ধ্যার সময় প্রতি মসজিদে মসজিদে নমাজ হবে।

বুলফিকার। প্রথম প্রচার কাজটা এখন স্থগিত রাখতে হবে, শাহজাদা

জাহান্দার। কেন, জুলফিকর খাঁ।

জুলফিকার। শাহজাদা আজিম যে সসৈন্যে দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছেন—আমাদের কর্ত্তব্য তাকে বাধা দেওয়া।

জাহান। ঠিক বলেছেন, সেনাপতি। প্রচার কার্য্য এখন স্থগিত রাখতে হবে। সৈন্যদের প্রস্তুত হতে বলুন—আমিই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব।

জুলফিকার। হামিদ, তুমি যাও—আমার আদেশ মত—দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হও।

হামিদ। যে আজ্ঞে— (কুর্ণিশ ও প্রস্থান)

জাহান্দার। বেশ হামিদ খাঁকে সঙ্গে করে জাহান তুমিই যাও। এ দিকে আমি তোমার অভিষেকের জন্য সব প্রস্তুত রাখব। জাহান, যুদ্ধই নিশ্চিত—ভাইএ ভাইএ যুদ্ধ—দুর্ব্বলতা ছাড়তেই হবে, ধর্ম্মই সব চাইতে বড়—তুমি ইসলাম ধর্ম্মের জন্যে যুদ্ধে যাও স্নেহ ভালবাসা, প্রীতি—সব বলি দিতে হবে—সাবধান মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সব নষ্ট করো না

(জাহানার ও জুলফিকারের প্রস্থান)

জাহান। আমি ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি'—না, আমি শুধু জগতে একটা জিনিষ জানি সে আমার প্রেম। নয়না! আমার প্রেমের উপহার ঐ—মোগোল সম্রাজ্য—তোমার জন্য যুদ্ধে জয় আনতে চলেছি।

জাহান। (স্বগত)—ধর্ম্ম! আমি কি ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি? আমি শুধু জগতে একটা জিনিষ জানি সে আমার প্রেম। নয়না! আমার প্রেমের উপহার—ঐ—মোগল সম্রাজ্য তোমার জন্য যুদ্ধে জয় করে আনতে চলেছি। সাগরের মত—অসীম, আকাশের মত অনন্ত আমর এই প্রেম—তার উপহার - মোগল সম্রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, অতি হেয়—তবু—।

পটনিক্ষেপ।

সপ্তম দৃশ্য।

লয়লা। কি জোৎস্নাই আজ উঠছে—সমস্ত আকাশ আলোর প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে তারাগুলি ডুবে কোথায় অতল হয়ে পড়ছে। সিয়ার বলছিল, বাঙ্‌লায় গিয়ে সে কেমন দেশ জানাবে—এতদিন হোয়ে গেল, কৈ সেত কিছু লিখ্‌ল না—হ্যাঁ সে আবার লিখ্‌বে শুনেছি ওদেশের মেয়েদের বিদ্যুৎ ভরা চোখের পানে তাকালে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় না—বুঝেছি তাই হবে—এরি মধ্যে ভুলে যাওয়া! সিয়ার, সিয়ার, যদি ভুলেই যাবে, তবে কেন তোমার প্রেমের নিঃশ্বাসে আমার উন্মুখ যৌবন মালঞ্চের সকল ফুলগুলি ফুটিয়ে তুলেছিলে? তবে কেন তোমার বিজল নয়ন কিরণ স্পর্শে আমার সুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করে, তাতে সাগরের জোয়ার বইয়ে দিলে? তুমি আমায় ভুলেছ, আমি কিন্তু তোমায় ভুল্‌বনা—তোমার সেই ভালবাসার স্মৃতির বাঁধন হতে মুক্তি আমি চাই না। জন্ম জন্ম ঐ রূপের আশা-ভরা সোহাগ—হাসিমাখা স্বপ্নের আলোয় ডুবে থাকি—স্বপ্নই এখন আমার সব, সে স্বপ্নেই কেন আমি বিভোর থাকিনা? —গান গাইতে বড় সাধ হচ্ছে, মানুষ সুখের দিনেও গায় আবার দুঃখের দিনেও গায়—আমার মনে হয়—গান দুঃখেরই ঠিক্ সাথী,—সুখের নয়।

(গীত)

গোপন ধীর চরণে এস অন্তরে মম
এস আলোক রথে বাতায়ন পথে নিলাজী জোৎস্না সম
আমার নীরব নিশীত রাতে
স্বপনে এস গো আঁখির পাতে
কুঙ্কুম এঁকে চুম্বন পাশে
অন্তরে মম॥
এস গো বিরহে ভুবন ভরিয়া, মগ্ন অঙ্গ লহ আবরিয়া
এস কঙ্কন করে যমুনা পুলিনে মনোরম এস মম।

(ধীরে ধীরে জাহানের প্রবেশ)

লয়লা। কে জাহান?

জাহান। হাঁ আমি লয়লা।

নয়না। এসো, এতক্ষণ বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার গান শুনছিলে ?

জাহান। হাঁ শুনছিলাম, কোন অপরাধ হয়েছে কি ?

নয়না। হয়েছে বৈ কি ? তুমি চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে আমার গান শুনেছ।

জাহান। চোর ত যেমন চুপি চুপি আসে তেম্‌নি চুপি চুপি চলে যায়— আমার মতন কি নিজের ইচ্ছায় ধরা দিতে আসে ?

নয়না। সে ত আরও ভাল। তুমি তবে চোর নও—তুমি ডাকাত !—এত রাত্তিরে যে এসেছ ?

জাহান। দেখা করতে এসেছি, আমি দিন কয়েকের জন্য, দিল্লী ছেড়ে যাচ্ছি।

নয়না। কোথায় যাচ্ছ ?

জাহান। বাঙ্‌লায়।

নয়না। (একটু চমকিত হয়ে) বাঙ্‌লায় ?

জাহান। (একটু হেসে হেসে) কেন বাঙ্‌লার নাম শুনে অমন চম্‌কে উঠলে যে ? সে কি খুব বেশী দূরে নয়না ?

(নয়নার নীরবে অবস্থান)

আজ নগরে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, এ ক'দিনের সঞ্চিত গাঢ় অন্ধকার দূর করে দিয়ে, নগরী আবার দীপমালার হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এত দিনের পর অনুমতি পেয়ে নাগরিকেরা আজ নিশি-উৎসবে উন্মত্ত। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, রূপের তরল-তরঙ্গে, সুরের তীব্র নেশায় লোকগুলি একেবারে দিশেহারা—পাগল। জগতের বীণার তারকে যেন কৌতুক দেখ্‌বার জন্য এক সুরে বেঁধে দিয়ে গেছে আনন্দের উল্লাসের সুর। সমস্ত জগতময় আজ একি বিদ্রূপের উৎসব।—নয়না, শুধু তোমার গানেই আমি আজ আমার অন্তরের প্রতিধ্বনি শুন্‌তে পেয়েছি—তীব্র অথচ মধুর পাপিয়ার সুরের শেষ উচ্ছ্বাসটুকুর মত বুক যাওয়া আকুল মর্ম্মান্তিক বেদনাময় তোমার গান।

নয়না। জাহান, আমারও একথা মনে হচ্ছিল—ঐ দেখ অন্তরের দুঃখটাকে উপহাস ক'রে জোছ্‌না কেমন হাস্‌ছে।

জাহান। নয়না, কি বেদনা আজ তোমায় অধীর করেছে ?

লয়লা। (একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া) সব কথাই কি সকলকে বলা যায়, জাহান—তোমার মনের কথা কি সকলকে বলে বেড়াও ?

জাহান। জগতে আর সকলকে তুমি যে চোখে দেখ আমাকেও কি সে ভাবেই—একটুও বিশেষ নেই ? লয়লা, এত কঠোর কথা তুমি এত শান্তভাবে যে বলতে পার সে আমি ভাবতেও পারি না।

লয়লা। জাহান ক্ষমা করো।!

জাহান। ক্ষমা করবো কাকে—তুমি যে আমার সকল ক্ষমার অনেক উর্দ্ধে। আজ এই সুনীল আকাশতলে দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে—জীবনের সব চেয়ে পবিত্র আমার সব চাইতে গৌরবের কথাগুলি বলবার আর কোন শুভক্ষণ পাব কিনা জানিনা—দাঁড়িয়ে শোনো।

লয়লা। জাহান, একি পাগলের মত বকৃছ, আমি জানি তোমায় বলতে হবে না।

জাহান। তুমি কতটুকু জান লয়লা !—

লয়লা। তবে আমি চললাম।

জাহান। ক্ষমা করো লয়লা, তোমায় যেতে হবেনা—আমিই যাচ্ছি—চাঁদের আলো আমায় মাতাল ক'রেছে।

(প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপন)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দীপ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হোলি।

—:০:—

যত রাখাল বালক খেল্‌চে হোলি
ফুল্ল-মনে,—
দেখ ছুটল সেথা দাম বসুদাম
সংগোপনে।
ওগো! সবার দেহ আবীর-রাঙা,
জড়িত-বচন পুলক-ভাঙা;
মরি! কালিন্দী ঐ লাল হ'ল গো
বৃন্দাবনে!
যত কিশোর প্রাণের ঝঙ্কারে আজ
ব্রজাঙ্গনে!
দেখ ললিতা ঐ ছুট্‌ল লয়ে
ফাগের থারি,—
ওগো সুবল দেছে রাইএর অঙ্গে
রঙের ঝারি!
আহা! বিশাখা ঐ পড়্‌ল লুটে,
পিচকারী নে' শ্যাম যে ছুটে;
মরি! লাল হ'ল আজ গোঠের ধূলি
বৃন্দাবনে!
একি নূতন রসে মাত্‌ল সবাই
ব্রজাঙ্গনে!!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

স্বরলিপি।

—:০:—

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।]

বাহার—কাওয়ালী।

স্থায়ী।

০ ১ ২´
মা মা II{মা পা পা পা | পধা পা ᵐজ্ঞা জ্ঞা I মা ᵍধা -া না |
য ত রা খাল্ বা লক্ খেল্ চে হো লি ফু ল ০ ম

৩ ০
| (র্সা -া মা মা)} | র্সা -া র্সা -া | {র্রা র্রা র্রা র্রা |
নে ০ 'য ত' নে ০ দে খ্ ছুট্ ল সে থা

১ ২´ ৩
| র্সা না র্সা র্সা I মা মাঃ -পঃ মা | (মা -া র্সা -না)} |
দাম্ বা সু দাম্ সং গো ০ প নে ০ 'দে খ্'

৩
| মা -া মা মা II
নে ০ "য ত"

অন্তরা।

০ ১ ২´
ধা ধা II{না না -া র্মা | র্সা -া -া -া I র্রা র্রা -া র্সনা |
ও গো স বা র্ দে হ ০ ০ ০ আ বী র্ রা০

১
| র্সা -া -া -া | ণা ণা -া -া | ধা ধা -া -ণা I
ঙা ০ ০ ০ অ ঙ্গি ০ ত্ ব চ ০ ন

I ধা না -া না | (র্সা -া ধা ধা)} | র্সা -া র্সা না |
পু ল কৃ তা ঙা ০ 'ও গো' ঙা ০ ম রি

০ ১ ২´
| {র্সর্মা -র্মজ্ঞা র্মা -া | র্রা র্সা না র্সা I মা ণধা -া না |
কালি ন্দী অ ই লাল্ হ ল গো বৃ ন্দা ০ ব

৩ ০
| (র্সা -া র্সা না)} | র্সা -া র্সা না | {র্সা র্সা া ধা |
নে ০ 'ম রি' নে ০ ম ত কি শোর্ ০ প্রা

১ ২´ ৩
| পা পা মজ্ঞা মা I মা ণধা -া না | (র্সা -া র্সা না)} |
ণের্ রং কারে আজ্ র ঙা ঙ্ গ নে ০ 'ম ত'

| র্সা -া মা মা II
নে ০ "ম ত"

সঞ্চারী।

০ ১ ২
সা -া II {মা মা মা মা | মা পা মা জ্ঞা I মা ণধা না -া |
যে থ্ ন লি তা ঐ ছুট্ ল ন রে ফা গের্ খা ০

৩ ০
| (র্সা -া সা -া)} | র্সা -া র্সা না | {সা র্রা র্রা র্রা |
রি ০ 'যে থ্' রি ০ ও গো সু বল্ যে ছে

১ ২´ ৩
| র্সা পা ধা পা I মা ণধা ধা -না | (র্সা -া র্সা না)} |
রাই এর্ অঙ্ গে ফা গের্ ঝা ০ রি ০ 'ও গো'

৩
| র্সা -া |
রি ০

আভোগ।

৩ ০ ১ ২´
ধা ধা | {না না র্সা র্সা | র্রা র্সা না র্সা I পা র্সা না র্সা |
আ হা বি শা খা ঐ পড়্ ল লু টে পিচ্ কা রী নে'

০ ১
| র্রা র্রা র্সনা র্সা | র্সা র্মা র্মা র্মা | র্জ্জা র্মা র্রা র্সা I
শ্যাম্ যে ছু০ টে লাল্ হ ল আজ গো ঠের্ ধূ লি

২´
I মা ণধা -া না | (র্সা -া ধা ধা)} | র্সা -া র্সা না |
বৃ ন্দা ০ ব নে ॥ 'আ হা' নে ০ ম রি

০ ১ ২´
| {র্সা র্মা র্মা র্মা | র্জ্জা র্মা র্রা র্সা I মা ণধা -া না |
লাল্ হ ল আজ গো ঠের্ ধূ লি বৃ ন্দা ০ ব

৩ ০
| (র্সা -া র্সা না)} | র্সা -া র্সা না | {র্সা র্রা র্রা র্রা |
নে ০ 'ম রি' নে ০ এ কি নু তন্ র ঙে

১ ২´
| র্সা না র্সা র্সা I পা ণধা -া না | (র্সা -া র্সা না)} |
মাত্ ল স বাই ব্র জা ঙ গ নে ০ 'এ কি'

৩
| র্সা -া মা মা II II
নে ০ "ম ত"

চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ-দর্শন

চার্ব্বাক-দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের সাদৃশ্য যে যথেষ্ট সে কথা সকলেই জানেন। চার্ব্বাক ঈশ্বর মানেন না, বৌদ্ধ-দর্শনও ঈশ্বর মানে না। চার্ব্বাক আত্মা মানেন না, বৌদ্ধ-দর্শনও আত্মা মানে না। চার্ব্বাক জন্মান্তর মানেন না, বৌদ্ধ-দর্শন কর্ম্মান্তর মানে বটে কিন্তু জন্মান্তর দ্বারা চার্ব্বাক যাহা বুঝেন তাহা মানে না। বেদের উপর চার্ব্বাকের যেমন আস্থা নাই বৌদ্ধ দর্শনেরও তেমনই আস্থা নাই। ইহা হইতে যদি কেউ বলেন যে চার্ব্বাক ও বুদ্ধদেব একই ব্যক্তি তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণ তাঁহার যুক্তির অসারতা দেখাইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবেন না, কারণ যুক্তিটির মধ্যে হেতু অর্থাৎ Middle termটি সমগ্র ভাবে (distributed) লওয়া হয় নাই। যদি কেউ বলেন—

পাখীদের পা আছে।
মানুষেরও পা আছে।
তাই মানুষ (হয়) পাখী ॥

তাহা হইলে যে দোষ হইবে উপরোক্ত প্রমাণ বলে চার্ব্বাককে বুদ্ধ কিম্বা বুদ্ধকে চার্ব্বাক বলিলেও সেই দোষ হইবে। ঐতিহাসিকদের পক্ষ হইতেও আপত্তি হইবে যথেষ্ট। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ ও বিষয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। তিনি চার্ব্বাক হইলে নিশ্চয়ই চার্ব্বাক নামটা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে কাহাকেও বলিতে শুনা যাইত। আর তিনি যদি চার্ব্বাকের শিষ্যও হইতেন তাহা হইলেও গুরুর নামটা দুই একবার তিনি নিশ্চয়ই করিতেন। কিন্তু তাহাও বোধ হয় তিনি করেন নাই।

কিন্তু তথাপি আমার মনে হয় বুদ্ধদেব চার্ব্বাক না হইলেও তিনি যে চার্ব্বাকের নিকট যথেষ্ট ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ করা অনুচিত। ধরিয়া লওয়া যাক্ বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের মত গ্রহণ করিয়া সেই মতটিকে অনেকটা বিশুদ্ধ করিয়া উপস্থিত করেন। কিন্তু তাহা হইলেই তিনি চার্ব্বাকের নাম করিতে যাইবেন কেন? তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম প্রচার, দর্শন প্রচার ত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদের নিকট চার্ব্বাকের অখ্যাতি এত বেশী ছিল যে

তিনি যদি চার্ব্বাকের নাম করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে বসিতেন তাহা হইলে একটি শিষ্যও বোধ হয় শুনিতেও আসিত না। আর যদি শিষ্য প্রশিষ্যদের নিকট কোনও ক্রমে যদি বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের নাম করিয়াও থাকেন তাহা হইলে যে তাঁহারা সেই অখ্যাতি-সম্পন্ন চার্ব্বাকের নাম বুদ্ধদেবের কথার সঙ্গে লিখিয়া রাখিবে বা বাঁচাইয়া রাখিবে ইহা সন্দেহজনক। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় অনুগত শিষ্যগণ গুরু ও নেতার অখ্যাতিজনক কার্য্য ও কথা চাপা দিয়া ভাল কথা ও কার্য্যগুলি প্রকাশ করেন। আরও দেখি প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার মনের কুবাসনা ও তাহার কুকার্য্য যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া আপনার ভাল কথা, কার্য্য ও দিকটা লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে নিঃসন্দেহ ভাবে বলা যায় না যে চার্ব্বাকের নিকট বুদ্ধদেব ঋণী নন, কিম্বা চার্ব্বাকের মতের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন না কিম্বা চার্ব্বাকের কথা তিনি কখনও শিষ্য প্রশিষ্যাদিগকে বলেন নাই।

চার্ব্বাক-দর্শনের সহিত বৌদ্ধ-দর্শনের যথার্থ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্য চার্ব্বাক দর্শনের পরই বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ-দর্শনের সহিত চার্ব্বাক দর্শনের কতখানি সাদৃশ্য তাহাই এখন একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক কোন রকম প্রমাণ বলে বুদ্ধদেব ভগবানের বিশ্বাস খণ্ডন করিয়াছেন। দীঘ নিকায় অন্তর্গত তেবিজ্জ সূত্রে দেখিতে পাই বুদ্ধদেব বসেথকে কহিতেছেন—এমন কি কেউ আছেন যিনি ব্রহ্ম কোথায় থাকেন, কোথা হইতে তাঁহার জন্ম কিম্বা কোথা হইতে তিনি আসেন বা কোথায় তিনি যান—এই সকল কথা জানেন? যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেউ কিছু দেখেন নাই বা শুনেন নাই তখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদের উক্তি একবারেই মিথ্যা। সুতরাং ব্রহ্ম অসিদ্ধ।

এখানে বুদ্ধ দেব প্রত্যক্ষবাদ মানিয়া লইয়াছেন। অনুমান প্রভৃতি প্রকারন্তরে অস্বীকার করিয়াছেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বা কেউ প্রত্যক্ষ করে নাই, সুতরাং ভগবান নাই। সেইরূপ যাহাকে দেখি নাই, যার কথা শুনি নাই বা যার বংশ পরিচয় ইত্যাদি জানি না তাহাকে যেমন ভালবাসা যায় না—তাহার সহিত মিলন যেমন অসম্ভব তেমনই ভগবানের

সঙ্গে মিলনও অসম্ভব—ভগবানের সহিত ভালবাসা বা প্রেম হওয়াও অসম্ভব। চার্ব্বাকও ভগবানের অনস্তিত্ব ঠিক এই ভাবেই প্রমাণ করেন।

মজ্ঝিমা নিকায় অন্তর্গত সব্বাসব সুত্তে দেখিতে পাই এই সমস্ত চিন্তা বা প্রশ্ন দূষণীয়, আমার জন্মের পশ্চাতে যে অতীত বিস্তৃত রহিয়াছে সেই অতীত কালে আমি কি বাঁচিয়া ছিলাম না? যদি বাঁচিয়াই থাকি তবে কি হইয়াই বা বাঁচিয়া ছিলাম? কোন অবস্থাতেই বা ছিলাম? সুখেই ছিলাম না দুঃখে ছিলাম? কেমই বা আমার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল? মৃত্যুর পরেও কি আমি বাঁচিয়া থাকিব? বাঁচিয়া থাকিলে সুখেই থাকিব না দুঃখে থাকিব? কিসের জন্যই বা আমার ঐরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে?

বুদ্ধ দেব বলিবেন এই সকল প্রশ্ন ভ্রান্তিপূর্ণ কারণ আত্মাই নাই তার আবার জন্মান্তর থাকিবে কি করিয়া? যদি বলি "আত্মা নাই" জানেন কি করিয়া? তিনি বলিবেন—এ পর্য্যন্ত কেউ আত্মাকে দেখিয়াছে কি যে আত্মাকে স্বীকার করিব সুতরাং আত্মা ও জন্মান্তর প্রত্যক্ষ করা যায় না, সুতরাং তাহারা অসত্য। চার্ব্বাক যুক্তির সঙ্গে বুদ্ধদেবের মতের এখানে কোন প্রভেদ নাই। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না তাহার অস্তিত্ব চার্ব্বাকও মানেন না বুদ্ধদেবও মানেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৌদ্ধদর্শন ও চার্ব্বাক দর্শন একই প্রকার প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধবাদ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—যে হেতুর সহিত ব্যাপ্যের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আমরা পাইতে পারি তাহা বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে একত্ব ও কার্য্য কারণত্বের যে কোনটী অবলম্বন করিয়া ব্যভিচার রহিত (exceptionless) অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাওয়া যায়। যথা—অগ্নির সহিত ধূমের কার্য্য কারণত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, কারণ (১) অগ্নির পূর্ব্বে ধূম দেখিতে পাওয়া যায় না; অর্থাৎ যখনই ধূম দেখি না কেন তখনই একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব তাহার পূর্ব্বে অগ্নি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অগ্নি ও ধূমের সহিত অনুবর্ত্তিতা বা Succession রহিয়াছে। (২) দ্বিতীয়তঃ যখনই আমরা অগ্নি দেখি তখনই আমরা ধূম দেখিতে পাই, অর্থাৎ এমন কোনও অগ্নি নাই যাহার সহিত ধূম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে অগ্নির সহিত ধূমের যে অনুবর্ত্তিতা তাহা ব্যভিচার রহিত বা invariable. (৩) তৃতীয়তঃ যখন ধূম আর দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ ধূম যখন থাকে না তখন অগ্নিও দেখিতে পাওয়া যায়

না, অর্থাৎ থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৌদ্ধ নানা কারণবাদ অর্থাৎ Plurality of causes একেবারেই মানেন না। ধূম কেবলমাত্র অগ্নিদ্বারাই হইতে পারে অন্য কিছু দ্বারা হইতে পারে না। বৌদ্ধগণ কার্য্য কারণত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে কারণ বর্ত্তমান থাকিলেই কার্য্য হইবে, সুতরাং এই কার্য্যকে ঘটাইতে কারণকে অপর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখিতে হয় না। বিড়ালটি যখন গৃহে প্রবেশ করে তাহার লেজটিও যেমন বিড়ালটির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনই কারণটি উপস্থিত হইলেই কার্য্য ঘটিয়া পড়ে। সুতরাং বৌদ্ধগণ কারণের unconditionality বা অনন্য-পরতন্ত্রতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল ইউরোপীয় ন্যায় শাস্ত্রে (Logic) কার্য্য কারণত্বের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তাহাই প্রকারান্তরে দিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধগণ আরও বলেন যে একত্বের বলে আমরা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাইতে পারি। যথা, শিশুগাছ (হয়) একটা গাছ। যেখানেই আমরা শিশুগাছ দেখি না কেন সেখানেই আমরা একটি বৃক্ষ দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে শিশুগাছের সহিত বৃক্ষত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ ব্যাভিচাররহিত। বৌদ্ধগণ আরও বলিতে পারিতেন ত্রিভুজের মধ্যস্থিত তিনটি কোণ দুই সমকোণের সমান কিম্বা ২+২=৪ সকল অবস্থাতেই সত্য।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে এই সকল যুক্তি যে বুদ্ধদেব নিজে প্রদর্শন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। পালি পিটকে এই সকল যুক্তি পাওয়া যায় কি না তাহা সুধীগণ একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিবেন। আমার ধারণা এই যে এই সকল যুক্তি বৌদ্ধগণ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের শিষ্য প্রশিষ্যেরা ব্রাহ্মণ্য দর্শনের সহিত লড়াই করিতে নামিয়া নিজ নিজ মস্তিষ্ক হইতে সৃষ্টি করিয়া তথাগতের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। পালি পিটক পড়িলে খুব স্পষ্ট ভাবেই চোখে পড়ে বুদ্ধদেব এক প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ ব্যবহার করেন নাই বা মানেন নাই।

এ সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে এ সমস্ত যুক্তির যুক্তিসঙ্গত উত্তর যে চার্ব্বাক দিতে না পারেন তাহা নহে। চার্ব্বাক বলিবেন কার্য্য কারণত্ব ও একত্ব যতখানি প্রত্যক্ষ করি ততখানিই সত্য বলিয়া মানি। এবং এই প্রত্যক্ষ যদি অনুমিত কার্য্য কারণত্বের ও

একত্বের পশ্চাতে না থাকিত তবে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম না। ধূম ও অগ্নির কার্য্য কারণত্ব যদি না দেখিতাম তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণত্ব সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম না। যদি শিশুকে গাছ বলিয়া প্রত্যক্ষ না করিতাম তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একত্ব মানিতাম না। সুতরাং আমরা কোথায় কার্য্য কারণত্ব বা একত্ব মানিব? যেখানে আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিব। হিউম প্রভৃতি বৈদেশিক দার্শনিকের ন্যায় চার্ব্বাকও যে অনেক সারবান যুক্তি দেখাইতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সুতরাং বলা যাইতে পারে প্রমাণ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব ও চার্ব্বাকের একমত।

আমরা দেখিয়াছি চার্ব্বাক আত্মা বলিয়া কিছুই মানেন না। বুদ্ধদেবও আত্মা বলিয়া কিছুই মানেন না। জন্মান্তর সম্বন্ধেও চার্ব্বাক ও বুদ্ধদেবের একমত। আত্মাই যদি না রহিল জন্মান্তরই বা কেমন করিয়া সমর্থন করা যায়? সুতরাং ইহার ফলে এই দাঁড়ায় যে দেহই আত্মা হইয়া পড়ে আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের ব্যক্তিগত ইতিহাস শেষ হইয়া যায়। এইখানে বুদ্ধদেব একটু অগ্রসর হইয়া বলেন—সকলই ধ্বংস হইয়া যায় বটে কিন্তু কর্ম্ম রহিয়া যায়। যাহারা আমার মৃত্যুর সময় বাঁচিয়া থাকিবে এবং যাহারা ভবিষ্যতে জন্মিবে তাহারা এই কর্ম্মের সু ও কু, এই উভয়বিধ ফলই ভোগ করিবে। Rhys Davids বলেন "There is no transmigration of Souls in Gotama's teaching. His real theory is a transfer of karma. * * * *. In no case is there any future life in the Christian sense. At a man's death, nothing survives but the effect of his actions; and the good that he has done, though it lives after him, will redound, not to his own benefit as we would call it, but to the benefit of generations yet unborn, between himself and whom there will be no consciousness of idintity in any shape or way." (Hibbert Lectures, 108-109) অর্থাৎ বুদ্ধদেব কখনও জন্মান্তর বাদ শিক্ষা দেন নাই। তিনি দিয়াছেন কর্ম্মান্তর বাদ। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে ভাবে ভবিষ্যৎ জীবন বা ঐহিক জীবনের পর পারত্রিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন সে ভাবের ভবিষ্যৎ জীবন বৌদ্ধ দর্শনে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ মতে মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তাহার

সুকর্ম্মের ফল যদিও তাহার মৃত্যুর পর রহিয়া যায় তথাপি নিজে সে কর্ম্মফল দ্বারা উপকৃত হয় না। ভবিষ্যতে যাহারা জন্মিবে তাহারাই ঐ কর্ম্মফল ভোগ করিবে। কিন্তু ইহাদের সহিত সেই মৃত ব্যক্তির কোন প্রকারের একত্ব থাকিবেনা। এবং উহাদের মনে কোনরূপ একত্ব জ্ঞানও থাকিবে না। সুতরাং বুঝা গেল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া গেল। যে কর্ম্মটুকু রহিল তাহার উপর মৃতব্যক্তির কোনই অধিকার রহিল না। চার্ব্বাক এই জটীল কর্ম্মান্তর বাদের অবতারণা করিয়া সহজ ভাবে বলিয়াছেন দেহই আত্মা আর দেহ ধ্বংশের পর কিছুই থাকে না। মনে করুন একটি লোক ঘর বাড়ী টাকা পয়সা রাখিয়া জীবন শেষ করিল তখন এই সকল ঘরবাড়ী ইত্যাদি চার্ব্বাকের মতে কে ভোগ করিবে? চার্ব্বাক নিশ্চয়ই বলিবেন পুত্র পৌত্রাদি এবং ভবিষ্যতে যাহারা জন্মিবে। দুই ব্যধি গ্রস্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহার ব্যধির ফল কে ভোগ করিবে? চার্ব্বাক নিশ্চয়ই বলিবেন তাহার স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি এবং ভবিষ্যতে যাহারা জন্মিবে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে মৃত্যুর কিছু না থাকা বিশ্বাস করিলে এই কর্ম্মান্তরবাদ মানিতে হয়। কারণ এই কর্ম্মান্তর চিরদিনই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি।

উপনিষদের মূল সূত্র যেমন আত্মবাদ বৌদ্ধ দর্শনের মূল সূত্রও তেমনই অনাত্মবাদ। উপনিষদ জরা ও মৃত্যু রহিত পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত আত্মাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধ দর্শন তেমনই পরিবর্ত্তনশীল ঘটনানিচয়কেই কেবলমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। রিজ ডেভিড (Rhys Davids) উপনিষদ ও বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে তুলনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"It (Buddhism) swept away from the field of vision the whole of the great soul theory which had hitherto so completely filled and dominated the mind of the superstitious and of the thoughtful aliko. (Hibbrt Lectures, 1881, P. 29). অর্থাৎ যে আত্মবাদ কুসংস্কারসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের মনপ্রাণ এতকাল ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল এবং যে আত্মবাদ দ্বারা তাহাদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইত সেই আত্মবাদকে বৌদ্ধদর্শন জ্ঞানরাজ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছিল। অর্হৎ হইতে গেলে যে দুইটি বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হয় তাহা নিত্যবাদ ও

আত্মবাদ। "* * the very first of the Sangyojanas, the fetters which the disciple has to break on the way to Arhatship is also the doctrine of individuality (Atto-vada)"—Hibbert Lertures, 1881, p. 208. অর্হত্ত্বকামী শিষ্যকে অনিচ্ছসম্ব এবং অনাত্মসম্ব হইতে হয় অর্থাৎ নিত্যতায় অবিশ্বাসী এবং আত্মায় অবিশ্বাসী হইতে হয়। সুতরাং বুঝা গেল চার্ব্বাক ও বুদ্ধদেবের আত্মা সম্বন্ধে একই মত।

আত্মা সম্বন্ধে চার্ব্বাক যাহা বলিয়া গিয়াছেন বুদ্ধদেবও তাহাই বলেন। দীঘনিকায় অন্তর্গত তেবিজ্জ সুত্তে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—"Just as, when a string of blind men are clinging one to the other, neither can the formost see, nor can the hindermost see—just even so, methinks, Vasettha, is the talk of the Brahmans, versed though they are in the three Vedas, but blind talks, The first sees not, neither does his teacher see, nor does his pupil. The talk, then of these Brahmans, versed in the three Vedas, turns out to be ridiculous, mere words, a vain and empty things." (H. L. Page. 59.)

একদল অন্ধ যখন পরস্পর ধরাধরি করিয়া চলিতে থাকে তখন যেমন সর্ব্বাগ্রের ব্যক্তিটি দেখিতে পায় না, মধ্যস্থিত ব্যক্তিটিও দেখে না এবং সর্ব্বপশ্চাতের ব্যক্তিটিও যেমন দেখে না তদ্রূপ, হে বাসেথ্থ, তিন বেদে (অথর্ব্ব বেদ তখন বেদ বলিয়া গণ্য হইত না) অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উক্তি অন্ধবাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রথম ব্রাহ্মণটিও কিছু জানে না, তাহার শিক্ষকও কিছু জানে না, তাহার শিষ্যও কিছু জানে না। সুতরাং ত্রিবেদ অভিজ্ঞ এই সকল ব্রাহ্মণের উক্তি হাস্যকর, সারশূন্য এবং মূল্য বিহীন বাক্যসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বৈদিক যাগ যজ্ঞ উপাসনা মন্ত্র ইত্যাদির যে কোন মূল্য নাই বুদ্ধদেব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অচিরবতী নদীর তীরে দাঁড়াইয়া যদি শত সহস্র বার কাকুতি মিনতি করিয়া বলা যায়—"হে অচিরবতি, তোমার অপর তীরকে এপারে লইয়া আস", তবুও অপর তীর এপারে চলিয়া আসিবে না। তেমনই, ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, মহিদ্ধি ও যমকে বৈদিক ছন্দে বৈদিক যজ্ঞ করিয়া, শত সহস্র প্রকারে তাহাদের যশোগান করিয়া আহ্বান

করিলে তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া চাহিবেন না। বুদ্ধদেব বলে, যদি ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা থাকে তবে তাঁহারা যেন যাগ যজ্ঞ মন্ত্র তন্ত্র উপাসনা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্ম্ম আচরণ করেন এবং অপকর্ম্ম অর্থাৎ পাপ ও অন্যায় পরিত্যাগ করেন।

বুদ্ধদেব আরও বলেন যে ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মের মিলন অসম্ভব। ব্রাহ্মণদের পত্নী ও সম্পত্তি থাকে, অথচ, ব্রহ্মের ঐ সকল কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণ ক্রোধ, দ্বেষ, পাপ ও ইন্দ্রিয় বশীভূত অথচ ব্রহ্ম ক্রোধ, দ্বেষ ও ইন্দ্রিয় শূন্য। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মের মিলন একেবারেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাঁহারা সদ্ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক জ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে থাকেন তাঁহারা দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর পঙ্কে নিমজ্জিত হন। সেই জন্য বুদ্ধদেব তেবিজ্জ সূত্রে বলিয়াছেন,—"Therefore is it that the threefold wisdom of the Brahmans, wise in the Vedas, is called a waterless desert, their theofold wisdom is called a pathless jungle, their threefold wisdom is called their destruction"—H. L. 1881—P. 63. অর্থাৎ বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের ত্রৈমুখী বুদ্ধি জলহীন মরুর ন্যায় এবং পথশূন্য অরণ্যের ন্যায়, এবং তাহার ফল তাহাদের ধ্বংস।

সুতরাং বুঝা গেল চার্ব্বাকের মত বুদ্ধদেবও বেদ অগ্রাহ্য এবং বেদ অসত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

জাতিবর্ণ সম্বন্ধেও বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের সহিত এক মত। চার্ব্বাকের মত বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানেন না। মজ্ঝিমা নিকায় অন্তর্গত অস্সলায়ান সূত্রে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব অপনোদন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণ অন্যান্য জাতীয় রমণীগণের ন্যায় প্রসব বেদনা ইত্যাদি যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রণা একই ভাবে ভোগ করেন। ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ যেমন অন্যান্য জাতীয় গাত্রবর্ণ অপেক্ষা গৌর তদ্রূপ বর্ণবিভিন্নতা আফগানী স্থানে ও ব্যাক্‌ট্রিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে দাসও সময় সময় প্রভু হইয়া পড়ে আবার প্রভুও দাস হইয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল দেশে দাস চিরকাল দাস-ই রহিয়া যায় না, আর প্রভুও চিরকাল প্রভু-ই রহিয়া যায় না। ঐ সকল দেশে যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করি এই ভারতবর্ষেও তাহাই প্রত্যক্ষ করিব কেন? সুতরাং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সত্য নহে। বুদ্ধদেব

আরও বলেন যদি কোনও শূদ্র, বৈশ্য অথবা ক্ষত্রিয় নরহত্যা করে, চুরি করে, মিথ্যা কথা কহে, মিথ্যা দুর্নাম রটায় ও দুর্নীতি পরায়ন হয় তার মৃত্যুর পর সে দুঃখ-কষ্ট-পূর্ণ অবস্থা লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, আর ব্রাহ্মণ যদি এই সকল অপকর্ম্ম করে তবে তাহাকেও দুঃখ কষ্টপূর্ণ অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। [এখানে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের কথা বলিতেছেন।] তাহা যদি হইল তবে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব রহিল কোথায়? ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র একই ভাবে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইতে ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে একই ভাবে সমর্থ হয়। বুদ্ধদেব আরও বলেন যে অশ্ব ও গর্দ্দভের মিলনে খচ্চর জন্মগ্রহণ করে কিন্তু এই খচ্চর অশ্ব ও গর্দ্দভ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। কিন্তু, ব্রাহ্মণের সহিত অপর জাতীয় ব্যক্তি বিশেষের মিলনে যে সন্তান জন্মে সে সন্তান পিতা মাতার প্রকৃতি বিশিষ্টই হয় বিভিন্ন প্রকারের হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যায় ব্রাহ্মণ অপর কোন জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ নহে।

এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দ্বারা বুদ্ধদেব বুঝাইয়াছেন যে সকল জাতিই সমান। জন্ম কিম্বা বর্ণের জন্য কেহ কাহারও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। সদ্ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা, বিশুদ্ধ স্বভাব দ্বারা এবং কুঅভ্যাস ও কু-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে।

সুতরাং বুঝা গেল বুদ্ধদেব চার্ব্বাকের মতই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানেন না।

আত্মাই যদি না রহিল, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি জীবনের ইতিহাস শেষ হইয়া গেল তখন স্বর্গ নরক কবির কল্পনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মৃত্যুর পর আত্মা যেখানে সুখ-ভোগ করে তাহাই স্বর্গ, আর মৃত্যুর পর আত্মা যেখানে দুঃখ বা শাস্তি ভোগ করে তাহাই নরক। বুদ্ধদেব অনাত্মবাদী, সুতরাং তাঁহার স্বর্গ নরকে বিশ্বাস নাই। স্বর্গ নরক বলিতে যাহা কিছু তাহা বৌদ্ধ মতে ইহসংসারে অর্থাৎ এক জন্মেই আমরা ভোগ করি। স্বর্গকামী ব্যক্তিদিগকে বুদ্ধ বলেন—Very good; you want to go to heaven. It is really a mistake. Arahatship is better than heaven, and the Arahats are above all gods. But still, if you cannot comprehend that, then at least understand that the only way to heaven is not ritual, but righteousness. (Hibbert Lectures—P. 104).

অর্থাৎ তুমি স্বর্গে যেতে চাও—বেশ ভাল কথা। তবে, সত্য করে বলতে গেলে এটা তোমার ভ্রম অর্হত্ব স্বর্গের চেয়ে ভাল, অর্হতেরা দেবতাদের উপরে। তবে তুমি যদি তা' বুঝতে না পার, তবে মনে রেখে যে স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সদ্ধর্ম্ম আচরণ। যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি করে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব।—এই হইল প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের উক্তি। অর্ব্বাচিন বৌদ্ধ ধর্ম্মে আমরা স্বর্গ নরক ও জন্মান্তরের কথা এত শুনি যে আমাদের মনে হয় অর্ব্বাচিন বৌদ্ধগণ এই সকল বিশ্বাস করিতেন।

চার্ব্বাক মত ও বৌদ্ধ মতের এতখানি সাদৃশ্য থাকা সত্বেও বুদ্ধকে চার্ব্বাকপন্থী বলিতে অনেকেই কুণ্ঠা বোধ করিবেন। বুদ্ধই চার্ব্বাক আর চার্ব্বাকই বুদ্ধ একথা বলিলে অনেকেই খড়্গহস্ত হইবেন। কুণ্ঠা বোধ করিবার ও খড়্গহস্ত হইবার কারণও আছে। কারণ, আমরা জানি চার্ব্বাক ইন্দ্রিয় সুখবাদ প্রচার করিয়াছেন আর বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ বাদ বা অর্হত্ব বাদ ও সদ্ধর্ম্মাচরণবাদ প্রচার করিয়াছেন। চার্ব্বাক মতে সুখ সম্ভোগই মানবজীবনের ধর্ম্ম আর বুদ্ধদেবের মতে সদাচরণই মানবধর্ম্ম। চার্ব্বাক সুখ বলিতে ইন্দ্রিয় সুখ বুঝেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া তৃষ্ণার বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ইচ্ছা করেন যদি কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক এই বিভিন্নতাটুকুর অনস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মত উপায় প্রদান করিতে পারেন তাহা হইলে বুদ্ধদেবই যে চার্ব্বাক কিম্বা চার্ব্বাকপন্থী তাহা সাব্যস্ত করা কতকটা সম্ভবপর হয়। গুরু শিষ্য পার্থক্য থাকা আশ্চর্য্য নয়। প্লেটো আরিষ্টটলেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং হইতে পারে বুদ্ধদেব চার্ব্বাকমত গ্রহণ করিয়া সেই মতকে অনেকটা সংশোধিত করিয়া জন সমাজে প্রচার করিয়া ছিলেন। ইয়োরোপীয় নীতি শাস্ত্রের ইতিহাসে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখবাদ ও বিশুদ্ধ সুখবাদ দেখিতে পাই। চার্ব্বাক ও বুদ্ধদেব সম্ভবত ঐ প্রকার দুইটী সুখবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তবে বৌদ্ধমতকে বিশুদ্ধ সুখবাদ বলিতে অনেক আপত্তি করিতে পারেন। তাঁহারা যদি ভাবিয়া দেখেন যে বুদ্ধদেবের মূল অভিপ্রায় মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করা তাহা হইলে আর সে সন্দেহ থাকিবে না। দুঃখ দূর হইলে মানুষের যে অবস্থা আসিয়া দাঁড়ায় তাহাকে সুখের অবস্থা বলা যাইতে পারে। সাধারণ অবস্থায় দুঃখশূন্য অবস্থার নাম সুখ-পূর্ণ অবস্থা। এতখানি মানিলে যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে চাহেন তাঁহাকে সুখবাদী বলা অসঙ্গত হয় না। সুতরাং বুদ্ধদেবও সুখবাদী চার্ব্বাকও সুখবাদী। তবে বুদ্ধদেবের সুখ-কল্পনা

চার্ব্বাকের সুখ কল্পনা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। আজ এইখানে এ প্রবন্ধের শেষ করিলাম। সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বুদ্ধদেবকে চার্ব্বাকপন্থী বলা সঙ্গত কিনা। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব লইয়া নাড়াচাড়া করেন তাঁহারা যেন বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখেন বুদ্ধদেবই চার্ব্বাক কিনা।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

আঁখি।

-:0:-

কে বলে রে আঁখি? ও যে মনের দর্পণ,
ঐ দুটি কালো তারা ও যে অমৃতের ধারা
অসীমে সসীমে বাঁধে সেতুর মতন!
হাসি? সে ত মণি হয়ে ওরই বুকে দোলে
ও কালো অতল থির সুধার সাগর-নীর
পূজার কমল ফোটে ওরই কোলে কোলে।
করুণার ছবি ও যে ব্যথিত-শরণ
অনুরাগ বাখানিতে কে আছে এ অবনীতে
প্রেমের জনম ও যে প্রেমের মরণ!

কে বলে রে আঁখি? ও যে রূপের সাগর
কবি ওরই ধ্যানে ভুলি চিত্রকর টানে তুলি
প্রেমিক সে জানে ও যে সুধাসরোবর!
কোথা বা সীমানা ওর কোথা ওর কূল
রূপের পিপাসী যারা খুঁজে খুঁজে দিশাহারা
মাটির প্রতিমা পরে পরণের ফুল।

ও যে ভাষাহারা কথা কহে নিরন্তর
অভিধান কোন্ ছার জ্ঞানী সে যে মানে হার
গুণী সে অবাক্ শুনি সঙ্গীত অমর!

কে বলে রে আঁখি? ও যে ইন্দ্রিয়ের রবি
অন্ধ এই অন্ধকূপে দুইটি দুয়ার রূপে
দেখাইছে অন্তরের আনন্দের ছবি!

ও যে বহুরূপী শুধু নহে ত নয়ন
দয়া প্রেম স্নেহ ক্ষমা গোপনে করিছে জমা
স্বরগের ফুলগুলি করিয়া চয়ন!

চিন্ময় স্বরূপে ও যে দিতে জানে কায়া
অনন্তের প্রেম পানে ডুবিতে মজিতে প্রাণে
ধ্যানে ও আঁকিতে জানে অনন্তের ছায়া!

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।
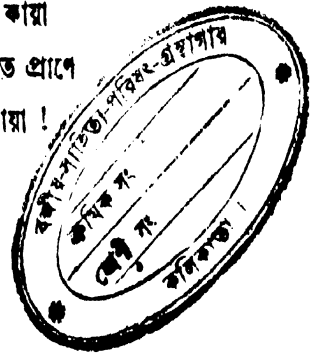
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নদীতে নামিয়া বহু 'বাছাবাছি'র পর পছন্দমত একটি স্থান খুঁজিয়া পাইলাম। স্থানটিতে বালাসনের খর জলস্রোত প্রকাণ্ড এক শিলাখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবৃহৎ ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করিয়াছিল, চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম অথচ গাম্ভীর্য্যময়। কিছুদিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ মদন থিয়েটারে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া "নৃসিংহাবতার" film এর কোন ছবিতে এরূপ এক জলস্রোত মধ্যবর্ত্তী শিলাখণ্ডে তপস্যারত বালক প্রহ্লাদকে আসীন

দেখিয়াছিলাম। স্থানটি দেখিয়া এরূপ প্রীত হইয়াছিলাম যে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও শিলাখণ্ডের উপরে গিয়া আসন পরিগ্রহ করিলাম। "বেশ হইয়াছে বলিয়া" ফটোগ্রাফার বাবু Focus করিতে যাইয়া হতাশভাবে কহিয়া উঠিলেন "বাদলে বিগারেও"—সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি উপর হইতে জমাট বাঁধা কুয়াসা আসিয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিতেছে। শ্রাবণ মাসে ছবি তুলিতে যাওয়াই মূর্খতার কার্য্য বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া উভয়েই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

নামথু হইতে কার্শিয়াং চড়াই পথে ছয় মাইল মাত্র কিন্তু নামথুর নিম্নে বালাসন নদীর উপরে পারাপারের জন্য "ফাড়কে" বাঁশের যে একটি অস্থায়ী পুল ছিল সেটী স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে শিংবালী পুল হইয়া ঘুরাপথে যাত্রা করিতে হইল। সঙ্গের লোকজনদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতদূর ঘুরিতে অসম্মত হইয়া ঐ স্থানেই নদী পার হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, কিন্তু আমি কোন ক্রমেই তাহাদিগের এরূপ দুঃসাহসিক প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কারণ বর্ষাকালে পার্ব্বত্যনদীগুলির স্রোতবেগ এত প্রবল প্রখর হয় যে পদব্রজে সামান্য একটি ক্ষুদ্র জলস্রোতও পার হওয়া বিপজ্জনক। পর্ব্বতশীর্ষে বারিবর্ষণ হওয়ায় মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই উপর হইতে কর্দ্দমাক্ত জলস্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া প্রস্তরময় সৈকতভূমি প্লাবিত করিয়া ভীষণ বেগে নিম্নদিকে ধাবিত হয়। নদীর তৎকালে কি প্রচণ্ড মূর্ত্তি ও গভীর গর্জ্জন! স্বতঃই হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করে। সে জন্যই সঙ্গীগণকে সেই মূঢ়জনোচিত কল্পনা ত্যাগ করিয়া আমাদের অনুগমন করিতে উপদেশ দিলাম।

মারমা চা বাগানের মধ্য দিয়া প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বুংকুং-বস্তিতে আসিয়া পঁহুছিলাম। বস্তির মধ্য দিয়া একটি সরু অপরিসর (এক পায়ে রাস্তা) পথ দিয়া কোন ক্রমে অশ্বারোহণে পুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; পথের উভয় পার্শ্বস্থ বড় এলাচি গাছগুলি দেহস্পর্শ করিতেছিল। বড় এলাচি গাছের সহিত শটী গাছের বিশেষ সাদৃশ্য আছে তবে এলাচি গাছগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা, গাছের পাতাগুলি ঈষৎ কৃষ্ণাভ সবুজ এবং ডাঁটাগুলি কালচে লাল, গাছের গোড়ায় অঙ্কুরের মত লাল লাল বড় এলাচিগুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রবাহযুক্ত ছায়াচ্ছন্ন স্যাঁত্‌সেঁতে জমিতে বড়

এলাচির আবাদ হয়। পূর্ব্বে এলাচির আবাদ খুব লাভজনক ছিল—এলাচির জমির খাজনাও অন্যান্য জমির অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজস্ব বেশী অথচ বাজার মন্দা বলিয়া চাষারা আর পূর্ব্বের মত এলাচি আবাদের জন্য হস্তক্ষেপ স্বীকার করে না, [illegible] এলাচির আবাদ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে বাজারে [illegible] এলাচি দেখা দিলেই মাড়োয়ারী "বাবুগণ" একযোগে প্রচুর পরিমাণ এলাচি ক্রয় করিয়া মজুত করিয়া রাখেন, পরে উহা ত্রিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে কলিকাতায় চালান দিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকেন।

এলাচি ক্ষেতের কিঞ্চিৎ দূরে নদীর যে অংশে উভয় পার সমান উচ্চ এবং বিস্তার অতি অল্প সেই স্থানে যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত স্থূল লৌহরজ্জু সাহায্যে নদীর উপরে একটি লৌহ সেতু (Iron suspension bridge) অতি দক্ষতার সহিত ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ষাভিন্ন অন্যান্য সময়ে লোকজন কোথাও হাঁটিয়া কোথাও বা অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত করিয়া নদী পারাপার হইয়া থাকে কিন্তু বর্ষাকালে ঐরূপ ভাবে পারাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া সরকার হইতে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী ও ঝরণার উপরে এরূপ ঝুলান লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সিংবালী পুল পার হইয়া আমবুটিয়া ও কয়েকটি চাবাগানের মধ্য দিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর সম্মুখে পাংখাবাড়ী রোডে আসিয়া উঠিলাম। সাহেবের বাংলোর পশ্চাদ্ভাগে উন্মুক্ত তরাইএর মনোরম দৃশ্য, বামে দক্ষিণে মুক্ত প্রান্তর, সম্মুখ দিকে কার্শিয়াং টাউনটি বেশ স্তরে স্তরে উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীটির পশ্চাদ্দিক্ দেখিলে মনে হয় যেন কেহ তরাইএর সমতলক্ষেত্র হইতে একটি দেওয়াল গাঁথিয়া তুলিয়া বাড়ীখানিকে সুন্দর ভাবে তাহার উপর বসাইয়া দিয়াছে, চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও সত্যসত্যই অতীব নয়নমনমুগ্ধকর। সাহেব-দিগের গোরস্থান, কাছারী ক্লাব ঘর, গির্জ্জা প্রভৃতি দেখিতে রেলষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ৩নং উর্দ্ধগামী যাত্রী গাড়ীখানি আসিবার বিলম্ব আছে দেখিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ ও চা পান করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম এমন সময় জনৈক বন্ধু আমাকে দেখিতে পাইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর আগ্রহাতিশয্যে সেদিনকার মত দার্জ্জিলিং যাত্রা স্থগিত রাখিয়া তথায় রাত্রিবাস করিতে স্বীকৃত হইলাম। বর্দ্ধমানরোড

হইতে পুলিষ আউটপোষ্টের পিছন দিক দিয়া একটি বাঁধা রাস্তা চড়াই পথে "ডাওহিল" পর্য্যন্ত গিয়াছে, এই প্যাটারসন্ রোডের বামপার্শ্বে কাকিনা রাজবাটীর বিপরীত দিকে সুন্দর একখানা দোতালা বাড়ী ভাড়া লইয়া বন্ধু বাস করিতেছিলেন। বাড়ীর দোতালার বারান্দা হইতে উত্তরদিকে ঘুম পাহাড় হইতে সুদূর টাঁমলিং, পশ্চিমে সুকীয়া পোখরি মিরিক পাহাড় ও তন্নিম্নে অবস্থিত সমতল তরাইএর দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। বাটীখানির চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি ভুটীয়া ও লিম্বুরাই প্রভৃতি জাতীয় লোকের বাস।

ইহার মধ্যে জনৈক লিম্বুজাতীয় ব্যক্তির গৃহ সম্মুখে একটি সুদীর্ঘ বংশ দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার গায় মন্ত্র লেখা একখানি বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া দিয়া ২।৩ জন গেরুয়া আলখেল্লাধারী মুণ্ডিত মস্তক পুরোহিত গ্রহশান্তি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বংশ দণ্ডটির নিকটে রেকাবীতে করিয়া কিঞ্চিৎ মাংস ও কয়েক বোতল মদ্য রক্ষা করিয়া গৃহ-স্বামিনী পুত্র কন্যার সহিত উত্তমবেশে সজ্জিত হইয়া বসিয়াছিল এবং পুরোহিতগণের সহিত মাঝে মাঝে বংশ দণ্ডটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ললাটে ভূমিস্পর্শ করতঃ প্রণাম করিতেছিল। পুরোহিত-গণ কখন "নমাজ" পড়ার মত উঠা বসা করিতেছিলেন কখন বা ঝাঁজ ও গম্ভীর আওয়াজ যুক্ত ঢাক বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন।

দীর্ঘ পথশ্রমের পর রাত্রিতে একটু শান্তিতে নিদ্রা সুখ উপভোগ করিব আশা করিয়াছিলাম কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ গ্রহশান্তি ব্যাপার নিশা সমাগমে এরূপ গুরুতর রূপ ধারণ করিল যে ঘন ঘন মন্ত্রোচ্চারণ ঝাঁজের তীব্র "ঝাঁন্ ঝান্„ আওয়াজ এবং ঢাকের গভীর "ধুম্ ধুম্„ শব্দে কার সাধ্য চক্ষু মুদ্রিত করে! প্রাতে চা-পান কালে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা ভাই, তুমি এখানে থাক কি করে, এরূপ ঘন ঘন গ্রহশান্তি করেই হয়েচে আর কি?„

তদুত্তরে তিনি হাসিয়া কহিলেন "সারা রাত্রি ঘুমুতে পার নি বুঝি! প্রথম প্রথম আমারও বড় বিরক্তি বোধ হ'ত কিন্তু এখন অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছি আর আগের মত তেমন অসুবিধা বোধ করি না। বেশী ঘন ঘন অবশ্য হয় না, কিন্তু কা'রও ব্যারাম পীড়া হ'লে তখন এক নাগাড়ে প্রায় দু'তিন দিন পর্য্যন্ত এ দিক্‌দারি সহ্য ক'রতে হয়। এদের পুরোত এই "বিজুয়া„ গুলো এমনি বারমাস লোকের বাড়ী বাড়ী যেয়ে নেচে গান শুনিয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়, কিন্তু কারও ব্যারাম পীড়া হ'লে তখন ভারী মাতব্বরের মত এসে ভূত তাড়াতে বসে যায়—

দে'খ্‌ছ না পূজার ঘটা কি? আবার যেমনি দেবতা, তেমনি পূজারী, দু'য়ের কেউ অসন্তুষ্ট হলেই বিপদ। এদের বিশ্বাস যে "বিজুয়া„ যদি বাড়ী থেকে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায় বা কোন কারণে কুপিত হ'য়ে শাপ দেয় তা'হলেই গৃহস্বামীর ভিটেয় ঘুঘু চ'ড়্‌বে। সুতরাং এরাও একপ্রকার অপদেবতা বিশেষ। এদের পুরো'ত্তও আবার "বইদাং, ফেদাং, দামি, বিজু' প্রভৃতি অনেক রকমের আছে, কেউ বা ভূত ঝেড়ে ব্যাম সারায়, কেউ বা মন্ত্র পড়ে, গণা পড়া করে, ভূত আনিয়ে আশীর্ব্বাদ করায় কেউ বা ভূত চালান দেয়, কেউ বা ভূত নামায়। যা কিছু অশুভ ঘটে সমস্তই এরা দুষ্ট যোনির কার্য্য অথবা কোন দেবতা বিশেষের ক্রোধজনিত মনে করে, এবং এ জন্যই কথায় কথায় এরূপ গ্রহশান্তির ব্যবস্থা। আমাদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ ঠাকুররা আগের কালে বজ্জায় খেয়েই কাল কাটাতেন একটা বিশেষ কোন পেশা ছিল না, পরে ভবিষ্যতের সংস্থান জন্য এই যত সব "চুঙাই পূজা, কুলোই পূজা, পঞ্চমী চতুর্দ্দশী„ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে সকল ব্যাপারেই ঠাকুরদের প্রাপ্তি, এও বোধ হয় ঠিক তাই কেবল পেশাহীন লামাগণের উপজীবিকার সংস্থান জন্য পদে পদে আপদ শান্তির ব্যবস্থা। আমি উত্তর করিলাম যে তবুও ত এই রকম বিশ্বাস থাকার জন্য লোকগুলো গ্রহশান্তি আপদ শান্তি ক'রেই মনে মনে কতটা শান্তি বোধ করে হয়ত অনেক সময় মনের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাম পীড়াও ভাল হয়ে যায়। "Mesmerism„ ক'রে ব্যারাম সারায় একথা যদি বিশ্বাস কর তবে এটাও ত এক রকম Mesmerism! আর নাস্তিক হওয়ার চেয়ে আস্তিক হওয়া ভাল, কারণ আস্তিক নৌকার নঙ্গরের মত একটা কিছু ধরে থাকে এবং আপদে বিপদে সে সেই আশ্রয়ের আশায় নাস্তিকের মত এলিয়ে পড়ে না। নাস্তিকের পরিণাম বড়ই শোচনীয় কারণ তার কাছে "Life a nothing god a nothing" জীবনটাও কিছুনা, ঈশ্বরও কিছু না, পরে সে নিজেও একটা "কিছু নাতে পরিণত হয়ে এই সংসার সমুদ্রে শুধু হাবু ডুবু খেতে থাকে When these drive the distracted human unit to make of himself a nothing, temporary insanity covers up his plunge into the infinite with an untruthful pleasantness", আবার হয় ত মরণের তীরে দাঁড়িয়ে চঞ্চল ব্যাকুল চিত্তে বলে উঠে "Oh God! if there is any, God, bless my Soul, if there is any Soul" সারাটা জীবন তর্ক করে সকল উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে

সে কর্ণধারবিহীন তরণীর মত একবার এদিক ওদিক করতে থাকে কিন্তু কোন দিকই তার ভাগ্যে হয় না। বিশ্বাস ভিন্ন ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া„ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ„। এরা যা হয় একটা বিশ্বাস নিয়ে আছে, সেই বিশ্বাসের বলে মনে করে যে এ গ্রহ শান্তি করলে এ দুঃখ যাবে, ও ভূত পূজা করলে বিপদ কাটে। "সকল দর্শনকারেরই মতে সংসার দুঃখের আলয় এবং সকল দর্শনই দুঃখবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।" যখন ইহাতে দুঃখ দূরের ব্যবস্থা আছে তখন এদের ভূতুড়ে শাস্ত্রটাকে একটা দর্শন মনে করলে আপত্তি কি—"নিঃশ্রেয়সম্ আত্যান্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি ?" তবে একথা স্বীকার করি যে এদের প্রণালী ঠিক সত্য নির্ণয়ের প্রণালী নহে এবং এরা ভ্রান্ত পথে চল্‌ছে, কিন্তু তাই বলে সব ছেড়ে ছুঁড়ে না দিয়ে সত্যের অনুসন্ধানে ঘুরলে কোন না কোন সময়ে এরা আলোচনা ও চর্চ্চার ফলে সত্য পথ খুঁজে পাবে।„ বন্ধু হাসিয়া কহিলেন "তা হলে সত্য পথ কাকে বলে? তোমার মতে যেটা সত্য পথ, অন্যে হয়ত সেটা সত্য পথ স্বীকার করবে না, আবার তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রদর্শিত পথটাকে উড়িয়ে দেবে! সুতরাং কোনটাকে সত্য পথ বলবে "কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তস্ততোঽন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ„।

আমি বলিলাম "এ ভাল কথা, কোনটা ঠিক তারই যদি ঠিক না থাকে, তবে যার যা আছে তার তাই নিয়ে থাকা ভাল যেটা খারাপ তারটা খারাপ এও বলা অনুচিত। গীতায় আছে স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ। সকলেরই এই মহাবাক্য মেনে চলা উচিত।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

পণ প্রথা

১

কোথা থেকে পড়্‌ল্ কথন
শনির এ বিষদৃষ্টি,—
শ্যামল দেশের বুকটা জুড়ে
ঝরে আগুন-বৃষ্টি।
রাহু যে আজ শ্বাসে শ্বাসে
তুল্‌চে চাঁদে আপন-গ্রাসে,
রুদ্রেরি কি জ্বল্‌ল নয়ন
করতে বিলোপ সৃষ্টি ?

২

নিশ্বাসে যার মানুষ মরে
সে গাছ মেলে পাতা ;
আকাশ ব্যেপে পাপের সৌধ
উঠায় জোরে মাথা।
দিতে কোমল-প্রাণে ব্যথা
কে গড়েছে এ পণ প্রথা,
সমাজ-স্বর্গে এনেছে কে
নরকজ্বালার রিষ্টি ?

শ্রীচণ্ডী চরণ মিত্র।

ও-পারের মেয়ে।

—:o:—

ছেলে বেলা থেকে আমি ঐ রকম। যেখানে বসে পড়তাম সেইখানে আমার সারা দুপুরটি কেটে সন্ধ্যা হয়ে আসতো, মাথার সুঁষা গাছের গোড়ায় রাঙা চোখে ঢুলে পড়তো, তবু আমার সাড় ভাঙতো না। মা বকতেন, বাবা পড়ার জন্যে মেরে মেরে হাড় কালি করতেন, স্কুলে যমদূতের দোসর মাষ্টারের দল আমায় সোজা করবার আশায় কোন শাস্তিই বাকি রাখে নি। ঘরে ভয়, বাইরে ভয়, তাড়না লাঞ্ছনার অবধি নেই। তবু কি আমার এ রোগ গেল?

তোমরা সংসার কর, গণ্ডগোল কর, ছুটোছুটি হাসি কান্নায় কতই না সুখ পাও। আমিও তা কিছু কিছু পাই, আমিও তো রক্ত মাংসের মানুষ; আমারও তো মন-পাখী ডানা মেলে সুখের সন্ধানে উড়ে যায়, ভাব-সমুদ্দুর হৃদয়-আকাশে আশার চাঁদ দেখে ফুলে ফেঁপে উথলে ওঠে, প্রাণ-যমুনা আকুল টানে উজান বয়। কিন্তু তোমাদের মত আমার একটা জগৎ নিয়েই তো কারবার নয়। একটা নিয়ে তোমরা উদ্ব্যস্ত, আমার যে কতগুলো?

তবে শোন। শুনলে তো তোমরা বল্‌বে এ আমার কল্পনা, এ আমার পাগল খেয়ালের দিবা স্বপ্ন। কিন্তু সজ্ঞানে জাগা চোখে দিনের পর দিন যা দেখি, আমার অন্তর সোপান দিয়ে নেমে এসে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় যারা এমন করে আমার আপন যে মিথ্যে তা বলি কি করে? তোমার তারা, মায়ের আদর কি মিথ্যে? তোমার বিয়ের দিনের সানাই রসনচৌকী লোক লস্কর কি মিথ্যে! আমার খোকার মরা মুখ, তাই বুকে করে আমার আফিস করা, কি মিথ্যে? তোমার কোলজোড়া মাণিক, তার আধ আধ বুলি, সে কি মিথ্যে?

(২)

আমার সে জগৎও যে ঠিক এমনি সত্যিকার দেখা জিনিস, এর চেয়েও, যে উজ্জ্বল, প্রকট সহজ, জাগ্রত। সে সৃষ্টি এলে এ সবুজ ঘাসপাতা এ আকাশ বাতাস, কেমন যেন ছায়া ছায়া হয়ে যায়, রবির এত প্রখর আলো গ্রহণের মরা আলোর মত ম্যাড় ম্যাড় করে। সে জগৎ

এসে এরই কোলে সেটা হয় সত্যি, এটা হয় স্বপ্ন; অথবা সেটা হয় এর কোমল তরল খাঁটি ভাবরূপ, এটা হয় তার মোটা স্থূল মলিন বস্তুজ বিকৃতি।

তবে গোড়া থেকে বলি। খোকা আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে প্রথম প্রথম শুধু আলসে আনমনে বসে থাকতাম; আমার কি জানি কেন শুধু শুধু চোখের পাতা জুড়ে ঘুম আসতো। সে কিন্তু এ রকম ঘুম নয়; এ ঘুম ভারী, সে খুব হালকা; এ ঘুম অজ্ঞান, সে খুব সজ্ঞান; এ ঘুম সৃষ্টি হয় আপনভোলা আলস্য তন্দ্রা থেকে অবুঝের ঘোর, সে ঘুমে দৃষ্টি হয় জাগা দেখার চেয়েও হাজার গুণ সতেজ স্পষ্ট, নির্মল ও জ্ঞানময়।

এই সৃষ্টিজোড়া ঘুম যতই ঘুমাই ততই আমার মন বুদ্ধি দেহ প্রাণ যেন খুব একটা বিরাট ফাঁকার মাঝে ছাড়া পায়। সে কি সুখ, কি মুক্তি, কি বেপরোয়া সাঁতার; কোনও দিকে কূল নাই এমনতর জোছনায় মাঝে নদী খুলে পাল তুলে ভেসে পড়লে যেমনটি হয় এ যেন সেই রকম। এখানে যেন আনন্দ যাত্রীর শ্রান্তি নেই, পাওয়ার শেষ নাই, এখানকার সাধ যেন তৃপ্তির কোলের খোকা, এখানকার মিলন যেন সোহাগের বুকের মাণিক।

এক দিন আমার কপাল ফেটে একটা চোখ বেরুলো। সত্যিকার চোখ নয় কিন্তু তবু একটা অপলক চাহনি অন্তরের নিবিড় থেকে আর কোথাকার নিবিড়ে যার পরিপূর্ণ দেখা, আনন্দের পরশে যার সাথে বস্তুর মর্ম্মভরা পরিচয়, কি এক একাত্ম রস-মাধুরীতে যা' দিয়ে সব কিছু আস্বাদন করা। সেই চোখের কোল ভরে সেই থেকে দিন নেই রাত নেই, আমার এই নতুন জগৎগুলি আনা যাওয়া করে।

সে জগতে শুধু আলো আর আলো, ছন্দ আর ছন্দ, রূপ আর রূপ। সেখানকার যা কিছু সব যেন নবনীর মত নরম ঘন থলো থলো চাঁদের কিরণে গড়া, বড়ই পরশ-নিবিড়। কোনো জগতে আবার যেন সবই সোনালী রোদের গড়া তবু কতই স্নিগ্ধ, কতই কোমল, কতই লাবণ্যময়। সেখানে যে সব রঙ খেলে যায় তার নাম মানুষের ভাষায় নেই, সে রঙের সবুজ নীল রক্ত পীত আভা মন্ত্রের শক্তি ধরে, স্পর্শে তাদের জীবনের ঢেউ কোথা হতে ছুলে ছুলে তোমার মাঝে উথলে আসে।

একদিন একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল, সে সেই সোণালী কিরণের দেশের মানুষ। দেখে মনে হ'লো জগতের সব লাবণী তার মাঝে থৈ থৈ করছে, পরণের কাপড়ে পাটেপাটে তার

বিদ্যুৎ ঘুমাচ্ছে, নড়তে চড়তে তার অঙ্গ থেকে আমার সত্তার মাঝে ঝলকে ঝলকে রসের শিহর আসছে।

ঊর্দ্ধে অতি ঊর্দ্ধে কোন সত্তার কল্প লোকের এই ছবি ভাসে আসে ফিরে যায়। তার উদয়েও আমার মন প্রাণ চিত্তের কোনোখানে যখনি ঢেউ ওঠে, কামনা দোলে, ক্ষুধা জাগে, তখনি এ রসমধুর কল্পলোকের দুয়ার পড়ে যায়, আমরা চোখে আবার এই মোটা দুনিয়া সত্যি হয়ে ওঠে।

চেয়ে না দেখলে এ মেয়ে মন প্রাণ সমস্ত জ্ঞান জুড়ে জেগে থাকে, নিখুঁৎ হতে নিখুঁৎ হয়, নিকট হতে নিকটে আসে। আবার ভাল করে দেখবার আঁকুপাঁকু এলে এ মেয়ে বিদ্যুৎ চমকে সরে যায়। এ বুঝি মৃণ্ময়ী নারীর চিন্ময়ী ধাম, আমার পুরুষের চরম শুদ্ধির গঙ্গা, পরম শান্তের বুঝি এ সার্থক অকাম পুত্তলী।

শিব যখন ধ্যানমগ্ন তখন এই বুঝি তার পার্ব্বতী; কাম যখন শিবকোপে ভস্মশেষ তখন এই বুঝি তার রতি; নারায়ণ যখন শেষনাগের কোলে অনন্ত শয্যায় চিরবিশ্রামে তখন এই বুঝি তাঁর বৈকুণ্ঠেশ্বরী।

সে মেয়ে যখন সার্থক সকল স্বপ্নের মত আমার নয়নপথে ভেসে ওঠে তখন তার চাহনীতে ফুরে জগতের যত ভাষার অর্থ, এপর্য্যন্ত যে কেউ আদর করে যাকেই যা বলে সে যেন এক পলকে সে সবই আমার বলে যায়। সে দাঁড়ায় এসে আমায় যেন বুকের পদ্মদলের মাঝে অন্তরতম হয়ে বিশ্বের সকল রকম মিলনকে মধুরতায় পরাজিত করে। সে কণ্ঠস্বরে সেই জগতের সোনালী আকাশ মুখর করে তুলে কত যে গীতের রাগিণী, কত যে যন্ত্রের সুর, কত বাতাসের সর্ সর্ নদীর ছলছল রহস্য।

কিন্তু এমন করে পেয়েও তাকে আজও আমার পাওয়া হয় নি। এ জগতে এবং সেজগতে যতখানি ব্যবধান ও দূরত্ব তার মাঝে আমার মাঝেও ততখানি দূরত্ব। এ জগত যখন দিবা সুরে সুরে বেঁধে সেই জগতে হবে তখনই সে আমার হবে। এখনও সে এলে আমি আর আমাতে থাকি নে, রিম ঝিম আনন্দের লহরে দুলতে দুলতে সে আসে নেমে আর আমি যাই উঠে। সে আমার মুক্তির দেবতা, মর্ত্ত্য ও বৈকুণ্ঠের মাঝের স্বর্ণসেতু, আমার ভগবানের রূপ নেবার ডাক।

যখন উদয়াচলে ঢল ঢল কাঁচা সোণার নব ভানুর মত এই শান্ত অকাম অগত আমার চেতনায় দুলে তখন আমি যেন তার সাথে চড়া তারে সুর বেঁধে যাই। চার পাশে অনেক দিনের চেনা এই বাড়ী ঘর কেয়াবন পুকুর ঘাট গোয়াল গাদা লাউ মাচা যেন তাদের প্রকৃতি বদলাতে বদলাতে ঐ অন্তর সুরে সুর বেঁধে জমাট হয়ে আসে সারা সংসার মনে হয় কি এক রসঘন একাত্মতায় অন্তরঙ্গ, সব কিছু হয় যেন ঐ অনুপমা মেয়ের হাতছানি, তার তনুসাগরের রস-তরঙ্গ। ওপর থেকে গম্ভীর গম্ভীর শান্ত বিপুল স্বরে ভেসে আসে, "তোমার মাঝে ময়লা মাটি সব যখন ধুয়ে যাবে তখন এই ঊর্দ্ধের সত্তা নীচে এসে তোমারি পায়ের তলে দাঁড়াবে; তুমি হবে সে কল্যাণলোকের শিব, সে আনন্দধামের পুরুষোত্তম।"

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

প্রকৃতির গান।

:—:

(এমার্সন্)

রাত্রি দিবস সমীরস্তর অন্তরীক্ষ ব্যোম
সকলি আমার—এ অনাদিকাল উজ্জ্বল রবি সোম।
সৌর কিরণে লুকাইয়া থাকি, গানের সুরেতে মূক,
উর্ম্মিগর্ভে উপধা বিছায়ে লভি সুপ্তির সুখ।
গণনায় শেষ হয় না আমার সংখ্যা অঙ্ক রাশি—
পারে না পূরিতে আমার নিলয় কোন' জাতি অধিবাসী।
জীবনোৎসের উজ্জ্বল কূলে আছি আমি চিরদিন
আমিই আবার প্রলয় প্লাবনে করে দি' সকলি লীন;'

যুগ যুগ ধরি এ মানব জাতি হ'তে চুনি' কত ফুল
গেঁথে দিই আমি মালা অপূর্ব্ব শোভায় অসমতুল ;
হাজার হাজার নিদাঘে আমার যে ফল পক্ক হয়
কখন কখন ধরণীর জীব পায় তার পরিচয়।
অতীত লিখেছি পাষাণের বুকে অগ্নির অক্ষরে—
প্রবাল-দ্বীপেতে প্রাসাদ আমার ভস্মভিত্তি 'পরে।
উল্কা ও গ্রহমণ্ডল হ'তে আহরিয়া উপাদান
পুরাণোরে ল'য়ে নূতন করিয়া গড়ি এ পৃথিবীখান।
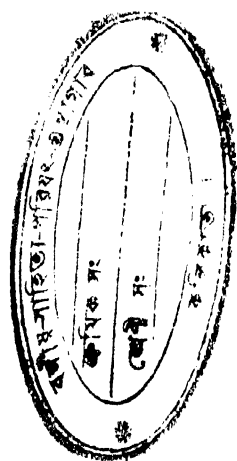
একদা দেবতা ছিল উদাসীন তারাফুলহারে সাজি
সরীসৃপের মতন খর্ব্ব বলহীন দেখিয়াছি ;
কাল আর জ্ঞান আমিন্, করিছে আদেশের অবধান
সাগর শুকায়ে, বেলা-পলি লয়ে গড়িছে কত না প্রাণ ;
আসে মাঝে মাঝে আমার পুত্র, ঠাঁরে না সে কারো বাসে
ইন্দ্রধনুতে পথ দেখি চলে, অস্ত-তপনে হাসে।
আমার আলোক চিরপ্রোজ্জ্বল—যে আলোকে গ্রহ ঘুরে,
পুত্র আমার সবার উচ্চে, গ্রহমণ্ডলচূড়ে।
সময়ের স্রোত বহে সদা মোর, ঘুমায় না কভু বায়ু
অরুণের রথ থামিবে না কভু, কমিবে না কারু আয়ু।
চিরদিন কত র'ব সজ্জিত ? তাই ত' ক্ষণিক এত
ইন্দ্রধনু ও তুষার, পর্ণ, প্রপাত, বর্ণ যত।
এত বহু জাতি, বিপুল মেদিনী লয়েও একাকী আমি—
সকল সুষমা সঙ্গীত এবে বিস্বাদ বিনা স্বামী !

তাঁর তরে মোর এত আয়োজন, সৃষ্টিও মোর তাই,
হাজার হাজার আসে তাঁর দূত—শুধু তাঁর দেখা নাই।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দেশী দিয়াশলাইয়ের কারখানা

সেদিন একটি দিয়াশলাইয়ের কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। কারখানাটি ঢাকা সহর হইতে ১০ মাইল দূরে ধলেশ্বরী নদীর তীরে রাজফুলবাড়ীয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। কারখানা বলিলে আমাদের মনে সাধারণতঃ যে বিরাট অট্টালিকা প্রচুর মজুর জটিল কলকব্জার ইত্যাদির কথা মনে জাগিয়া উঠে এখানে তাহার কিছুই নাই। একজন ধনী লোকের বাহির বাড়ীতে একখানা সাধারণ টীনের ঘরের মধ্যে কারখানার সকল কাজ হয়। বাহিরের জাঁকজমক কিছুই নাই।

এখানে মহেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত ৩টী কলে কাজ হইতেছে। কলগুলি খুব সাদাসিধা ধরণের—কোনও জটিলতা নাই। দিয়াশলাইর বাক্স ও কাঠি কলেই কাটা হয়। কল চালাইতে হয় হাতে। ১৫।১৬ বৎসর বয়সের বালকগণই সকল কাজ করিতেছে। কল বিগড়াইলে স্থানীয় লোহার মিস্ত্রীই তাহা মেরামত করিতে পারে বলিয়া মনে হয়।

এই কারখানায় বাক্সের জন্য স্থানীয় কদম কাঠ ও কাঠির জন্য দেবদারু কাঠ ব্যবহৃত হইতেছে। দেবদারু কাঠ মানিকগঞ্জের দিক হইতে আনিতে হয়। কাঠির জন্য স্থানীয় কাঠের যোগান না হওয়াতে এই কারখানার মালিক একটু অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।

কাঠিতে প্যারাফিন্ ও বারুদ লাগানো, বাক্সে কাঠি ভরা এবং বাক্সে লেবেল লাগানো ইত্যাদি অন্যান্য সকল কাজই হাতে করা হয়। কারখানায় প্রায় ১৮ জন বালক ও যুবক কাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ মাসিক মাহিনা লইয়া কাজ করে এবং কেহ কেহ কাজের উপরি মজুরী পায়। সকল জাতের লোকই পাশাপাশি কাজ করিতেছে।

পল্লীগ্রামে তজ্জন্য কোন আপত্তি উঠে নাই। বাক্সের লেবেল লাগানোর কাজ কারখানার চারিদিকের গৃহস্থের বিধবাগণই করিয়া থাকেন। শুনিলাম এক এক জন বিধবা এই লেবেল লাগানোর কাজ করিয়া মাসে প্রায় ৫ পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করেন। এই নূতন কুটীর শিল্পের সৃষ্টিতে পল্লীগ্রামের বেকার সমস্যার কথঞ্চিত মীমাংসা হইয়াছে। গৃহস্থালীর আসরে গল্প করিতে করিতে যে অর্থোপার্জ্জন করা চলে তাহা অন্ততঃ এই গ্রামের ললনাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই কারখানায় তৈয়ারী দিয়াশলাই একটী এক পয়সা অথবা ডজন তিন আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বাজারে বিদেশী দিয়াশলাই ৩টী দু'পয়সায় বিক্রয় হয়। এখানকার দিয়াশলাই দেখিতেও বেশ সুন্দর এবং জ্বলেও ভাল। তবে ম্যানেজার বলিলেন যে তাঁহারা এখনো দিয়াশলাই সম্পূর্ণ Damp Proof করিতে পারেন নাই। এই দিয়াশলাই রাত্রে ৩৪ ঘণ্টা বাহিরে হিমের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার জ্বলিবার ক্ষমতা নষ্ট হয় না, কিন্তু বর্ষাকালে একটু মুস্কিলে পড়িতে হয়। কারখানার কর্ম্মকর্ত্তাগণ দিয়াশলাইয়ের উপরের লেবেলটী সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর করিবার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

বিদেশী দিয়াশলাই আমাদের সকল বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আমাদিগের নিকট সংরক্ষণের সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমরা হেলায় তাহা হারাইয়াছি। জাপান সেই সুবর্ণ সুযোগে ভারতের বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে। এক দিয়াশলাই আমদানির বহর দেখিলেই বুঝা যায় আমরা কতদূর পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। গত কয়েক বৎসরে এক বাঙ্গলা দেশেই কত টাকার দিয়াশলাই আমদানি হইয়াছে তাহা একবার দেখুন—

১৯১০—১১	খৃষ্টাব্দে	২২,৬৭,৮২৯	টাকার
১৯১১—১২	„	২৬,২৯,৬১৫	„
১৯১২—১৩	„	২৮,৯০,৭৯০	„
১৯১৩—১৪	„	২৮,২৩,১৩২	„
১৯১৪—১৫	„	৩০,১০,৮৯০	„

১৯১৫—১৬	"	৩৭,৮৮,৭৯০	"
১৯১৬—১৭	"	৫৫,৪৮, ৮৬	"
১৯১৭—১৮	"	৬১,১১,০২৭	"
১৯১৮—১৯	"	৪৭,৭৩,১৭৬	"
১৯১৯—২০	"	৪৭,৮২,৮৮১	"

এই যে জলের মত টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে ইহার শতাংশের এক অংশও যদি নবপ্রতিষ্ঠিত দিয়াশালাইএর কারখানাগুলির জন্য দেশে থাকিয়া যায় তাহা হইলে ইহাদের সৃষ্টির সার্থকতা আছে স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

মরণ আড়াল।

-:*:-

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনেক রাত্রে আমাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তথাপি ভোর হইতে না হইতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনটা কেমন অশান্ত, আতঙ্কিত হইয়াছিল, নিদ্রায় কেবল দেখিয়াছি স্বপ্ন, কত কি ভয়াবহ দৃশ্য! মন হইতে কিছুতেই দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না একটা বিধাতাব একটা আশঙ্কা! সত্যই কি আবার আমার এজীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে! সেও কি কখনও সম্ভব? জীবনের সকল আশা, মনুষ্যোচিত সকল আকাঙ্ক্ষাই যে বিধাতার এক দিনের নির্ম্মম তাড়নে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্গঠন যে এক প্রকার অসম্ভব! সে যে আশা নয়—দুরাশা! হউক দুরাশা, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া আমাকে আবার জীবন-নদে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে,—হউক দুর্ব্বার বিপদ সঙ্কুল সে নদ-প্রবাহ—তাহাই হইবে আমার দুঃসহ স্মৃতি ছাড়া জীবনের উপযুক্ত ক্ষেত্র—ভাসিয়া যাই

সেও ভাল—মৃত্যু আমাকে গ্রাস করে যদি সেও সুখের—এ দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন অপেক্ষা! আর যে পারি না। পরপদলেহী, পরাধীন জীবন একবারে অসহ্য,—মানাবাস্থায় স্বাধীন মনোভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কি করিয়া আর আত্মজ্ঞানহীন পরমুখাপেক্ষী পশুর মত পরের অঙ্গুলী হেলনে চলাফেরা করা যায়! যদি তাহাই হইবে তবে জেল হইতে কেন পলায়ন করিয়াছি—নব জীবনই যদি লাভ না করিতে পারিলাম তবে জেল আর বাহিরে তফাৎ রহিল কি! বিপদ পদে পদে—আত্মপ্রকাশের আমার উপায় নাই,—স্বাধীনতা প্রকাশ্যে বরণ করিয়া লইবার আমার পথ নাই,—জেল আমার জীবনকে অধীন জাতির মত এমনি ভাবে বঞ্চিত বিদলিত করিয়াছে,—বিধাতারও ন্যায্য অধিকার, মানুষের মানুষ হইবার প্রবৃত্তিকেও প্রাণ দিতে আমি অপারগ,—সে চেষ্টাও আমার পক্ষে নাকি দোষাবহ—অপরাধের!

এত দিন অপরাধীর জীবন যাপন করিয়াছি তখন আবার নব অপরাধ করিবার জন্য প্রাণ মন মাতিয়া উঠিয়াছে—অপরাধ নয় ত কি! জীবনের উদ্দামবেগ সমাজের শৃঙ্খলে—নিয়মের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে না পারা ত সকলের চক্ষেই যে মহা অপরাধ—সেই মহা অপরাধ করিবার জনাই আমার হৃদয়ের রক্ত টক্‌বক্ করিয়া তখন ফুটিতেছিল—যে দৃশ্য গত রাত্রে দেখিয়াছি,—অমন ভাবে বন্ধুর অকাল মৃত্যু—আত্মহত্যা—সে ব্যাধির মূল কোথায় আমাকে দেখিতেই হইবে—সে পাপাঙ্কুর উন্মূলিত করিতে হইবে,—সমাজের একটি কলঙ্ক বীজও বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইলে বুঝিব—এ অধম জীবন কিয়ৎ পরিমাণে সর্থক।

ভবিষ্যতের কথা পরে, বর্ত্তমানের চিন্তা আমাকে তখন অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। প্রভাত ত হইয়া আসিল,—আর একটু পরেই কি একটা গণ্ডগোল এ বাড়ীতে বাধিয়া যাইবে। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াইবে কে জানে। কে বলিতে পারে প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইবে না—বরং সেই আশঙ্কাই ষোল আনা! জেল কয়েদীর অপঘাত মৃত্যু এত সহজে মিটমাট হইবার নয়,—গলায় রশি বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িলেই তাহার পশুজন্ম ঘুঁচিবার নয়,—কত পরখ পরীক্ষা, প্রমাণ পরিচয়ে প্রেতের পিণ্ডিচটকাইয়া যদি তার উদ্ধার হয়—সে উদ্ধার অনায়াসলভ্য নয় আদবেই,—মৃতের ব্যক্তিত্বে কোন প্রকারে কাহারও একটু সন্দেহ হইলেই আমার মহা বিপদ—ডাক্তারের সকল কৌশল পণ্ড—বৃথা আমার এ মরণ আড়াল! হায়, হায়,—ইহা অপেক্ষা বরং এ বাড়ী হইতে পলায়ন করাও ছিল ভাল! কথাটা মনে

উঠিতেই শয্যাত্যাগ করিয়া যন্ত্রচালিত পুতুলের মত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই সেই উদ্যান—সেই লতাবিতান—এই না এই রাত্রেই তাহারা দুইজনে কত স্নেহভরে ঐখানে ব[illegible] [illegible] বসিয়াছিল—এখন কোথায় তাহারা?—তাহাদের একজনের প্রাণহীন দেহ ওই উদ্যানেরই এক বৃক্ষ শাখায় ঝুলিতেছে,—সেই উপকারী বন্ধুকে হেয় কয়েদীর বেশ নিজে হাতে পরাইয়া আমি না নিজে নিরাপদ হইতে প্রয়াস পাইয়াছি। বারো ঘণ্টা এখনও অতীত হয় নাই! যে অকাতরে স্বেচ্ছায় আপনায় দিয়া তাহাকে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত করিতে চাহিতেছিল, হায়! তাহার কত উৎসাহ কত তেজ—তাহারই এই পরিণাম—আমি ত বিপদে ডুবিয়া আছি আমার আর ভরসা কোথায়! আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম—আর তথায় দাঁড়াইতে পারিলাম না,—ছুটিয়া শয্যাকক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলাম। দেখি আমার শূন্য শয্যাপার্শ্বে ডাক্তার দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ভাল—এই যে তুমি,—শয্যা শূন্য দেখিয়া একবার আমার মনে হয়েছিল—তুমি বুঝি উড়েছ—পিঁজরে-ছাড়া পাখী কি না—সে সন্দেহটা আপনি আসে! আবার ভাবলেম—না—সে কি এতই বেকুব হবে—এত সুযোগ সুবিধে পায়ে ঠেলে চলে যাবে—সে ছেলে সে নয়, সত্যিই দেখ্‌ছি তাই আমার মনের মত ছেলেটি তুমি! ভাল, রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল ত?" নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন "আমি নিশ্চয় বলতে পারি কালকার দুর্ঘটনা তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারে নি—বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুর্ঘটনাগুলোকে জাগ্রত হয়ে দুঃস্বপ্নের মত মন হতে তখনি মুছে ফেলে দিতে দেরী করে না—যেটা পরের—যে ঘটনাটুকুর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বপ্নের নিশের মত অলীক—তার আলোচনায় ফল! পরের বিষয়ে মাথা ঘামানোর চাইতে নিজের চরকায় ততক্ষণ তৈল দিলে অনেক উপকার,—সত্যি নয় কি?"

আমি কথায় কোন উত্তর না দিয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলাম।

বৃদ্ধ বলিল—"এক দিনে চুল পাকে নি—অনেক দেখেছি,—অনেক ঠেকেছি—ঠেকে শিখতেও হয়েছে অনেক। বুড়োর কথা মত ক'টা দিন চলে দেখ ত বাপু, তোমার ভাল না মন্দ হয়। বুঝতেই ত পারছ তোমাকে বাঁচাতে যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে চাইছি

সেটা বড় সহজ নয়, কিন্তু সাবধানে আমরা চলি যদি এমন কিছু কঠিনও নয়—কেবল চাই দেখে শুনে ভেবে চিন্তে বুঝে চলা। যা বলি ঠিক তেমনি ভাবে চল ত বাপু—বিপদ তোমার দ'হাত দূরেও দেখা দিতে পারবে না, কেমন ?"

বিনীত ভাবে বলিলাম—"সে ত বলেছিই আপনিই আমার এখন একমাত্র নির্ভর।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"একথা যেন মনে সর্ব্বদা থাকে বাপু! আজ হতে তুমি আমার সহকারী—নাম তোমার নবকুমার গুপ্ত। কি নাম ছিল তোমার ?"

উত্তর করিলাম—"বিনোদ সেন।"

ডাক্তার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"অনুমান কি আমার মিথ্যা হয়, বৈদ্য না হলে কি এত বুদ্ধি! তাল তাল মিলেছে তাল—বিধাতাই যোগান!—বৈদ্যে বৈদ্যে মিলবে ভাল—এক জাত আমরা—বেশ বেশ! নবকুমার ভুলে যাও, এই মুহূর্ত্ত হতে তুমি ছিলে কে—নাম তোমার কি; তুমি বিনোদ নও—নবকুমার—ডাক্তার অ র. গুপ্তের এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী—বুঝলে,—মনে থাকবে ত—ভুললেই বিপদ।"

ইনিই তবে সুপ্রসিদ্ধ আর, গুপ্ত—যাঁহার এত নাম—বিধাতার কাণ্ড দেখ—আমি হইতে চলিয়াছি তাঁহারই সহকারী।

মনের ভাব চাপিয়া বলিলাম—"বিলক্ষণ! আমি ভুলব ? নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনব! আমি কি বুঝছি নে কি অসীম বিপদ সাগরে আমি ডুবে আছি—এ হতে উদ্ধার হতে পারি যদি আপনার কৃপায়।"

তিনি আমার বাক্যে খুসি হইয়া বলিলেন—"ঠিক ঠিক! হাঙ্গামাটা ত কম নয়, তা ভয় করো না বাপু—দশের উপর আমার যতটা প্রতিপত্তি—তাতে আমার পক্ষে এটা তেমন কিছু বড় কাজ নয়—তবু হওয়া চাই পূর্ব্ব হতেই সাবধান—সাবধানের মার নাই, বুঝলে ?"

বলিলাম "যে আজ্ঞা!"

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন "আজ্ঞা করবার অনেক আছে, অনেক কথা তোমায় বলবার আছে, শুনতে হবেও অনেক—বলতে গেলে তোমাতে আমাতে পরিচয়ই হয় নি—আমাদের কারও পূর্ব্বজীবন কারও কাছে অজ্ঞাত থাকলে চলবে না, তোমাকে এক্ষুণি এ বাড়ী পরিত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হচ্ছে। লাসটা নিয়ে হৈচৈ হবে না কম—সে সময় এ বাড়ীতে তোমার অস্তিত্ব

কোন রকমে প্রকাশ পেলে আর কি কিছু চাপা থাকবে—এ সময় দূরে থাকা ঠিক নয় কি? সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছি, চট্‌পট্ এক পেয়ালা চা আর কিছু খেয়ে নাও, সব প্রস্তুত—যত সকালে পার—বুঝেছ—এই আঁধার থাকতে থাকতে যত গোপনে সম্ভব এ বাড়ী তোমাকে ত্যাগ করতে হবে—বুঝেছ—মনে কিছু ক'র না—বুঝছ ত তুমি সবই—তোমারি ভালর জন্যেই আমার এত কথা—প্রস্তুত হও তা হলে—কোন কষ্ট হবে না তোমার, সেটাও আমার বাড়ী জান আমার অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী সেই বলেই সেখানে প্রকাশ থাকবে—তোমার কি কোন অসুবিধে অনাদর হতে পারে? বলবে তুমি—কলকাতা হতে নিযুক্ত হয়ে এসেছ—খবরদার এ বাড়ীর এ সকল কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। বেশী কথার মধ্যে যেও না—এর পর তোমায় আমি সমস্ত সমঝে দেব—তখন বুঝবে তোমায় আমি কি ভাবে—কতদূর আপনার লোক ভেবে কি পদে প্রতিষ্ঠিত করেছি; আর সময় নাই—তাড়াতাড়ি—খুব তাড়াতাড়ি!"

এখানকার পরিণামটা জানিবার জন্যে মনে যথেষ্ট ঔৎসুক্য থাকিলেও এ সকল হাঙ্গামা হইতে দূরে পলায়ন করিতে আমিও কম ব্যগ্র হইয়াছিলাম না, কে বলিতে পারে কিসে কি হয়—আসলের সাক্ষাৎ পাইলে নকল চলিবে না নিশ্চয়! বলিলাম—"যা বলবেন তাতেই আমি রাজি—আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনি—আপনি জ্ঞানী, আপনার কথামত চলব না? না চল্লে যে আমারি পদে পদে বিপদ—তা কি আমি বুঝি নে? আমি প্রস্তুত—যেখানে বল্‌বেন সেখানেই যাব!"

"ভাল কথা—আর প্রস্তুত; এক্ষুণি তাতে উঠে পড় গিয়ে, খাবার ওতেই দিয়েছি—এক পেয়ালা চা খাবার সময়টুকু পর্য্যন্ত থাকা আর এখানে চলবে না—ফর্সা হয়ে এল,—গোপনে খুব সাবধানে সব সমাধা করতে হবে—এস তা হলে!"

তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,—আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন—"মনে থাকে যেন নবকুমার তুমি নবকুমার ভিন্ন অন্য নও,—আমার এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটরী তুমি,—এত দিন কলকাতার কোথাও কাজ করছিলে,—সেথা হতে নিযুক্ত হয়ে আমার এখানে এসেছ। এই ভাবে সেখানে সব কথা সাবধানে চালাবে,—বুঝেছ! বুদ্ধিমান ছোকরা তুমি, তোমায় আর বেশী কি বলব, খুব সাবধানে কেউ কিছু বুঝতে না পারে

কথাকটা বার বার মনে করে মনে গেঁথে ফেল—কেমন নবকুমার? ভুলবে না মিষ্টর-গুপ্ত—পুরানাম ব্যবহারের দরকার নেই, মিষ্টর-গুপ্ত—এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী অব ডকটর আর, গুপ্ত!

তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অমন সময়েও আমার হাসি পাইল। আমি বলিলাম—'এটা আমি বুঝব না কেন—এ সব প্রকাশ হলে বিপদ আমারি বেশী,—আপনি আমার জন্য এত করছেন—আর আপনার উপদেশ ভুলব আমি—সমস্তই আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে গেছে।'

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "সেইত চাই। তুমি পারবে—তুমি পারবে আমার এই বিপুল কারবার রক্ষা করতে,—আমি অপাত্রে কাজের ভার দেই নি।"

মনে মনে বলিলাম—তা বুঝিব পরে এখন চাই আমার পরিত্রাণ—এ ক্ষেত্রে হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন। মোটরে উঠিয়া বসিলাম। ডাক্তার নিজকে নোয়াইয়া আমার কানের নিকট মুখ লইয়া অতি নিম্ন স্বরে বলিলেন "জানি তুমি ঠিক চলবে তবু বলি খুব সাবধানে বুঝে শুনে চলবে। কটা দিনত আর দেখা হবে না—এ সব মিটুতে হয় ত সপ্তাহ খানেক কেটে যাবে,—নিজের বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করো—এই তোমার পরীক্ষা! বুঝলে।"

একটু থামিয়া,—একবার এদিক ওদিক সন্দেহ-দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া, স্বরটা আরও নামাইয়া বলিলেন—"আরেক কথা—একটা বিষয় —বুঝলে —তোমায় বরাবর সহ্য করতে হবে—সেটা আমার সেক্রেটারীর মেজাজ,—লোক সে মন্দ নয়—মনটা তার বেশ ভাল কিন্তু ছেলে বেলায় ওর মা মারা যান—তাই—একটু বেশ মেজাজী—সেটা তোমায় সইতে হবে নবকুমার—সে ত নাম মাত্র সেক্রেটারী—করতে হবে ত সমস্তই তোমাকেই,—বুঝলে—তোমায় তাকে মানিয়ে নিতে হবে—সে শুধু আমার সেক্রেটারী নয়—ছেলে—একটা কাজে আবদ্ধ রাখতে তাকে—"

এত কথা কেন—আমার বুঝতে আর বাকী রহিল না,—আমি তাঁহার কথা শেষ হইতে অবসর না দিয়াই বলিলাম "আপনার ছেলে যিনি—তিনি হবেন আমার মাননীয় বন্ধু—আপনার ছেলে—তাকে আমি মেনে চলব না—তাই হলে কি করতেম!"

এবারে তিনি সত্যই আত্মহারা হইয়া গোপন অগোপনীয় বিস্মরণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বড় খুসী হলেম—বড় ভাল ছেলে তুমি—জানি তুমি অবস্থা মত ব্যবস্থা করতে পারবে।

আবার স্বর নিম্নে আনিয়া বলিলেন "তবুও বলে দেওয়া ভাল, সাবধানের মার নাই নবকুমার!

তাঁহার ইঙ্গিতে সোফার তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। আবার কোন্ অজ্ঞাত দেশে ছুটিয়া চলিলাম। জীবনটাই তাই, বর্ত্তমানের পর মুহূর্ত্তের সহিত যাহার পরিচয়ের পথ নাই, তাই লইয়া আবার কত ভাবনা—অদৃশ্য-অদৃষ্টের সীমা কোথা?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রায় পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলাম একটি নির্জ্জন মনোরম উপবনে। গাড়ী থামিল—কানন-কুটীর দ্বারে। ফটক-স্তম্ভের গাত্রে শ্বেত-প্রস্তর ফলকে সাজান ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে—"কানন-কুটীর।" সোফার হর্ণের শব্দ করিতেই একজন লোক দৌড়াইয়া আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল। গাড়ী প্রবেশ করিল—অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ধনুকের মত একটা লাল টক্ টকে রাস্তা দিয়া, উভয়পার্শ্বে তার গোলাপবীথি,—সম্মুখেই কানন-কুটীর,—সুন্দর ছোটখাট একখানা দালান—আকাশের নীলের মত তার রং,—পশ্চাতে সবুজ বৃক্ষের সারি—পটে আঁকা ছবির মত। ডাক্তার সৌখিন বটে! এমন সুন্দর সুন্দর তাঁর বাড়ী,—এমন নির্জ্জন স্থানে কেবল আরাম বিরামের সুখের জন্য কম টাকা ঢালেন নাই ত!

গাড়ী থামিবা মাত্র জনৈক প্রৌঢ়া আসিয়া আমাকে বলিলেন "আসুন। রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় নি ত?" সোফারের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভোরে ভোরেই তা হলে তোমরা রওনা হয়েছিলে—সবে সাড়ে সাতটা হয়েছে—ওঁর তা হলে চাটা খাওয়া হয় নি!"

আমি বলিলাম—"বাকি নেই কিছু, ডাক্তার সাহেবের বন্দোবস্তে কিছু বাদ যাবার যো নেই—ওরি মাঝেই......"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"জানি ওঁর ধরণ ধারণ। নেমে আসুন,—রাস্তার যে অবস্থা—জার্কিং ত কম নয়—বিশ্রাম করুন।"

কথাগুলি তিনি এমন সহজ ভাবে বলিলেন—তাহা শুনিয়া কে বলিবে আমাদের সেই প্রথম পরিচয়,—যেন কতকালের জানাশুনা,—তিনি আমার সম্বন্ধে এমন ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন—আমি যে তাঁহাকে জানি না সে ভাবটা প্রকাশ করিতেও আমার কুণ্ঠা বোধ হইল, পরিচয় প্রশ্নের সুযোগ ঘটিল না! তাঁহার ব্যবহারের ভিতর একটুকুও অসামঞ্জস্য না থাকিলেও আমার মনে বারবার হইতেছিল এ আবার কি রহস্য—কি করিয়া আমার কথা ইঁহার জানা

সম্ভব! ডাক্তারের সঙ্গে সবে সেদিন-রাত্রে আমার দেখা, ভোরে ত রওনা হইয়াছি, টেলিগ্রাফের তারও নিকটে নাই,—ডাক্তার চিঠি লিখিয়া আমার সম্বন্ধে ইঁহাকে কিছু জানান একবারে অসম্ভব—সময়ের জন্যই যে তাহা অসম্ভব অথচ ইঁহার ব্যবহারে আমি নিজে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না ইঁহার সহিত আমার এই মাত্র পরিচয়! তবে কি ইনি আমার পূর্ব্ব পরিচিত কেহ? না নিশ্চয় নয়—খুব ঘনিষ্ঠ স্নেহশীলা আত্মীয়া ব্যতীত, আমার পূর্ব্ব অবস্থা জানিয়া কে আমাকে আদর যত্ন করিবে! সে ভাবের কোন কথাই ত ইনি বলেন নাই,—ইনি তবে কে—ইঁহার বোধ হয় বসুধৈব কুটুম্বকঃ।

দিনটা আরামে কাটিয়া গেল! স্থানটির অবস্থান অতি মনোরম—একটা উপদ্বীপ। গঙ্গার একটা ক্ষীণ শাখা উহার তিনটা দিক বেষ্টন করিয়া গিয়াছে,—জল তখন ছিল না বলিলেই হয়—তাহাই তরতর করিয়া বহিতেছে! লোক জনের বাসও খুব কম, মাত্র কয়েক ঘর সাঁওতাল প্রজা, ডাক্তারের কতকটা জমী চাষ আবাদ করে। আর প্রকাণ্ড একটা আম বাগান—সাহেবের সম্পত্তি—শুনিয়াছি পরে এই বাগান হইতেই ডাক্তারের বার্ষিক আয় চার পাঁচ হাজার টাকা—সময়ে আমাকে বুঝিতে হইয়াছে ডাক্তার কেবল আরামের হিসাবে জীবনে কমই ব্যয় করিয়াছেন, তাঁর বিলাসও একটা আয়ের পথ।

রওনা হইবার পূর্ব্বে ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন—তাহা হইতে মনে হইয়াছিল এখানে আসিয়া তাঁহার পুত্র—আমার উদ্ধতন কর্ম্মচারী—না—সেই খোবমেজাজী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। একে একে দুইটা দিন অতীত হইল—তিনি কেন সেই প্রৌঢ়া ব্যতীত অন্য প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলিল না। প্রৌঢ়ার কথ বার্ত্তায় বেশ বুঝিলাম তিনি ডাক্তার পরিবারের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত,—তবে ইনি তাঁর কোন আত্মীয়া কি না ধরিতে পারিলাম না—পারিবারিক সাধারণ গল্প-কথা ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষর কথা ইনি কমই বলেন—কাজেই ঠিক কিছু বুঝিবার উপায় নাই—সে সকল তথ্য জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও আমার নাই—পাছে ধরা পড়ি।

অলকার কথা জানিবার জন্য সময় সময় বড় ইচ্ছা হইত—ইনি নিশ্চয়ই তাহার সম্বন্ধে অনেক জানেন! আহা! বেচারী, সে বোধ হয় জানে না তাহার বাল্যবন্ধুটীর কি দশা ঘটিয়াছে! হয় ত অলকার জন্যই অভিমানে, কে জানে কি জন্য, অতুলের সে পরিণাম।

অতুলের মত অমন সহৃদয় বন্ধু হারানো জীবনের প্রধান দুর্ভাগ্য—কি সুন্দর লোক ছিল সে—এক দণ্ডে পরকে আপনার করিতে অমন কম লোকেই পারে।

মনে শত চিন্তা,—সে নির্জ্জনবাস যেন ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল,—প্রৌঢ়ার যত্নে যথেষ্ট আরাম অনুভব করিলেও—মন আমার পড়িয়াছিল গোঁসাইগঞ্জে—কিবা হইল! কোনই সংবাদ নাই—পাইবার আশাও নাই, কে লিখিবে? কি লিখিবে? ওসব কি লেখার! তাহাই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেই আর একা একা ঘুরিয়া বেড়াই। কাজ হইয়াছে ভাল ইহাও আবার আর এক খেলে পরিণত হইবে কি! মানুষের মন কি চায়!

সেদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে—বেড়াইয়া "কানন কুটীরে" ফিরিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইবার পথে অস্ফুট মনুষ্যকণ্ঠে শুনিতে পাইলাম। আবার ইহারা কাহারা? অন্ধকারে লোক চিনিবার উপায় ছিল না—কণ্ঠস্বরও বুঝা যায় না,—নিম্নস্বরে সাবধানীর কথাবার্ত্তা। এখানে তবে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে!

নিশ্চল ভাবে একটা থাম ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলাম; অনেকক্ষণ সেই ভাবে অতিবাহিত হইল। অবশেষে তাহাদের স্বর বাক্যাবয়বদেশে একটু স্পষ্ট হইয়া আসিল। তাঁহাদের একজন বলিল "এত করেও সমস্ত পণ্ড হয়ে যায় বুঝি মশা! এগুলোর চোখে ধুলো দিলাম—আর কিনা ও অবশেষে এসে উপস্থিত; ওকে কি ঠকান সহজ! আমি স্বীকার না করলেও ধরে ফেলেছে বোধ হয়। তখনি আমার কানে কানে বল্লে—'এই বুঝি তোমার কয়েদী—এযে অতুল! কয়েদীর পোষাক পেলে কোথা? বিনোদটা শেষে তোমার ওখানে এসেছিল নাকি? তোমার সঙ্গে কি তার পূর্ব্বে জানাশোনা ছিল?' আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও রাজচন্দ্র কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করতে চাইলে না—তখন বলতে বাধ্য হলেম, ভায়া, এই কি এ সব প্রশ্নের সময়? দিন দিন তুমি বুড়ো হয়ে ছাবে পাচ্ছ! তবে সে চুপ করলো—হয় ত রাতে এসে বিরক্ত করতো, তাই পালিয়ে এসেছি।"

বুঝিতে আর বাকী রহিল না—বক্তা স্বয়ং ডাক্তার। কে সে রাজচন্দ্র—আমার মরণ-আড়াল যে ধরিয়া ফেলিয়াছে! আমার আজীবনের শনি, এ দুর্দ্দশার মূল যে—সেই মহাক্রূর রাজচন্দ্র সেন নয় ত? তাহা হইলেই হইয়াছে—স্বয়ং দেবতারও সাধ্য নাই তাহা হইলে

আমাকে রক্ষা করে। রামচন্দ্র নয় ত সে পিশাচরাজ—চন্দ্র নয় সে চন্দ্রের রাহু—উঃ কি ভয়ানক—সেই রামচন্দ্র! দাঁড়াইবার শক্তি হারাইলাম, মস্তকে কেবল সূচিবৎ বিদ্ধ হইতেছিল—রামচন্দ্র,—চণ্ডাল রামচন্দ্র—আমাকে জেলে দিবার প্রধান নেতা রামচন্দ্র—আবার তাহারই উদয়! আমার আর আশা নাই, সমস্ত গেল—শেষ! সজ্ঞা লোপ পায় বুঝি—জগত জীবন অন্তর বাহির—আমার সমস্তই অন্ধকার।

জয় জগন্নাথ

(গান)

জয় জগন্নাথ জগতের নাথ
জগন্ময় হোক্ তোমারই জয়,
সচ্চিদানন্দাকারে মানব-রতন বেদীপরে,
বিরাজিত তুমি ত্রিভুবন ময়।
লয়ে ভক্ত বলরাম, (ধর্ম্ম) সুভদ্রা বিধান,
এই যে আছ ভগবান একত্রয়,
ঐ ত্রিরূপ একাধারে হৃদয় রথোপরে
হেরিলে জীবন মুক্তি লাভ হয়।
শ্রীক্ষেত্র তোমার বিশ্ব চরাচর
শ্রীমন্দির পাপী মানব হৃদয়,
তব শ্রীপুরীতে মানব জাতিতে জাতিতে
ভেদাভেদ কিছুই নাহি যে রয়।

সেথা আনন্দ বাজারে যত নারী নরে,
পরস্পরে প্রেম অন্নবিলায়,
ওযে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মহাপ্রেম গলে,
উচ্ছিষ্ট কেও কত মিষ্ট বলে খায়।
তাই বিমান ভূধর বিশাল সাগর,
ভক্ত জড় জীব সনে গায় তব জয়, (সদা)
ধন্য তব নাম গাই অবিরাম
হয়ে ব্রহ্মানন্দে নিত্য প্রমত্ত হৃদয়।

দীন সেবক
শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

২৫শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ইংরাজী ১০ই মার্চ্চ, শুভ অষ্টমী বাসরে কোচবিহারের নবভূপতি শ্রীশ্রীমন্মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের শুভ অভিষেক উৎসব মহা সমারোহ যথাশাস্ত্র বৈদিক অনুশাসনে, রাজধানীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গে বহুকাল এরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাই,—সমারোহের হিসাবে নহে,—অনুষ্ঠানের বিধিনিয়মে এ উৎসবের অভিনবত্ব! প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে একে ত এরূপ উৎসবের অবসরই এ বিজিত বঙ্গে অতি দুর্লভ। স্বাধীন নৃপতি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সিংহাসনারোহন-অভিষেক নিষ্প্রয়োজন—বঙ্গে এরূপ নৃপতির সংখ্যা অতি অল্প—যাঁহারা আছেন, তাহাদেরও অভিষেক-কার্য্য হিন্দু অনুশাসন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় নাই বহুকাল। ইংরাজ প্রভাবে নবাবী কায়দায় এত দিন অভিষেক পর্ব্ব 'গদি আরোহন পর্ব্বেই' পর্য্যবসিত হইয়াছে,—পুরাকালের হিন্দু নৃপতির যথার্থ অভিষেক আয়োজন বঙ্গ প্রত্যক্ষ করে নাই স্মরণাতীত কাল হইতে। আমাদের মহামনা মহারাণী, জননী

জন্মভূমির একাগ্র সাধিকা, নিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়া—তিনি ভারতের বিধি নিয়মের গরীমায় গৌরবান্বিতা—তাঁহার পক্ষে আত্মজের অভিষেকে শাস্ত্রের প্রত্যেকটি বিধি অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, তিনি কার্য্যতঃ তাহার অনুষ্ঠান করিয়া বলেন,—না, ভারতের যে পূর্ব্বগৌরব সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই পূত পবিত্র, তাহা প্রকৃতই মনোরম। দর্শকের প্রাণে সে দৃশ্য জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল সেই কোন্ স্মরণাতীত অতীতযুগের মত গৌরবান্বিত পূত হৃদিমনোহারী চিত্র। রজনীর চতুর্থযামে যজ্ঞকল্পের বোধন। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন প্রশস্ত ময়দানে বৈদিক শাস্ত্র-বিহিত বেদিকায় হোমাগ্নি স্থাপনান্তে অভিষেক সংস্কার আরম্ভ হইল। পুরোহিতগণ বৈদিকমন্ত্রে যজ্ঞস্থল মুখরিত করিয়া তুলিলেন, হোমকুণ্ডস্থ বরদাগ্নি হবি অঞ্জলি গ্রহণে জ্যোতির্ম্ময় লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিলেন,—রজনীর তমোরাশি সহ হৃদয়ের তম অপসারিত হইয়া শুভ্রপূত ভাব প্রাণে প্রাণে জাগ্রত করিয়া দিল—পুরোহিত কণ্ঠে বেদমন্ত্র শান্ত উদাত্ত স্বরে কম্পিত হইয়া গ্রামে গ্রামে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল; সাগ্নিক ব্রাহ্মণ উপস্থিত, স্বচ্ছদেশীয় ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ বৈদিক স্তোত্র ভক্তিআপ্লুত স্বরে আবৃত্তি করিয়া দেবতার আবাহন অর্ঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন,—কুলপুরোহিত কর্তৃক যজ্ঞেশ্বর অর্চ্চিত হইলেন—মন্ত্রসহ ভক্তি-উপাচারে। সে দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য গরিমা ভাষায় অবর্ণনীয়! অভিনব হৃদয়মনহারী সে দৃশ্য—ভারতের নিজস্ব সে আরাধনা—তাহার অনুষ্ঠান দর্শনে মনে প্রকৃতই অন্ততঃ সে সময়ের জন্য দর্শকের প্রাণ ভক্তিবিগলিত হয়। প্রায় নিশাবসানে মহারাজ যজ্ঞমণ্ডপে স্বজন পরিবৃত হইয়া উপনীত হইলেন। যথাশাস্ত্র শান্তিস্বস্ত্যয়ণ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানান্তে কুলপুরোহিতগণ মহারাজ ও রাজ্যের শুভ কামনায় ও যজ্ঞেশ্বরের স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া মহারাজের ললাট রাজটীকায় সুশোভিত করিয়া দিলেন। পুরনারীগণ হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল, শঙ্খ নিনাদে ও বাদ্যোদ্যমে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। মহারাজা মাতৃ উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন; পিতৃব্য চরণে ও অন্যান্য গুরুজন চরণে নত হইয়া আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হইলেন। সেই শুভ মুহূর্ত্তে মহারাজার মঙ্গল প্রার্থনা সকলেই ভগবানের চরণে প্রার্থনাপর হইলেন।

রাজ-টীকা গ্রহণান্তর মহারাজ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মহামূল্য রাজ বেশ ভূষা পরিধান করিলেন। বালক মহারাজে অঙ্গে সে সুন্দর দ্যুতিমান রাজ বেশ কি সুন্দর মানাইয়াছিল!

সুসজ্জিত সুবেশ সৌম্য নবভূপতিকে উপস্থিত-সকলে সম্বর্দ্ধনা করিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। মহারাজপিতৃব্য শ্রীমন্ নিত্যেন্দ্র নারায়ণ শ্রীমান্ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছত্রদণ্ড সমন্বিত সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। তদনন্তর মহারাজা মাতৃ সন্নিধানে প্রেরিত হইলে অভিষেকসভা ভঙ্গ হইল।

••• ••• ••• ••• •••

দিবা দ্বিপ্রহরে দরবার। দরবার নবাবী কায়দায় যেরূপ ভাবে সচরাচর এ উৎসব পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে অনুষ্ঠিত হয় তদ্রূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ সুসজ্জিত পাট-হস্তী পৃষ্ঠে বহুমূল্য আচ্ছাদনে আবরিত 'আমবাড়ী' অভিধেয় হাওদায় আসীন হইয়া প্রধান পার্ষদ সহ অনুচর কর্ত্তৃক সুন্দর মণিময় শিখিপুচ্ছ ব্যজনে ব্যজিত হইতে হইতে দরবার স্থানে উপনীত হইলেন। তোপধ্বনি ধ্বনিত হইতে লাগিল। সৈনিকগণ সামরিক কায়দায় মহারাজকে অভিবাদন করিল। বামাকণ্ঠে হুলুধ্বনি ও নহবত বাদন সহ বংশীতে অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল। রাজকীয় ঐকতানিক-দল (ব্যাণ্ড) কোচবিহারের জাতীয় সঙ্গীত মুখরিত করিয়া তুলিল। উপস্থিত রাজপরিষদগণ সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া রাজ অভ্যর্থনা করিলেন। বৈতালিক রাজগুণ গানে রাজ অভ্যর্থনা করিল। মহারাজের মাতামহ শ্রীশ্রীবরদাধিপতি প্রেরিত সকীব মহারাজের আগমন বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া দরবারীগণকে মহারাজের সম্বর্দ্ধনায় প্রস্তুত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। মহারাজ রাজবেশে রজতাসনে সমারূঢ় হইলেন। কি সুন্দর মনোরম দৃশ্য সেটী! কি সুন্দর মানাইয়াছিল বালক মহারাজকে সেই সিংহাসনে। প্রাণে প্রাণে প্রার্থনা জাগ্রত হইয়াছিল তাঁহার দীর্ঘ জীবনের জন্য। সমাগত সদস্যবর্গ কি করিয়া বিস্মৃত হইবে আজ তাঁহাদের সেই চিরপ্রিয় স্বর্গগত মহারাজের কথা—অকালে তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন তাঁহারই স্থলে তাঁহারই আত্মজ আজ বেহারের সিংহাসনে অধিরূঢ়. স্বর্গ হইতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ আজ বালক মহারাজের উপর নিশ্চয় বর্ষিত হইতেছে, বালককে রক্ষা করিবেন তিনি, তাঁহার স্মৃতি এ আনন্দ দিনে মহারাজের জীবনে আশীর্ব্বাদরূপে প্রতিমুহূর্ত্তে জাগ্রত রহিয়া সফল করুন—আজিকার এ অভিষেক।

মহারাজের আত্মীয় স্বজন সিংহাসনারূঢ় মহারাজকে আশীর্ব্বাদ অভিনন্দন ও উপঢৌকন দানের পর দরবারীগণ যথারীতি নজর অর্পণ করিতে লাগিলেন এবং পান আতর প্রদান ও

প্রতনাস্তর দরবার ভঙ্গ হইল। যেভাবে পাটহস্তী পৃষ্ঠে মহারাজ দরবারে শুভাগমন করিয়াছিলেন তদ্রূপ ভাবেই পুনঃ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজের জয়ধ্বনী সহকারে সভাভঙ্গ হইল।

• • •

বিগত ১লা মার্চ কোচবিহার সেবিকা ভাণ্ডারের সাম্বৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা তাঁহার একখণ্ড কার্য্য বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। দুস্থ বঙ্গভূমী বাঙ্গলায় কতশত পরিবার নিত্য অনশনে অর্দ্ধাশনে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় কোনক্রমে কাল যাপন করিতেছে। বিশেষতঃ বাঙ্গলার বিধবাদের অবস্থা অনেক স্থলে অতীব শোচনীয়। তাঁহাদের অনেকেই ভাল অবস্থা হইতে স্বামী বিয়োগে এমন নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হন যে তাঁহাদের পারিবারিক সম্মানের দিকে তাকাইয়া ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না, উপরন্তু আত্মীয় স্বজন সংসারে নিতান্ত হেয় ও অপমানজনক জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রাচ্য দেশের মত এদেশে মহিলাগণের শিক্ষাবল এমন নহে যে তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজের অন্নের সংস্থান করিতে পারেন। দেশের অবস্থা এমন শোচনীয়,—যদিও বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্বাবলম্বী হইতে প্রয়াসী হ'ন তাহা হইলে প্রশংসিতা না হইয়া দশের নিকট নিন্দিতা ও স্থল বিশেষে লাঞ্ছিতা হ'ন, তাঁহাদের শিল্পোৎপন্ন বস্তু বিক্রয়ের জন্য কোনই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয় না বরং অন্যে, এমন কি নিজের আত্মীয়গণ পর্য্যন্ত পারিবারিক সম্মানে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া বাধা প্রদান করিতেও পশ্চাদপদ হ'ন না। এই সকল দুঃখিনীগণের দুঃখের যথাসাধ্য লাঘব করিবার জন্য সেবিকা ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা। যদি কোন স্বাবলম্বী দুঃস্থা শিল্প সম্ভার বিক্রয়ের সুবিধা করিতে না পারিয়া থাকেন ভাণ্ডারের সম্পাদিকাকে তাহা জানাইলে তিনি তাঁহার শিল্পাদি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে যত্নবতী হইবেন। সহৃদয়া কর্ম্মপ্রাণা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ভাণ্ডারের সম্পাদিকা রূপে এবং তাঁহার উদ্ভাবিত মহিলা সমিতির আয় প্রভৃতির দ্বারা এই ভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া প্রকৃতই বহু দুঃস্থের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন সম্পাদিকা বাৎসরিক কার্য্য বিবরণীর নিবেদনে বলিয়াছেন—

"কার্য্যক্ষেত্র আমাদের বেড়ে গেছে কত, সামনে পড়ে আছে অনন্ত, তারই অভিমুখে চলছি, শক্তিও ত চাই সেই অনুপাতে। সেই শক্তি সংগ্রহের জন্য আবার ডাক দিচ্ছি, ও মা বুকে

বুকে যে স্নেহবৎসলা সন্তানজননী ঘুমিয়ে আছ একবার জাগ মা জাগ! ও মা অন্নপূর্ণা তুমি অন্নদানে পরাঙ্মুখ নও ত কখন, তোমার ঘরে দীনদুঃখীর চিরঅন্নসত্র খোলা, ও মা জগদ্ধাত্রী তুমি জগৎকে প্রসব করছ, পালন করছ, স্নেহময়ী মা হয়ে বক্ষে ধারণ করে আছ, ও মা শক্তিস্বরূপিণী তুমি অবলা নও, অক্ষমা নও, সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপিণী লোকলক্ষ্মী মা তুমি, তুমি একবার জাগ নারীর বুকে বুকে, একবার সাড়া দাও ত দেখি।"

যাঁর কাজ তিনি করাবেন, করাচ্ছেনও তাই, তাঁর দীনদুঃখী অসহায়া অনাথা কন্যাদের ভার আজ তাঁর উপযুক্ত সন্তানদের হাতে নিজে তুলে দিয়েছেন। এ কাজ ত যার তার নয়, এ যে মার কাজ, যিনি আমার মা তোমার মা ঐ দুঃখিনী বোনগুলির মা। তাই এ কাজ ত কাজ নয়, এ যে কাজের ছুটী, সংসারের স্বার্থের বেদনাক্লিষ্ট বন্ধন থেকে এ যে অহরহ পরিত্রাণ, এ যে মুক্তি, এ যে সংসারের মরণের মাঝে আনন্দ ও অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ! এই কর্ম্ম-সাগরে প্রতিদিন অবগাহন করে যেন আমরা নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হতে থাকি আমরণকাল।

"শুনেছি তোমারি নাম
অনাথ আতুর জন
এসেছে তোমারি দ্বারে
শূন্য ফেরে না যেন।"

এ সকল কার্য্য একের নহে। দেশের সহানুভূতি প্রাপ্ত না হইলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রাণরক্ষা হইবার নয়। আশা করি সহৃদয় মহোদয় মহোদয়াগণ এই সেবিকাভাণ্ডারকে যথাশক্তি পুষ্ট করিতে চেষ্টিত হইবেন। নর সেবাই নারায়ণ সেবা। নর নারায়ণের সেবাকল্পে যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছুক তিনি অনুগ্রহ করিয়া 'সম্পাদিকা সেবিকাভাণ্ডার কোচবিহার' এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শুদ্ধি পত্র।

—:*:—

'পরিচারিকা'র সঙ্গীতপ্রিয় পাঠকপাঠিকারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বরলিপিতে কতকগুলি ভুল, নীচের 'শুদ্ধ' ও 'পরিত্যাজ্য' স্তম্ভদ্বয়ের অনুযায়ী, সংশোধন করিয়া রাখিলে বাধিতা হইব :—

পৃষ্ঠা।	সারিকা।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পরিত্যাজ্য।
১৬২	১	{	—	{
,,	১	১ রা নে	১ রা নে	—
,,	২	৩ (রা সঋা সা) } | নে না০ 'ভা'	—	৩ (রা সঋা সা) } | নে না০ 'ভা'
,,	৩	{	—	{
,,	৩	পণা দ্র	পণা দ্র	—
,,	৪	পণা দ্র	পণা দ্র	—
,,	৭	৩ | (সা -া সা) } না ০ 'ক'	—	৩ | (সা -া সা) } না ০ 'ক'

,,	৭	• সা –া ন না	• সা –া না ০	—
১৬৩	১	০ II–া	। ০ II–া	—
,,	১	৩ | সা খে	৩ | র্সা খে	—
,,	২	১ | র্ঋা ভা	১ | র্ঋা	—
,,	৮	০ II া ০	। ০ II া ০	—
,,	৯	১ | র্জ্ঞ র্জ্ঞা ঠ	১ | র্জ্ঞ র্জ্ঞা ঠাং	—
,,	৯	০ র্রা I ধা	• র্রা I ধা	—
১৬৪	১	I২	I২´	—
,,	৪	০ র্রা ঝোঁ	র্রা ঝোঁ	—

,,	৫	১ র্সা না	০ র্সা না	—
,,	৫	২´ {রা নে	১. রা নে	—
,,	৫	৩ Iসা কে	২´ Iর্সা কে	—
,,	৬	(। । সা) ¦ ০ ০ 'জা'	—	(। । সা) ¦ ০ ০ 'জা'
,,	৮	২´ র্জ্জা দা	২´ জ্জা দা	—
,,	৯	০ সা না	০ র্সা না	—

শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } চৈত্র, ১৩২৯ সাল। { ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

বসন্তে পল্লীশ্রী।

—:o:—

শাখায় শাখায় ঐ
ফুলগুলি লালচে,—
মরি মরি কি সুষমা
চৌদিকে ঢালচে।

উপরে ফুটেচে যত
নীচেও বিছানো তত,—
জ্বলে, উপরে হাজার বাতি
নীচে পাতা গালচে।

ধরণীর এক কোণে
ছোটোখাটো পল্লী,
তিলে তিলে কি মাধুরী
বুকে আজ ধরলি।
দেখি যত মনে হয়,—
তুই এ ধরার নয়
আহা, অমরার ছবিখানি
ভরা মায়াজাল যে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বুদ্ধদেবের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্ম।*

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

পুণ্যভূমি এই অঙ্গদেশ একাধারে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান। রামায়ণের রোমপাদ, মহাভারতের কর্ণদেবের বিশাল রাজ্য এই অঙ্গভূমি—কত শত মুণি-ঋষির সাধনার ক্ষেত্র তাহা কে বলিতে পারে? অদূরে শৈলমালার অন্তরালে বিভিন্ন-স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, জৈনগণের দ্বাদশ তীর্থধার বসুপূজ্যের জন্মস্থান, অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরী নিকটেই, সুলতানগঞ্জে জহ্নুমুনির আশ্রম, মোদ অথবা মৌদ্গল্য ঋষির আশ্রম মোদ-গিরি, মুদ্গ-গিরি—বর্ত্তমান মুঙ্গের;—দূরে মন্দার পর্ব্বত।

করুণার অবতার শাক্যসিংহ গৌতমের পবিত্র চরণরেণুস্পর্শে এই বিহার প্রদেশের প্রত্যেক ভূবিভাগ শুচীকৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। কখনো তিনি সুদূর শ্রাবস্তিতে উপাসকশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডিকের জেতবনারামে, কখনো রাজগৃহের বেণুবনারামে। কখনো গৃধ্রকূট পর্ব্বতের—সানুদেশে, কখনো গয়াশীর্ষে,

* [illegible] সারস্বত সম্মিলনে পঠিত।

কখনও অচিরবতী নদীর উপকূলে সুমধুর-স্বরে তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন। হয়তো আমরা আজ যে স্থলে সম্মিলিত হইয়াছি, তাহা তাঁহার এবং অনুচর পঞ্চশত ভিক্ষুর পদরজ-স্পর্শে পবিত্র হইয়া ছিল—কে জানে এই জামালপুরের উপর দিয়া তিনি চম্পা গিয়াছিলেন কি না? পালি সাহিত্য পাঠে অবগত হই—'ভগবা চম্পায়ং বিহরতি গগ্গরায় পোক্খরণিয়া তীরে (বিমানবত্থু অট্ঠ—কথা)...মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং চম্পানগরং প্রবিসিত্বা···ইত্যাদি—অর্থাৎ চম্পারাজমহিষী—গর্গরাদেবী প্রতিষ্ঠিত শতদল কমল প্রফুল্ল সরোবরের তীরে তিনি বাস করিতেছিলেন—বহুভিক্খু পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাপাত্রহস্তে পিণ্ডপাতের নিমিত্ত চম্পানগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সংযুক্ত নিকায়ে পাঠ করি যে এই চম্পানগরে পাঁচশত ভিকখু, সাতশত উপাসক সাতশত উপাসিকা এবং সহস্র সহস্র দেবগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। চম্পেয্য জাতকে পাঠ করি যে চম্পানদীর উপকূলে অঙ্গাধিপতি চম্পা রাজের সহিত মগধরাজের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। [মগধরাজ যুদ্ধে] পরাজিত হইয়া পরাজয়-লাঞ্ছিত জীবন বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত দুইকূলপ্লাবী চম্পানদীতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নদীর অভ্যন্তরে এক নাগরাজ মণিমাণিক্য রচিত প্রাসাদে অবস্থান করিতেন। নাগরাজ মগধরাজকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন ইত্যাদি। পরযুগে দেখিতে পাই জামালপুরের অনতিদূরে কাজরা নামক স্থান এক সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের তীর্থভূমি ছিল। Beal's Budhist Records of Western Countries. নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে ইহার উল্লেখ পাই। ইহার পূর্ব্বনাম কুজ্জাগৃহ ছিল, পরে অপভ্রংশে কজুঘির কাজরী কাজরায় পরিণত হইয়াছে। এখনও তৎসন্নিকটে কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন কহলগ্রাম বর্ত্তমান কহলগাঁওয়ের অনতিদূরে। পাথর ঘাটা নামক স্থান সুবিখ্যাত শিলাসংগম বা বিক্রমশিলা সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় অনেকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে, এবং এক কালের বৌদ্ধ তক্ষণ শিল্পের পরিচয়,—এই স্থানে প্রাপ্ত বুদ্ধ, মৈত্রেয় এবং অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিতে স্ফূর্ত—হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে—এই বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডিত্যরশ্মিতে বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইহার ছয়টী দ্বার ছিল; সুবিখ্যাত ছয় জন পণ্ডিত দ্বা তাহা রক্ষিত হইত। তাঁহাদিগকে বিচারে পরাজিত না করিয়া কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ

করিতে পাইতেন না। আজ সে গৌরব কোথায়? হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পবিত্র তীর্থভূমির পুরাতন স্মৃতিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। সেই বৌদ্ধ দিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু বলিবার—সুযোগ আপনারা দিয়াছেন,—তাহাতে আমি সম্মানিত ও অনুগৃহীত হইয়াছি। তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

বৌদ্ধ রত্নত্রয়ের বন্দনা করিয়া আমি বুদ্ধদেবের জীবনী, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ—এই কয়টা বিষয় বলিতে প্রয়াস পাইব।

মহাকারুণিকং নাথং জ্ঞেয়সাগর পার গুং।
বন্দে নিপুণগম্ভীরং বিচিত্রনয় দেশনং॥
বিজ্জাচরণসম্পন্না যেন নিয়ন্তি লোকতো।
বন্দে তং উত্তমং ধম্মং সম্মা সম্বুদ্ধ পূজিতং॥
শিলাদিগুণ সম্পন্নো ঠিত মগ্‌গফলেসু যো।
বন্দে অরিসসঙ্ঘং তং পুঞ্ঞক্ষেত্তং অনুত্তরং॥

সকলেই অবগত আছেন যে গৌতম কপিলাবস্তু নগরে খৃ পূঃ ৫৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধগয়ায় অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে তিনি সম্যক বোধি লাভ করেন, তাহার পর তিনি 'বুদ্ধ' হন। তাহার পূর্ব্বে তিনি 'বোধিসত্ব' (অর্থাৎ 'ভাবী' বুদ্ধ) ছিলেন। শাক্যমুনি, সিদ্ধার্থ ও তথাগত নামেও পরিচিত হইতেন। তিনি যখন তুষিত স্বর্গে বিরাজ করিতেছিলেন তখন দেবগণ মানবের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে জম্বুদ্বীপে (ভারতে) মধ্যদেশে তিনি আবির্ভূত হইবেন। শুদ্ধোধন হইবেন তাঁহার পিতা, মায়াদেবী অথবা মহামায়া হইবেন তাঁহার মাতা—কিন্তু সাত দিনের ভিতরেই, মায়াদেবী লোকান্তরিত হইবেন। তিনি তুষিত স্বর্গ ত্যাগ করিলেন। মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিলেন বোধিসত্ব শ্বেতবর্ণ বারণ হইয়া রজতপর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া রজতবর্ণ শুণ্ডে পদ্ম ধারণ করিয়া তাঁহার শয্যাধারকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া যেন কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্বপ্ন শুদ্ধোদনের নিকট নিবেদিত হইলে তিনি নৈমিত্তিকগণকে আহ্বান করিয়া তাহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—মায়াদেবীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, বালক জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি হয় রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন নতুবা আগার

পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইবেন। লুম্বিনি উদ্যানে শালশাখা গ্রহণ করিয়া মায়াদেবী প্রসব করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া বোধিসত্ত্ব প্রসূত হইলেন। চতুর্দ্দিকপালগণ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তাঁহার অঙ্গে দ্বাত্রিংশৎ মহাব্যঞ্জন (লক্ষণ) এবং বহু অনুব্যঞ্জন পরিলক্ষিত হইল। বালক জন্মগ্রহণ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন— "আমি এই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"—সেই সময়েই তাঁহার স্ত্রী যশোধরা, তাঁহার ঘোটক কণ্ঠক; তাঁহার সারথি ছন্দ, তাঁহর ক্রীড়ার সাথী কালুদায়িন এবং প্রিয় শিষ্য আনন্দ জন্মগ্রহণ করিলেন। ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গে আনন্দ কোলাহল সমুত্থিত হইল; ঋষি অসিত বলিলেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

শুদ্ধোধন চিন্তায় কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—বালক কি হইবে, রাজচক্রবর্ত্তী না সন্ন্যাসী? ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে বালক 'চতুর্নিমিত্ত' দর্শন করিয়া গৃহত্যাগ করিবে। সেই চতুর্নিমিত্ত (১) পলিতকেশ বৃদ্ধ, (২) রোগী (৩) শবদেহ (৪) সন্ন্যাসী, এই চারিটা দৃশ্য যাহাতে বালকের নয়নগোচর না হয় সেই প্রযত্ন তিনি করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্যে তাঁহার মনকে বাঁধিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। একদিন শুদ্ধোধন উৎসব উপলক্ষে অনুপস্থিত ছিলেন, ধাত্রীরা উৎসব দেখিতে গিয়াছিল— সেই অবকাশে বালক জম্বুবৃক্ষের নিম্নে পদ্মাসনে বসিয়া প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বৃক্ষের ছায়া স্থির হইয়া রহিল।

ক্রমে কোলিয়রাজ সুপ্রবুদ্ধের দুহিতা যশোধরার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। শুদ্ধোদন নিরন্তর প্রযত্ন করিতে রহিলেন যেন ভবিষ্যদ্বাণী কথিত চতুর্নিমিত্ত তিনি দেখিতে না পান। আমোদ প্রমোদের নানা ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সব চেষ্টা সব প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। দেবতাগণ কৌশলে তাঁহাকে সেই চতুর্নিমিত্ত দর্শন করাইলেন। গৌতম প্রথম তিন নিমিত্ত দর্শন করিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া তাহাদের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাহার পর সন্ন্যাসীরূপ চতুর্থ নিমিত্ত দেখিয়া তাঁহার মন শান্ত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি ত্রিবিধ দুঃখ অতিক্রম করিবেন। অতএব তিনি গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিলেন। এদিকে শুদ্ধোদন তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত "সর্ব্বালঙ্কার প্রতিমণ্ডিতা নৃত্যগীতে সুশিক্ষিতা দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী

কামিনীগণকে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইল। নিদান কথায় লিখিত আছে—'বোধিসত্ত্ব ঘুমাইয়া পড়িলে কামিনীগণ বলিলেন—যাঁহার জন্য এত নৃত্যগীতের আয়োজন তিনিই যদি ঘুমাইলেন—তখন আমরাই বা জাগিয়া থাকি কেন? তখন তাঁহারাও ঘুমাইতে লাগিল ইহার একটা বীভৎস ছবি দেওয়া হইয়াছে।--বোধিসত্তো পবুজ্‌ঝিত্বা সয়ন পিঠে পল্লঙ্কেন নিসিন্নো অদ্দস তা ইথিয়ো তুরিয়ভণ্ডানি অবথরিত্বা নিদ্দায়ন্তিয়ো একচ্চা পগ্‌ঘরিত খেলা লালকিলিন্নগত্তা একচ্চা দন্তে খাদন্তিয়ো একচ্চা কাকচ্ছন্তিয়ো একচ্চা বিপ্পলপন্তিয়ো একচ্চা বিকটমুখা একচ্চা অপগতবত্থা পাকটবীভচ্ছ-সম্বাধট্‌ঠানা—ইহার ভাবার্থ এই যে বোধিসত্ত্ব প্রবুদ্ধ হইয়া—পালঙ্কে—আসীন হইয়া দেখিলেন সেই কমিনীগণ বাদ্যযন্ত্রগুলি নামাইয়া ঘুমাইতেছেন কোথাও লালানির্গত হইয়া গাত্র অভি-সিঞ্চিত করিতেছে, কোথাও তাঁহারা দন্ত কিড়্‌মিড়ি করিতেছেন, কোথাও প্রলাপ বকিতেছেন, কোথাও অপগতবস্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন কোথাও বা বীভৎসভাব প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মনে হইল এ যেন শ্মশান। তিনি বলিলেন আজই মহাভিনিষ্ক্রমণ করা উচিত। তখনই সারথি ছন্নকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। তখন একবার পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। অতি সন্তর্পণে রাহুলমাতার গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। গৃহাভ্যন্তরে গন্ধতৈল প্রদীপ জ্বলিতেছে। রাহুলমাতা মল্লিকাদি পুষ্পাবিকীর্ণ শয্যায় পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া নিদ্রায় মগ্ন।—বোধিসত্ত্ব গৃহদ্বারে পদস্থাপন করিয়াই সে দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলেন—"দেবীর হস্ত অপনয়ন করিয়া যদি পুত্রকে গ্রহণ করি তবে তিনি উঠিয়া পড়িবেন—আমার গমনের অন্তরায় উপস্থিত হইবে।" নিঃশব্দে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। বড়ই মর্ম্মস্পর্শী সে দৃশ্য।

সেই রাত্রিতেই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। দেবতাগণ-অশ্বখুর তুলিয়া ধরাতে পদশব্দ শ্রুত হইল না। সুপ্তনগর সুপ্তই রহিয়া গেল। মার গৌতমকে রাজ্যলোভ দেখাইয়াও তাঁহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। অনোমা নদীর অপর তীরে তিনি সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ছন্নকে দিলেন। অতঃপর তরবারির দ্বারা কেশ ছেদন করিয়া স্বর্গের দিকে উষ্ণীষ ছুড়িয়া দিলেন। দেবতাগণ তাহা ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে লইয়া গিয়া তাহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। ঘটিকার নামক এক দেব দূত যুবকের বেশে তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহার বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয় বস্ত্রাদি তাঁহাকে দিলেন। তাহার পর রাজগৃহ

অভিমুখে চলিলেন। মগধরাজ বিম্বিসারের রাজ্যার্পণ প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করিয়া গয়ার সন্নিহিত উরুবিল্ব নামক গ্রামে আসিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন। ছয়বৎসর কাল কঠোরতা অবলম্বন করিবার পর তাঁহার ধারণা হইল এই মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ করা যায় না। আবার তিনি পরিব্রাজক জীবন গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পাঁচ জন সঙ্গী বীতশ্রদ্ধ হইয়া সারনাথ মৃগদাবে চলিয়া গেলেন ক্রমে গৌতম নৈরঞ্জনা নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সুজাতার নিবেদিত পরমান্ন ভোজন করিয়া স্বর্ণপাত্র নদীতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"যদি আমি বুদ্ধ হই তবে ইহা উজান বহিয়া চলুক।" পাত্র উজান চলিল।

সন্ধ্যার সময় বোধগয়ার অশ্বত্থ বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। এই দ্রুমের নিম্নে সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া—ইহার নাম বোধিদ্রুম হইয়াছিল। স্বোস্তিক নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে আট গোছা ঘাসের বোঝা লইয়া পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন —দ্রুমের নিম্নে তৃণাস্তরণে আমি উপবেশন করিলাম। আমার গাত্র, স্নায়ু, অস্থি যদি ক্ষয় হইয়াও যায়, শোনিত যদিও শুকাইয়া যায়, তথাপি সম্বোধি লাভ করিবার পূর্ব্বে এই আসন ত্যাগ করিব না।" এই দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য মার বোধিসত্ত্বকে নানা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, বিকট মূর্ত্তি দৈত্যগণ আসিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। মারের প্ররোচনায় প্রভঞ্জন প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। তাঁহার উপর শৈলখণ্ড ও অস্ত্র-শস্ত্রের বৃষ্টি হইতে লগিল, জলন্ত অঙ্গার আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার অঙ্গ স্পর্শে সকলই সুকোমল প্রসূণে পরিণত হইয়া পড়িল। মারের আক্রমনে দেহরক্ষী দেবতাগণও ভয়ে পলাইয়া গেলন। তখন তিনি দক্ষিণ হস্তদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে তাঁহাকে সাক্ষী করিলেন। এই মুদ্রাকে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা কহে।—পৃথিবী তাহার উত্তরে এরূপ ভীষণ শব্দ করিলেন, যে স্বরে ভীত হইয়া মার সৈন্যগণ পলায়ণ করিল। দেবতা ও নাগগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিজয়গীতি গাহিলেন।—তাঁহার শত্রু পরাভূত হইবার পর রাত্রে তিনি সম্বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। প্রথম যামে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; দ্বিতীয় যামে বর্ত্তমান জীবনের জ্ঞান উদ্ভাসিত হইল, তৃতীয় যামে নিদান অথবা কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা প্রতিভাত হইল, চতুর্থ যামে উষার আলোকে তিনি সকল বস্তুরই জ্ঞান লাভ করিলেন।

সম্বোধি লাভের পর তিনি সাত সপ্তাহ উপবাস করেন। প্রথমে বোধিদ্রুমের নিম্নে উপবাস করিয়া সমগ্র অভিধর্ম্ম পিটক আবৃত্তি করেন তাহার পর অজপালের ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিম্নে ধ্যানরত হন। তখন রতি, তৃষ্ণা ও মোহ নামক মার কন্যাগণ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার নিষ্ফল প্রযত্ন করে। তাহার পর মুচলিন্দ বৃক্ষের তলে ধ্যাননিমগ্ন হইলে নাগরাজ মুচলিন্দ স্বীয় ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বৃষ্টির প্রকোপ হইতে রক্ষা করেন। শেষে রাজায়তনের দ্রুমের নিম্নে ধ্যানরত হন, ধ্যানভঙ্গে তপুস্‌স্‌ এবং ভল্লুক নামক দুইজন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে যবের পিষ্টক ও মধু নিবেদন করেন,—চতুর্ম্মহারাজিক (অর্থাৎ চতুর্দিক্‌পাল) চারিটা ভিক্ষাপাত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিলে তিনি ইচ্ছা করিলেন—চারিটা ভিক্ষাপাত্র এক হইয়া যায়। তাহাই হইল; তাহাতেই—তিনি শ্রেষ্ঠীপ্রদত্ত প্রথম পিণ্ডপাত গ্রহণ করিলেন। শ্রেষ্ঠিদুইজন তাঁহার প্রথম উপাসক (গৃহস্থ থাকিয়া ও বুদ্ধদেবের পূজক) হইলেন।

তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অজপালের ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিম্নে নিবিষ্ট হইয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন যে ধর্ম্ম তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা গভীর ও দুর্ব্বোধ। সাধারণে কি ইহা বুঝিতে পারিবে? না অযথা সময় নষ্ট হইবে? তখন ব্রহ্মা এবং অন্য দেবতাগণ আসিয়া—মানবের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত তাঁহার পূর্ব্বসঙ্গী পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসীর সন্ধানে বারানসীর সন্নিহিত 'ইসিপত্তন মৃগদাবে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি প্রথম 'ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন' করিলেন অর্থাৎ প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সেই পঞ্চ সন্ন্যাসী নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এইরূপে সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

গৌতম ২৯ বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমণ এবং ৩৫ বৎসর বয়সে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন করেন। এই সময় হইতে ৮০ বৎসরে তাঁহার পরিনির্ব্বানকাল পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে ধর্ম্মের অববাদ করিয়া বেড়াইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিতেন; কিন্তু দীক্ষিতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে ভিক্ষুগণের উপর দীক্ষার ভার অর্পিত হইল। পূর্ব্বে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই চলিত, এখন হইতে সঙ্ঘেরও শরণ লইতে হইল।

বস্সাবাস :—বর্ষার সময় পর্য্যটনের সুবিধা হইত না, অতএব তিন মাস কাল বুদ্ধদেব ও ভিক্ষুগণ সঙ্ঘারামে থাকিতেন।

পবারণা :—বর্ষার পর পুনরায় বাহির হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার প্রথম দীক্ষিতের মধ্যে কাশ্যপ নামধারী ভ্রাতাত্রয়, উরুবিল্বের অগ্নি উপাসকগণ এবং জটিলগণ। তিনি কয়টী Miracle দেখাইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে—আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজগৃহে সারীপুত্র ও মৌদ্গল্লায়ণকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

তাৎকালীন নৃপতিগণ—যথা কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ, মগধাধিপতি বিম্বিসার এবং তৎপুত্র অজাতশত্রু—তাঁহার নিকটে আসিয়া ধর্ম্ম কথা শুনিতেন। তাঁহারা সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে আরাম, কুঞ্জ এবং নানাবিধ অন্য দান নিবেদন করিয়াছিলেন। নৃপতি ব্যতীত অন্যান্য ভক্ত ও অনেক দান করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠীকুলপতি অনাথপিণ্ডিক যত স্বর্ণ-মুদ্রাভূমির উপর আবৃত করা যায় তত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া জেবন ক্রয় করিয়া সঙ্ঘে দান করিয়াছিলেন। বৈশালীর বারবণিতা আম্রপালী (অম্বপালি) তাঁহার আম্রবন সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। সম্বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব রাজগৃহে প্রথম আসিলে রাজা বিম্বিসার তাহার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ বেণুবন তাঁহাকে দান করেন। এই বেণুবনে বুদ্ধদেব প্রায়ই থাকিতেন। এইখানে তাঁহার খুল্লতাতের সন্তান দেবদত্ত তিন তিনবার তাঁহার প্রাণবধের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সম্বোধিলাভের পর দ্বিতীয় বৎসর তিনি শুদ্ধোদনের প্রার্থনায় কপিলবস্তু আগমন করেন। তিনি নগরের বহির্ভাগে একটী কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতাপুত্রের কে কাহাকে প্রথমে বন্দনা করিবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তিনি ঋদ্ধি প্রভাবে আকাশমার্গে আসীন হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তখন পিতা,—পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন ও ন্যগ্রোধারাম দান করেন। এই সময়ে তিনি তাহার প্রিয়শিষ্য আনন্দ, তাহার শত্রু দেবদত্ত এবং অনুরুদ্ধ ভদ্দিয় প্রভৃতি অন্যান্য শাক্যগণকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

এই সময়ে একটি করুণ ঘটনা ঘটে। যশোধরা রাহুলকে পিতৃসকাশে উপসম্পদা গ্রহণের নিমিত্ত পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন—"বৎস, গিয়া বল, হে ভিক্ষু, আমি পিতৃ-সম্পদের অধিকারী, আমার অধিকার লইতে আসিয়াছি। বুদ্ধদেব রাহুলের আগ্রহ দেখিয়া সারীপুত্রকে আদেশ দিলেন :—"হে সারীপুত্র, রাহুলের সঙ্ঘ প্রবেশের অনুমতি দিতেছি।"

শত বিমল কুসুম সজ্জিত সুষমা মণ্ডিত রাহুলের দেহে আজ অগণিত গ্রন্থিযুক্ত মলিন চীরবাস, ভ্রমরকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম অপগত হইয়াছে; নবোদ্গত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কোমলারুণ করপল্লবে সন্ন্যাসীর পিণ্ডপাত গ্রহণ জন্য ভিক্ষাপাত্র রহিয়াছে। হায়, হায় কপিলবস্তু রাজ্যের গৌরবমণি বালার্ককান্তি ভাবী উত্তরাধিকারীর কি এই বেশ? এ হৃদয়-বিদারী দৃশ্য দেখিয়া বৃদ্ধ শুদ্ধোধনের মর্ম্মন্তুদ যাতনা উপস্থিত হইল—নয়ন হইতে অজস্রধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বিষশল্যাদিগ্ধ হৃদয়ের যাতনায় অস্থির শুদ্ধোদন পুত্রসমীপে আসিয়া কহিলেন—"গৌতম, তুমি একি করিলে?" তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিলেন যে, অতঃপর যেন কোনও সন্তান পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে না পারে। সেই অবধি যে কোন বালক পিতামাতার অনুমতি লয় নাই, অথবা যাহার বয়স বিংশতি বৎসর হয় নাই তাহাকে উপসম্পদা দিতে বুদ্ধদেব নিষেধ করিয়াছিলেন—"যো পণ ভিক্‌খুন্নানং উনবীশতিবস্‌সং পুগ্‌গলং উপসম্পাদেয্য, সো চ পুগ্‌গলো অনুপসম্পন্নো তেচ ভিক্‌খু গারয্‌হা।"

যে ছয়জন "অঞ্ঞতিথিয়"গণের অর্থাৎ—ধর্ম্মাবলম্বীগণের নায়কের সহিত তাঁহার প্রায়ই বিচার বিতর্ক হইত তাঁহাদের নাম—পুরাণ কশ্যপ, মক্‌খলি গোসাল, অজিত কেশ কম্বলিন, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত তাঁহাদের গর্ব্ব চুর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে একটি আশ্চর্য্য miracle দেখান। তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকবলয়কে সংযোজিত করিয়া আকাশমার্গে এক বৃহৎ পথ রচনা করেন, এবং তাহার উপর আরোহণ করিয়া শরীরের উপরার্দ্ধ হইতে জলস্রোত প্রবাহিত করেন এবং নিম্নার্দ্ধ হইতে অগ্নিবর্ষণ করেন। এই অবস্থায় মহান জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ দেন।

ইহার পরই তিনি শিষ্যগণকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে আগমন করেন। তথায় মাতা মায়াদেবী এবং দেবতাগণের নিকট অভিধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। তিন মাস অতীত হইলে তিনি আবার মর্ত্ত্যভূমে ফিরিয়া আসেন। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিবার নিমিত্ত তিনটী সোপান শ্রেণী রচিত হয় মধ্য ভাগেরটা বৈদূর্য্য মণির, দক্ষিণ ভাগেরটা সুবর্ণের, এবং বাম ভাগেরটা স্ফটিকের রচিত। তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণে ব্রহ্মা এবং বামে ইন্দ্র উক্ত সোপান শ্রেণী দিয়া সকাস্য নামক স্থানে মর্ত্ত্যভূমে অবতরণ করেন।

অশীতি বৎসর বয়সে তিনি পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করেন। মহাপরিনিব্বান সূত্রে লিখিত আছে যে পাবানগরবাসী চুন্দ নামক একজন কর্ম্মকার প্রদত্ত শূকর মাংস ভক্ষণে তাঁহার পীড়া হয়। কুশীনারের অভিমুখে যাইবার পথে পীড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে মল্লগণের কুঞ্জে যুগল শাল তরুর মধ্যে রচিত শয্যায় তিনি 'সিংহ শয়নে' শায়িত হন। অন্তিম কালে প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং সম্মিলিত ভিক্ষুগণকে তিনি শেষ ধর্ম্মের কথা শুনাইলেন এবং সঙ্ঘের নিয়ম পালনের অনুজ্ঞা দিলেন। পরিব্রাজক সুভদ্রকে তিনি এই সময় দীক্ষিত করেন—ইনিই তাঁহার শেষ শিষ্য। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাহারও বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের বিষয় কোনও সন্দেহ আছে কি না এবং নাই বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে অন্তিম বিদায় দিলেন। তাঁহার শেষ কথা—"হন্দ দানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বো: বয়ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।" (অর্থাৎ—সকল সংস্কারই বা যাবতীয় বস্তু ধ্বংসপ্রবণ, অতএব প্রমোক্ষের নিমিত্ত অপ্রমত্ত হইয়া যত্ন কর।")

তাঁহার পরিনির্ব্বাণ সময়ে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিলেন, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র বিলাপ করিলেন। শক্র একটা গাথা উচ্চারণ করিলেন—

অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদবয়ধম্মিনো।
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং উপসমো সুখো॥

অর্থাৎ—সংস্কার সমূহ (যাবতীয় বস্তু) অনিত্য, তাহাদের ধর্ম্ম উদয় ও ব্যয়; উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ইহাদের উপশমই সুখ।

এই শ্লোকটী—কাষায় পরিধায়ী সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষুগণের মুখে নিরন্তর ধ্বনিত হয়।

ছয় দিন ধরিয়া মল্লগণ বাদ্যসমারোহ করিয়া বুদ্ধ দেবের শব দেহ পূজা করিলেন। সপ্তম দিবসে আট জন সামন্ত দ্বারা বাহিত হইয়া শবদেহ নগরের বাহিরে মকুট বন্ধন নামক মন্দিরে নীত হইল। পরে পাঁচশত বস্ত্রখণ্ডে জড়িত হইয়া লৌহনির্ম্মিত শবাধারে রক্ষিত হইয়া চিতায় স্থাপিত হইল। শিষ্য কাশ্যপ আসিতেই চিতা আপনিই জ্বলিয়া উঠিল, অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর মেঘ হইতে বারিধারা পতিত হইয়া চিতা নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

মল্লগণ বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ রক্ষা করিল। মগধরাজ অজাত শত্রু, বৈশালির লিচ্ছবিগণ, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকাপ্পর বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঘদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ এবং পাশর মল্লগণ দেহাবশেষের অংশ প্রার্থনা করিলেন। কুশিনগরের মল্লগণ তাহা দিতে না চাহিলে ভীষণ যুদ্ধের উপক্রম হইল। দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ সে বিবাদ মিটাইয়া দিতে দেহাবশেষ আট বিভাগে বিভক্ত করিলেন। এই দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইল। কথিত আছে যে পরবর্ত্তী কালে সম্রাট অশোক এই সকল স্তূপ খনন করিয়া দেহাবশেষ বাহির করিয়া লইয়া স্বয়ং তাহার উপর চুরাশী হাজার—স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কেবল রামগ্রামের স্তূপ নাগগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে তিনি তাহা হইতে দেহাবশেষ লইতে পারেন নাই।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

ফুলশয্যা।

—:০:—

ফুলশেষ তুমি পাতিয়াছ বঁধু ?
কাজ নাই প্রিয়, কাজ নাই
অঙ্গে আমার ফুলের ভূষণ
সাজ নাই।
এ তনু কোথা সে কমলের দল
বুকে কোথা আশা, প্রাণে কোথা বল
প্রথম-তরুণ-প্রেমের মিলন-
লাজ নাই;
ফুলশেষ তুমি পেতেছ বন্ধু
কাজ নাই প্রিয়, কাজ নাই।

তবে কি এমন জ্যোছনা-হসিত
মিলন-রজনী হবে শেষ ?
দুটি বুকে শুধু কাঁদিয়া মরিবে
প্রেমাবেশ ?
বিফলে যাবে কি পূজা-আয়োজন ?
কাঁদিয়া পোহাবে রজনী এমন ?
বিরহ শয়নে বক্ষে লুটাবে
কালোকেশ ?
তবে কি বিফলে জ্যোছনা বিধুর
মিলন-রজনী হবে শেষ ?

কি বলিব বঁধু মিলন-সাজের
সন্ধ্যা গিয়াছে সে কখন,
—আর ত নাচে না, আর ত হাসে না
ভাঙা মন !
আঁখিতে কাজল দিতে কাঁপে হাত,
উছলিয়া ওঠে বুকের প্রপাত
শিথিল কাঁচলি বাঁধনের তলে
সারাক্ষণ।
কি বলিব বঁধু বাসক-সাজের
গিয়েছে সন্ধ্যা সুলগন !

তোমার আঁখির ঐ প্রেমালোক
মোর প্রাণে সে যে কথা কয়,
ও-পারের তীর বড় কাছে যেন
মনে হয় !
সন্ধ্যাতারার ঐ আলোশিখা
ও-পারের ভালে আছে যেন লিখা
তোমার প্রেমের আলিঙ্গনের
বরাভয়
তোমার আঁখির তারায় আলোক
মোর প্রাণে যেন কথা কয়।

ফুলদল তুমি পেতেছ বন্ধু ?
পেতে রাখ প্রিয় ফুলদল,
ও-পারে ফুটিবে মিলন-রাতের
এ কমল !
সে যে বড় মিঠে, সে যে বড় মধু
শুধু দুটি প্রাণ, শুধু দুটি বঁধু
আর যাহা কিছু ডুবিবে গভীর
রসাতল,
ফুলশেয ফুলে ঢেকে রাখ বঁধু
পেতে রাখ প্রিয় ফুলদল।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাতঃকালটা শুধু শুধু নীরস বিষয়ে তর্ক করিয়া মাটি করা অপেক্ষা একটু বেড়াইয়া আসা ভাল বিবেচনা করিয়া উভয়েই বর্ষাতি গায় দিয়া ডাওহিলের দিকে বেড়াইতে চলিলাম। অনেকেই প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, কেহ বা একক, কেহ কেহ বা সস্ত্রীকও আসিয়াছিলেন। আবার যাঁহারা দুর্ব্বল অথবা রুগ্ন তাঁহারা ভুটিয়ার কাঁধে ডাণ্ডিতে চড়িয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ডাওহিল কার্শিয়াং হইতে প্রায় দুই মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত, এবং পথটি বড়ই বন্ধুর, এতটা পথ চড়াই উঠিতে বড়ই ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। পুরুষেরা সকলেই ন্যূনাধিক ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং স্ত্রীলোকদিগের স্বেদসিক্ত রক্তিম বদন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল যে তাঁহারাও বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীলোক হইয়া যেরূপ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন তদ্দর্শনে আমার শারীরিক ক্লান্তি লজ্জায় দূরে পলায়ন করিয়াছিল।

পথের দুধারে মাঝে মাঝে দু' একটি বড় বড় বাড়ী, সবগুলিই প্রায় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহারা বসন্তের পাখীর মত শৈলবিহারে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ষাসমাগমে সকলেই সমতল প্রদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনঃ এই সকল বাড়ীতে লোক সমাগম হইবে, তাঁহারাও আবার নবেম্বরের প্রথমেই চলিয়া যাইবেন। এইরূপে বাড়ীগুলি বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল শূন্য পড়িয়া থাকে; কিন্তু অপর ছয় মাসের ভাড়া হইতেই গৃহস্বামীগণ সংবৎসরের টাক্স্ ও ভাড়া ইত্যাদি পোষাইয়া লন। কি দার্জ্জিলিং কি কার্শিয়াং, পাহাড়ে যাঁহার একখানি বাড়ী আছে তিনি কুলীন পুত্রের পিতা অপেক্ষাও অধিক দুরাকাঙ্খী। কেহ বাড়ীভাড়া করিতে গেলে তাঁহারা সহজে কাহাকেও শেষ কথা দেন না, শুধু নানা কথা বলিয়া গ্রাহককে হাতে রাখিয়া ঘুরাইতে থাকেন, অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায় যে

এইরূপ দরদস্তুরও দালালির ফলে অনেক বাড়ী কোন কোন season এ ভাড়াই হয় না।

যতই ডাওহিলের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম ততই চতুর্দ্দিকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা দেখিতে পাইতেছিলাম এবং ঠাণ্ডাও বেশী অনুভূত হইতেছিল। শীতকালে নাকি এ স্থান প্রায় সদা সর্ব্বদা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন থাকে, এবং রাত্রি কালে সময় সময় তুষার পাতও হয়। পাহাড়ের শীতে অনভ্যস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া তখন এখানে বাস করা বড়ই সুকঠিন হইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে দুরন্ত শীতের জন্য হাত পায়ের আঙ্গুল ফুলিয়া যায় এবং বড়ই কষ্টপ্রদ chilblain চুলকানি উপস্থিত হয়।

অল্পক্ষণ পরেই ডাওহিল আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাওহিলে বন বিভাগের ডেপুটী কন্‌সার ভেটারের আফিস, ফরেষ্টারগণের ট্রেনিং স্কুল আছে, এক কথাতে বলিতে গেলে এখানে বন-বিভাগের বড় রকম একটা আড্ডা। একটি পুলিশ আউট পোষ্ট, ও টেলিগ্রাফ্ আফিস ও দু এক খানা দোকানও আছে। আর ইউরোপীয় ও ইউরোশিয়া বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ভিক্টোরিয়া বালিকা-বিদ্যালয় আছে। স্কুলগৃহ, ছাত্রাবাস ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য গৃহ ও ক্রীড়া প্রাঙ্গন প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যেন ডাওয়াহিলে এক অমরাবতী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষার্থিগণের শিক্ষা ও সুখ সুবিধার প্রতি গবর্ণমেণ্টের যেরূপ যত্নচেষ্টা ও সতর্কদৃষ্টি রহিয়াছে সমগ্র বঙ্গ দেশের অন্য কোন অনুষ্ঠানের Institution এর জন্য ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও আছে কিনা সন্দেহ।

ডাওহিলের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি এমন সময় পশ্চাদিক হইতে কে যেন পৃষ্ঠদেশে সজোরে চপটাঘাত করিল, ফিরিয়া দেখি আমারই পুরাতন এক বাল্য-বন্ধু। বহুদিনের পর হঠাৎ এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে সাক্ষাৎকার হওয়ায় তিনি আমাদিগের উভয়কে একরূপ গ্রেপ্তার করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার বাসাতেই আমাদের উভয়ের মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন হইয়াছিল।

আমাদিগের তত্ত্ব তল্লাস করিবার জন্য তাঁহার আর্দ্দালিকে রাখিয়া তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। এক খাকী পোষাকধারী পাহাড়িয়া যুবক বীরপদক্ষেপে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল

তাহার ক্ষৌরমুণ্ডিত মস্তক, ভ্রূ ও মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না এবং কৌতূহল দমনে অসমর্থ হইয়া তাহাকে এরূপ ভাবে ক্ষৌর করাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে বেচারী নিতান্ত বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল যে সম্প্রতি তাহার ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, বহু পূর্ব্বেই মাতাপিতার মৃত্যু হওয়ায় খাস ছৈত্রীগণের সামাজিক রীতি অনুসারে জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে তাহাকে কেশ ভ্রূ সকলই মুণ্ডন করিতে হইয়াছে, অন্যথায় শুধু মস্তক মুণ্ডন করিলেই চলিত।

খাস ছৈত্রী কাহাকে কহে জিজ্ঞাসা করিলে সে শুধু "ছৈত্রী হো, ছৈত্রী হো" করিতে লাগিল, কিন্তু ছৈত্রী কি এবং যদি ক্ষত্রিয় হয় তাহা হইলে "ছৈত্রী" বলিবার তাৎপর্য্য কি ভাবিতে লাগিলাম। বন্ধুবর বাহিরে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিতান্ত বিজ্ঞের মত একটা গুরুতর রকমের ভণিতা করিয়া কহিলেন যে "ছৈত্রীর" ইতিহাস জানিতে হইলে প্রথমে খাস জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। খাস জাতির ঐতিহাসিক যুগ সঠিক নির্ণয় করা বড়ই কঠিন, তবে এরূপ অনুমান হয় যে গজনীর সম্রাট্ সুলতান মাহমুদ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণকালে যে সকল হিন্দু আপন আপন ধর্ম্ম ও মান সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত নেপালের আরণ্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত পার্ব্বত্য-সুন্দরীগণের সংমিশ্রণে যে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইয়াছিল তাহারাই "খাস" নামে অভিহিত হইয়াছে। "খাস" শব্দ বোধ হয় খস্‌নু শব্দ হইতে উৎপন্ন, খস্‌নু অর্থে মৃত্যু হওয়া, পতন হওয়া, সুতরাং মনে হয় যে যাহারা এই সকল নবাগত মার্জ্জিতরুচি বৈদেশিকগণের রূপগুণের মোহ আকর্ষণ হইতে আপনাদিগকে দূরে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহারাই এ নূতন জাতিটীকে অবজ্ঞাসূচক "খাস্ বা পতিত" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

ইহাতে সুন্দরীগণ মনঃক্ষুণ্ণ হইলে ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রণয়পাত্রীগণের সন্তোষ বিধানার্থ তাহাদিগের গর্ভসম্ভূত সন্তানগণকে এবং যে সকল পার্ব্বত্যবীর তাঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "জনই উপনীত"গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। এ নিমিত্ত আমরা আজকাল একই জাতির অন্তর্ভূক্ত কতকগুলিকে "জনই" ধারণ করিতে দেখি ও কতকগুলিকে দেখি না।

আবার, ব্রাহ্মণগণের ঔরসে হীন জাতীয়া পার্ব্বত্য রমণীর গর্ভে, অথবা ক্ষত্রীয় পিতার ঔরসে খাস মাতার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা শুধু "ক্ষত্রিয়" পদবী মাত্র গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্যার জং বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে কতকগুলি এই শ্রেণীর খাস আপনাদিগকে "ছেত্রী" বলিয়া খ্যাত করে, এবং সেই অবধি ছেত্রী হওয়া একটি ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ছেত্রী বলিয়া কোন জাতির অস্তিত্ব নেপালে কখনও ছিল না।

ছেত্রী উপাখ্যান সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই নানী আসিয়া সংবাদ দিয়া গিয়াছিল যে আহার্য্য প্রস্তুত, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনজনে খাইয়া আহার করিতে বসিলাম। আহারের আয়োজনের ত্রুটী ছিল না, কেবল একমাত্র মৎস্যের অভাবই পরিলক্ষিত হইল।

মৎস্যাদি কার্শিয়াং হইতে আনাইয়া লইতে হয়, কিন্তু কার্শিয়াংএ যে যৎসামান্য মৎস্য আমদানি হয়, তাহাতে স্থানীয় লোকেরই অভাব সম্পূরণ হয় না। যাঁহারা ষ্টেশন মৎস্যের ঝুড়ি দোকানে পৌঁছিবার সময় দৈবক্রমে উপস্থিত থাকেন তাঁহাদিগের ভাগ্যেই মৎস্যের ব্যঞ্জন ভোজন ঘটে, অন্যের পক্ষে মোটেই নহে। অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও কার্শিয়াং হইতে রবিবার হাটের দিন আবশ্যক মত ক্রয় করিয়া আনিতে হয় নচেৎ হাটবার ব্যতীত শাক সব্জী বা তরকারি কোন দ্রব্যের অনাটন ঘটিলে তাহা মিলিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে দার্জ্জিলিংএ বিশেষ সুবিধা কারণ শনিবার হইতেই হাটের জন্য অনেক জিনিষ আসিতে থাকে এবং রবিবার দিন শাক সব্জী তরকারি ও পেঁপে আনারস ভৃতি ফলও প্রচুর পরিমাণে হাটে আমদানি হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্যদিনেও "ষ্টলে" সকল প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য সদা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। কিন্তু কার্শিয়াংএ হাটের দিনেও যাহা আমদানি হয় তাহাও যথেষ্ট নহে, এবং মূল্যও দার্জ্জিলিং অপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ এই যে কার্শিয়াংএর চতুর্দ্দিকে শুধু চা বাগান, কৃষিদ্রব্যোৎপন্নোপযোগী জমি আদৌ নাই, কিন্তু সদর মহকুমার বহু খাসমহাল থাকায় সকল প্রকার দ্রব্যাদির প্রচুর আবাদ হয়।

আমরা যখন আহার করিতেছিলাম তখন বাহিরে বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের দেশের চেয়ে পাহাড়ে দেশের বৃষ্টির বেশ একটু বিশেষত্ব আছে লক্ষ্য করিলাম।

নর্ত্তকীরা যেমন নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়ায়, আবার পরমুহূর্ত্তেই ঝুনুর ঝুনুর শব্দে সমস্ত মঞ্চটি কাঁপাইয়া নাচিয়া উঠে, বৃষ্টিও তেমনি মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তকালের জন্য বিরাম থাকিয়া আবার পরক্ষণেই ভীষণ ঝুপ ঝাপ্ শব্দে টীনের ছাদটি প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্বিগুণ বেগে পতিত হইতেছিল।

আহারান্তে জানালার ধারে ইজি চেয়ারে বসিয়া প্রকৃতির অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিতেছিলাম, আহারটিও বেশ গুরুতর রকমের হইয়াছিল সুতরাং বাহিরের ঠাণ্ডায়ও বৃষ্টির শব্দে অল্পক্ষণ মধ্যেই জড়তা আসিয়া শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সত্বর বৃষ্টি থামার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া একটু নিদ্রাসুখ উপভোগ জন্য শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সবেমাত্র একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে এমন সময় কার্শিয়াং হইতে এক জরুরী চিঠি লইয়া বৃদ্ধ উপাধ্যায় আসিয়া সংবাদ দিল যে আজই দার্জ্জিলিং পোঁছিতে হইবে। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেই পরাধীন চাকরী-জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং বন্ধুপত্নী "এমন ঝড় জলে যাবেন কি করে, এর মধ্যে শিয়াল কুকুরও ত বের হয় না" ইত্যাদি বলিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। সহৃদয়া বন্ধুপত্নীর কথা শুনিয়া রূপসনাতনের গল্পের ধীবর পত্নীর উক্তি "ও কুকুর নয়, হয়ত কোন রাজকর্ম্মচারী হবে, নইলে এ দুর্য্যোগে কি আর কেউ বের হয়" মনে পড়িল।

যে দিন হইতে সাধ করিয়া দাসখতে নাম লিখাইয়াছি সে দিন হইতেই জানি যে নিকৃষ্ট সারমেয় কুক্কুরের জীবনে যেটুকু স্বাধীনতা আছে, পরাধীন দাসত্ব জীবনে তাহার কিঞ্চিনমাত্রও নাই। সুতরাং কৃত কর্ম্মের ফল—

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।

যেরূপই হউক না কেন তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে জানিয়া সকলের স্নেহের বন্ধন অগ্রাহ্য করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

পিছন্ হইতে নানী কহিয়া উঠিল "বাটো তো ছিপ্‌লো ভয়ো আরো, কছো হিড়্নু" সত্য সত্যই পথ বড়ই পিছল্ হইয়াছিল, কিন্তু স্বভাবসরল পার্ব্বত্য বালিকার মধুর সহানুভূতিসূচক

বাক্য আমার অন্তরে জাগরূক রহিয়া সকল পথকই ভুলাইয়া দিয়াছিল—

"The echo of the Voice enwrought
A human sweetness with the thought"

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

নিবেদন।

—:o:—

জানি না কবিতা ছন্দ লীলায়
রচিতে অর্ঘ্য তাঁর,
এ যে জীবনের বেদনার রাশি
অশ্রু-মুকুতা-হার।
ফোটেনি যে ফুল মরম-কুঞ্জে,
যে কথা লুকানো বুকে;
যে হাসি আমার হারায়েছে হায়
পাঁজরবিদারী দুখে;—
তারি ইতিহাস লেখনীর মুখে
মরম শোনিতে আঁকা;
ব্যথা বেদনার কণ্টকমালা
নয়ন সলিলে মাখা।
লিখি নাই কভু যশোবাসনায়
নিজ মনে গাহি গান;
আপনার আঁখি আপনি মুছাই;
কোথা পাব প্রতিদান ?

আর কেহ যাহা　চাহিবে না ফিরে
তুমি তুলে নিবে তাই ;
এই ত আমার　গরব কেবল ;
তবু সদা গান গাই।

শ্রীআশুতোষ রায়।

মোগল-সন্ধ্যা।

-:৹:-

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—লাল্‌কুমারীর বাসভবন, সুসজ্জিত কক্ষে আসনোপরি উপবিষ্ট জাহান্দার।

লাল্‌কুমারী দণ্ডায়মান।

জাহান্দার। আমায় কেন ডেকেছিলে, লাল্‌কুমারি ?

লাল্‌কুমারী। (ভান করিয়া) আমি ভুলে গিয়েছি, কেন আপনাকে আসতে বলেছিলাম। শাহজাদা, সে দিন আমায় দেখে আপনি বুঝেছেন, কেন স্বপ্নে এত নেশা ! আজ আমার দিকে চেয়ে সত্যি করে বলুন, আমি কি বাস্তবিকই সুন্দরী।

জাহান্দার। লাল্‌কুমারী ! তুমি সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দরী। যে দিন তোমায় আমি প্রথম দেখেছিলাম কি এক অসহ্য আনন্দের পুলক আমার মন প্রাণ ভরে দিয়েছিল। আমি কি দেখেছিলাম—এক মুহূর্ত্তে প্রভাতের ও সন্ধ্যার উন্মত্ত বর্ণোচ্ছ্বাস, বসন্তের তরলিত মাধুরীর অপূর্ব্ব তরঙ্গ লীলা, ক্ষিপ্র, চঞ্চল অথচ পূর্ণ আর শরতের জ্যোৎস্না রজনীর নির্ঝর প্রবহণ। হিমাচল শিখরের তুষারের অঙ্গে বিচ্ছুরিত দীপ্ত কিরণের মত, নীরব রজনীতে বীণার তারে ঝঙ্কৃত সঙ্গীতের মত কে তুমি নারী আমার জীবন-পাত্র সুখমদিরায় পূর্ণ করে তুলেছিলে—

লালকুমারী, সত্যিই বলছি নারীর এত রূপ, এত যৌবন,—পূর্ণ নিটোল উছল আর কখনও আমার চোখে পড়েনি।

লালকুমারী। শাহজাদা, তবে আমি সত্যই সুন্দরী! আপনার ঐ বিহ্বল আরক্ত চক্ষু কখনও মিথ্যে বলে নি। জোহেরা, দর্পণখানা নিয়ে আয় না। আজ নিজকে একবার ভাল করে দেখ্‌তে হবে। কতদিন কত প্রশংসায় আমার এ কুটীরখানি মুখরিত হয়ে উঠেছে কিন্তু মিথ্যা, ঘোর মিথ্যা বলে তাকে পায়ে ঠেলে দূর করে দিয়েছি। কিন্তু আপনার একথা আজ সত্য বলে মনে হচ্ছে কেন? না—আমি সব চাইতে সুন্দরী।

(জোহেরার প্রবেশ ও দর্পণ স্থাপন করিয়া প্রস্থান।)

(লালকুমারী দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া।)

আজ আমার রূপসায়রে কি জোয়ারই এসেছে—এই যে উজ্জ্বল চকিত চঞ্চল আঁখি দুটী বিদ্যুতের লীলাভূমি, এই যে আরক্ত তৃষা ব্যাকুলিত অধরযুগল প্রথম প্রেমের অরুণ স্পর্শে এই যে মোহন, শোভন, দীর্ঘলতায়িত বাহু, উচ্ছ্বলিত যৌবনের কুসুম নিগড়,—শাহজাদা, কত নিশিদিন আমি বসে আছি, আমার যৌবন বীথি নূতন পাতায় নূতন ফুলে সাজিয়ে, কবে আমার হিয়ার নিভৃত কক্ষে, আমার হৃদিকুঞ্জের কামন ছায়ায়—মিলনের বাঁশী বাজিয়ে অতিথি এসে বস্‌বে! আজ তুমি এসেছ; এস বাঞ্ছিত এস; এত সুন্দর আমি কার জন্যে? এ রূপ তোমার জন্যে, শাহজাদা, তনু মন সবই তোমায় দিয়েছি, এসো, বল একবার, এসব তোমারি।

জাহান্দার। লালকুমারী, চোখে তোমার একি দীপ্তি, কণ্ঠে তোমার একি আকুলতা, দেহে তোমার একি শিহরণ, তুমি কি বলছ?

লালকুমারী। আমি আবার কি বলব, শাহজাদা, এ দীপ্তি এ আকুলতা তুমি যে জাগিয়েছ, আজ তাকে অবহেলা কেন?

জাহান্দার। আমি তোমায় অবহেলা করছি না লালকুমারি। ভেবে দেখ সত্যি করে ভেবে দেখ এ ব্যাকুলতা তোমার চিরদিনের কি না; না এ শুধু ক্ষণিকের, আজ এসেছে, একূল ওকূল ভাসিয়ে, কাল চলে যাবে পল্লবের কুটীল কঙ্কাল রেখা এঁকে দিয়ে স্মৃতির রুক্ষ কঠিন বেলাভূমি...—যদি তাই হয় তবে সব ভুলে যাও।

লালকুমারী। শাহজাদা, সব ভুলে যাব,—কাকে ভুলে যাব! আমার এত সাধের সুখ-স্বপ্ন কেন ভেঙে দিয়ে যাব। জানিনা এ আমার চিরদিনের না ক্ষণিকের। যদি ক্ষণিকেরই, যদি জীবন শেষ হবার পূর্ব্বেই এ তৃষ্ণা মিটে যায় তাতেই বা কি ক্ষতি। যে দিন আজকের এই প্রকাণ্ড সত্যটা মিথ্যা হয়ে যাবে, সে দিন বুঝ্‌ব জীবনের সাঁঝ এসে পড়েছে। এই যে দেখ্‌ছ (জহর খচিত আংটী দেখাইয়া) আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে—অন্ধকার আস্‌বে অন্তহীন নিস্তরঙ্গ গাঢ় নীল.........।

জাহান্দার। লালকুমারী, তুমি আমার সব গুলিয়ে দিলে—তোমার বিপুল রূপের পসরা নিয়ে, আমার এই অতৃপ্ত আঁখির হাটে কেন বেসাতি নিয়ে, বস্‌লে? তোমার কামনার দীর্ঘ শ্বাসে আমার শান্ত, স্থির জীবন-সাগর কেন ফেনিল উচ্ছ্বাস ময় করে তুল্লে? ফিরে দাঁড়াও—তোমায় আবার দেখ্‌ব। এতরূপ! লালকুমারী, তোমার ও-রূপ আর কিসের বিনিময়ে বিক্রি করবে? বল......শিগ্‌গির বল......তোমায় আমি কিন্‌ব।

লালকুমারী। শাহজাদা, তোমাকে ত আমি সবই দান করেছি।

জাহান্দার। এতকাল রূপের ব্যবসা' করে এসেছ; কত আমীর কত ওমরাহ অর্থ দিয়ে তোমার ঐ রূপ ঐ দেহটাকে কিনেছে; আজকের কেনা বেচায় তোমার কি আপত্তি হতে পারে লালকুমারী? আমি তোমায় সব চাইতে বেশী মূল্য দেব।

লালকুমারী। মিছে কথা শাহজাদা।—মিছে কথা। শুধু হাসি শুধু চাউনী বিক্রয় করেছি, এ দেহ এখনও কেহ কিন্‌তে পারেনি।

জাহান্দার। হাঁ, বিশ্বাস করি লালকুমারী, কিন্তু তোমায় আমি সব চাইতে বেশী মূল্য দেব। আমার সব সম্পত্তি তোমার জন্য ত্যাগ করব। কেন কর্‌ব? জান? তোমার ঐ বিশ্ব আকাঙ্খিত রূপ পেতে হলে বড় কিছু একটা ত্যাগ করা চাই ই........অর্থ সে ত... ঝুঁটো। এত দিন সাম্রাজ্য সম্পদ প্রেম সৌন্দর্য্য সব ধর্ম্মের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আজ আমার সেই একান্ত ধ্যান তোমার রূপের জন্য ত্যাগ করব,—দেখি এ সাধনা ভোগের পূজা আমায় কোথায় নিয়ে যায়। লালকুমারী, আজ হতে আমি তোমার আর তুমিও আমার।

(মালা হস্তে জোহেরার প্রবেশ)

(গীত)

জোহেরা। সুন্দর নব বসন্ত অন্তরে তোমার
ক্লান্ত নয়নে মুছে ফেল ছল ছল জল ভার
ফাগুনের ফাগে রাঙ্গা উত্তরীয়, রেণু রাশি পরে বিছাইয়া দিও,
যৌবন কুঞ্জে পরাণপ্রিয়, এলো সখি খোল দ্বার
এস সুললিত, এস গো দখিন্ত কানন বীথি পিক কুহরিত
আন গন্ধবরণ রূপ সঙ্গীত পর গলে যুথি হার ॥

পটনিক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—মারবার রাজপ্রাসাদ কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ।

মহারাজ অজিত সিংহ ও রাণী দুর্গাবতী দণ্ডায়মান।

দুর্গাবতী। মহারাজ, শুনতে পেলাম তুমি আবার যুদ্ধে যাচ্ছ, সারা জীবন এত যুদ্ধ করেও তোমার সাধ মিটল না, এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু।

অজিত সিংহ। দুর্গাবতী, তুমি না রাজপুত কন্যা, আর রাজপুতের স্ত্রী! স্বামীর বীরত্ব গৌরবে তুমি যে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করবে, তুমি কি রাজপুত-নারীর মর্য্যাদা ভুলে গেছ, রাণী ?

দুর্গাবতী। রাজপুত নারীর মর্য্যাদা দুর্গাবতী ভোলে নি, মহারাজ। স্বামীর বীরত্বের জন্যই সে নিজকে এই রাজপুতনার মধ্যে সব চাইতে গরবিণী ও সৌভাগ্যবতী মনে করে। কিন্তু যে দিন হতে রাজপুত বীরগণ নিজের মাথার মুকুট স্বাধীনতা-রত্ন মোগল বাদশাহের অনুগ্রহ বিনিময়ে বিক্রয় করেছে আর মোগলের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আত্মসম্মান ও আত্ম শৌর্য্যকে বলি দিয়েছে—সে দিন হতে স্বামীর বীরত্ব রাজপুত নারীর কাছে একটা ভয়ের জিনিষ, একটা কলঙ্কের পসরা। এবার কার পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছো—মোগলের ?

অজিতসিংহ। এ যুদ্ধে দু পক্ষই মোগল। আমি যাচ্ছি শাহজাদা আজিমের পক্ষ হয়ে। বাহাদুর বাদশার মৃত্যু হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় পুত্র আজিমকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন। জ্যেষ্ঠ জাহান্দার আর কনিষ্ঠ জাহান এক পক্ষ হয়ে তাকে সাম্রাজ্য হতে বঞ্চিত করবার জন্য আয়োজন করেছে। তাকে সাহায্য করতে আজ তাই রাজসিংহকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আমিও শীঘ্র রওনা হব।

দুর্গাবতী। যাই হোক, তুমি তবে মোগলকেই সাহায্য করতে যাচ্ছ,—আচ্ছা, তোমার কি স্বার্থ এতে আছে?

অজিতসিংহ। আমার নিজের দিক্ হতে দেখতে গেলে স্বার্থ এতে আমার কিছুই নেই।

দুর্গাবতী। তবে?

অজিতসিংহ। দুর্গাবতি, জগতে সকল কাজই কি স্বার্থের দিক্ চেয়ে কর্ত্তে হবে?

দুর্গাবতী। তা বৈ কি?

অজিতসিংহ। এ তোমার অজিতসিংহের সহধর্ম্মিণীর মত কথা হল না দুর্গাবতি ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা হতে জগতে কোন বড় কাজই সম্পন্ন হয়নি। আমি চাই হিন্দু মুসলমানকে একত্র করে একটা বড় জাতির সৃষ্টি কর্ত্তে। দৃঢ় দেশাত্ম-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নব জাতিকে ধর্ম্মের বিভিন্নতা কিম্বা মতের বৈষম্য কিছুই একটুও নড়াতে পারবে না। শাহজাদা আজিম হিন্দু বিদ্বেষী নন্ তাই তাঁকেই আমি সম্রাট পদে স্থাপিত করতে চাচ্ছি। এই উপায়ে দুই জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হবে আর মোগল সাম্রাজ্যও এত সত্বর ধ্বংস হবে না।

দুর্গাবতী। মোগল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তোমার এত চেষ্টা। ভুলে গেছ সেদিনের কথা—এত ভুলও মানুষের হয়! তোমার স্বর্গগত পিতা যশোবন্ত সিংহকে এই মোগলবংশের সম্রাট ঔরঙ্গজেব কি করে হত্যা করেছিলেন—ভুলে গেছ মহাত্মা দুর্গাদাস তোমার কত যত্নে কত চেষ্টায় সেই পিশাচের গ্রাস হতে রক্ষা করেছিলেন। মোগল তোমার কি করেছে? ঐ চেয়ে দেখ ধ্বংসের কি অবিরাম দৃশ্যই তোমার চোখের সামনে প্রসারিত। মোগলের অত্যাচারে রাজপুতনা আজ শ্মশান। জনারের ক্ষেতগুলি মোগলের দেওয়া আগুনে ভস্ম হয়ে গেছে। স্বর্ণশীর্ষ মন্দিরগুলি যারা প্রভাতের আলোকে অগ্নি শিখার

মত দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ত তারা চূর্ণ হয়ে একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশে গেছে—আর সেখানে স্থাপিত হয়েছে মোগলের নাটাশালার আর প্রমোদভবন। সব ভুলে গেছ, নাথ, তুমি সেই যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিতসিংহ আজ মোগল সাম্রাজ্যটাকে ধ্বংসের মুখ হতে রক্ষা করতে যাচ্ছ ?

অজিতসিংহ। কিছুই ভুলিনি। যদি পিশাচ ঔরঙ্গজেব এখন বেঁচে থাকত তবে সেই প্রতিশোধ গ্রহণ না করে কখনও ছাড়তুম না। কিন্তু আজ ত সেই প্রবৃত্তি আমার মনে জাগতে পারে না। প্রতিহিংসা—এটা জঘন্য মনোবৃত্তি। এই প্রতিহিংসা সাধনের জন্যেই জয়চাঁদ মুসলমানকে ভারতে আহ্বান করে দেশের গলায় পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সেই প্রতিশোধ নেবার জন্য যদি হিন্দু মুসলমানের হিংসাটাকে নূতন করে উস্‌কিয়ে জালিয়ে তুলি তবে আমাদের উভয়কেই দুর্ব্বল দেখে ভারতের বাইরে থেকে মুসলমানেরই মত আর এক নূতন জাতির সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য আগমন একবারেই বিচিত্র নয়। জেনে শুনে দেশের পায় এত বড় একটা কঠোর নিগড় পরাতে পারব না, দুর্গাবতি।

দুর্গাবতী। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তার উপর নির্ভর করে আজকের এই দাসবৃত্তিটাই ভাল। মহারাজ এ তোমার কাপুরুষের ছলনা মাত্র।

অজিতসিংহ। দুর্গাবতি! কি নিষ্ঠুর আঘাতে তুমি আমার সুখ স্বপ্নের সৌধটাকে এখন নির্ম্মম হয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছ—এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ মন নিয়ে তুমি আমার সহধর্ম্মিণীত্বের দাবি কর ? যেদিন তোমায় আমি এই উন্মুক্ত বক্ষে স্থান দিয়ে মারবার-রাজলক্ষ্মী করে এই গৃহে বরণ করে এনেছিলেম এখন বুঝেছি সেদিন সুখের নয় পরম দুঃখের,—আমি কি ভেবেছিলাম আর আমার কি হয়েছে. দিনের পর দিন নিশার বেদনায় হৃদয় মুসড়ে যাচ্ছে। দুর্গাবতী, এ দুঃখ শুধু আমার নয়। তোমার মুখ দেখেও বুঝ্‌তে পারছি কি অসহ্য ব্যথা তোমার অন্তরের মাঝে বাসা করে বসেছে। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনের আগুন নিভে যাক্। আদর্শের মিলনে আমাদের মিলন নূতন করে সংঘটিত হক।

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—শিবির। সময় রাত্রি। জাহান ও হামিদ খাঁ।

জাহান। হামিদ, কাল প্রভাতেই যুদ্ধ আরম্ভ করতে হবে, শুনলাম মহারাজ অজিতসিংহ যুদ্ধে আসছেন। রাজপুত সৈন্য পৌঁছবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে হবে—তা না হলে জয় পরাজয় একটা বিষম অদৃষ্টের কথা হয়ে দাঁড়াবে।

হামিদ। শাহজাদা, কিসের ভয়? মহারাজ অজিতসিং টিং যেই আসুক হামিদ কাউকেও ভয় পায় না।

জাহান। রাজপুত জাতি যুদ্ধ করতে জানে, প্রাণের মমতা একবারেই রাখে না। এত বড়াই করছো—দেখো আবার কাজের সময় পেছিয়ে পোর না।

হামিদ। শাহজাদা, আমি সেনাপতি জুলফিকার খাঁর সঙ্গে অনেক যুদ্ধ জয় করেছি—দু' একটা বড় রকমের কৌশলও যে না শিখেছি তা' মনে কর্ব্বেন না—তলোয়ার খেলা না খেলেও হাতিয়ার একটী বার মাত্র না ঘুরিয়েও যুদ্ধ জয় করা যায়,—বুঝলেন?

জাহান। (ঈষৎ হাসিয়া) সে কি রকম হামিদ?

হামিদ। আপনারা কি করে জানবেন বলুন, এতে অভিজ্ঞতা চাই, মাথা পাকান চাই।

জাহান। আরে বলেই ফেল না।

হামিদ। এই ধরুন, শাহজাদা আজীম আছেন আর সঙ্গে রয়েছে সেনাপতি রুস্তমদিল্ খাঁ

জাহান। বেশ, তার পর।

হামিদ। শাহজাদা আজীম রুস্তকে খুব বিশ্বাস করেন, আর রুস্তমের উপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে বেশ খোকা কোরাণ আর কাফেরদের সেই কি কেতাব গুলো......নামও জানিনে ছাই......নিয়ে দিন গুজরাচ্ছেন। বেশ এখন যুদ্ধ করার অর্থ হ'ল সেনাপতি রুস্তমটাকে জয় করা।

জাহান। তারপর।

হামিদ। তারপর খুব সোজা পথ—রুস্তমটাকে হাত করতে পারলেই হয়। জুলফিকার খাঁ বলছেন........................।

জাহান। জুলফিকার ব'লছে?

হামিদ। না, না জুলফিকার ঠিক্ এ-এ এই কথা বলেনি, তবে যেন বলেছিল যে প্রত্যেক মানুষেরই একটা মূল্য আছে—কারো কম আর কারো বেশী। সেটা দিতে পারলে একেবারে কিস্তিমাৎ; রুস্তম যদি একবার ঘুরে বসে তবেই আজীমকে সিংহাসন পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে একেবারে সটান পরে-আকার দিতে হবে।

আহান। হামিদ খাঁ, চুপকর, সয়তানের মত ফিড় ফিড় করে একি বকৃছ জানো না এ ভাইএ ভাইএ যুদ্ধ—তোমার ঐ ঘৃণিত কৌশলের স্থান এ নয়।

হামিদ। শাহজাদা, যেখানে যে উপায় অবলম্বন কর্লে সহজে কার্য্য সিদ্ধি হয় সেখানে সেইটাই যে প্রকৃষ্ট কৌশল।

আহান। এ নীতি তোমার হতে পারে... ....,হামিদ,.........কিন্তু আমার নয়। পিশাচ, বিশ্বাসঘাতক তুমি আমায় নীতি শিক্ষা দিতে এসেছ ?......এ যুদ্ধে তোমার কোনই প্রয়োজন নেই, তুমি এখনই আমার শিবির ত্যাগ করে যাও। হামিদ, তোমার ঐ ঘৃণিত উপায়ে সিংহাসন লাভ কর্বার চাইতে—এই যে দেখ্‌ছ ধূধূ কর্চ্ছে মাঠ ওখানে কাল যদি আমার চির-শয্যা হয়, তা হ'লে আমি সহস্রগুণে সুখী হব।

হামিদ। কেন রাগ কর্চ্ছেন, শাহজাদা ? আমি শুধু সেনাপতি জুলফিকার খাঁ যা বলেছেন তাই বল্‌ছি।

আহান। হামিদ, সংসারে সবাই জুলফিকার নয়। জুলফিকারও আছে আহানও আছে। আজ এ যুদ্ধে তোমাকে আমার উপদেশ মত চল্‌তে হবে। যদি তুমি স্বীকৃত হও তবে থাক, নইলে তোমায় আমার প্রয়োজন নেই।

হামিদ। হাঁ শাহজাদা।

আহান। দুঃখিত হয়োনা, হামিদ—আমি কাপুরুষতাকে ভয়ানক ঘৃণা করি। তাই তোমার সেই কাপুরুষতাটাকে দেখ্‌তে পেয়ে জলে উঠেছিলাম।

হামিদ। শাহজাদা, জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ কার্য্যে অতিবাহিত করেছি—কেবল জান্‌তাম যুদ্ধ জয়—ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায় কিছু কোনদিন ভেবে দেখিনি। যাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছি তাদের মধ্যেও কোন মহত্ব আমার চোখে পড়েনি।

জাহান। আমি সব বুঝেছি—কুচক্রী, হীন, কাপুরুষ জুলফিকারের কাছ থেকে তুমি এ শিক্ষা পেয়েছ। জুলফিকারের সঙ্গে আমি একবার মাত্র দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে গিয়াছিলেম—দেখ্‌লাম মোগলের প্রধান সেনাপতি যত বড় বীর তার চাইতে বেশী কাপুরুষ। ক্রোধে ক্ষোভে যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে এলাম—পিতাকে বলে ছিলাম জুলফিকার খাঁ কাপুরুষ, তাকে বরখাস্ত করুন; পিতা হেসে বল্লেন, এ কাপুরুষতাও কিনা একটা রণকৌশল বা রাজনীতি। কি প্রকাণ্ড ভুল! হামিদ, সত্যপালনে বরং ভেঙ্গে যাওয়া ভাল তবু মিথ্যাকে আশ্রয় করে বড় হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা। যাও হামিদ, কাল প্রভাতেই আক্রমণের উদ্যোগ কর, আমি সৈন্যের অবস্থান, মানচিত্রের সাহায্যে ঠিক করে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাও।

হামিদ। আদাব, শাহজাদা।

(সকলের প্রস্থান।)

পট নিক্ষেপণ।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গাবক্ষে আশ্রম। কাল—সন্ধ্যা।

প্রেমদেব।

(গীত)

প্রেমদেব। বাইছে কে ঐ শেষ খেয়ারি তরিখানি

চিরদিন কাহার বীণায় এমনি শোনায় ওপারের ঐ মধুর বাণী

সে যে আকাশ নীলে অসীম ছেয়ে

প্রাণে অসীম হয়ে,

আপনি এসে ডাক দিয়ে নেয়

কোন সুদূরে কি জানি?

সন্ধ্যা এলে আঁধার হয়ে

দীপটি সেথায় জ্বলে,

কোলে ডেকে ঘুমিয়ে দেয়

খেলা ধুলোয় সব গ্লানি।

(বলে) ওই পারেরি ওই অজানায়
প্রাণে বাতাস ভরা,
চারিদিকে তার সুরে রূপে
চির নবীন জীবনখানি।
মরণ সেথায় মরে আছে
এই খেয়ারি ঐ পারে,
এমি মরণ মর্ত্তে পেলে,
জীবন জনম ধন্য মানি॥

সাঁঝের আঁধার পৃথিবীর বুকে ঐ নেমে এসেছে, আমাদের জীবন নদীর পারেও একদিন এ রকম একটা করাল ছায়া এসে পড়বে সে আমাদের জীবনের শেষ! মৃত্যু চিরশান্তিময়—মৃত্যু জগতের নিয়ম কিন্তু কোন মরণ আমাদের বরণীয়? এই হৃদয়ের স্পন্দন, এই সুখদুঃখের নিয়ত উচ্ছ্বাস চিরকালের মত থেমে যাওয়ার পূর্ব্বে একটা মহৎ ব্রত শেষ কর্‌বার জন্যে জীবনপণ সেই কি আমাদের শ্রেয় নয়? ঐ মহৎ ব্রত হল আমাদের মায়ের মুখে সেই প্রশান্তির হাসি ফুটিয়ে তোলা। মা তোর ঐ কালিমা কি করে দূর হবে একবার বলে দে মা! একবার বলে দে কি কর্‌লে অতীতের সরল সহজ জীবনধারা অমৃতে পূর্ণ হয়ে এ বাংলার গৃহে গৃহে হাসির প্লাবন এনে দেবে? দুঃখ-দৈন্য-জর্জ্জরিত বাঙ্‌লার সন্তান একবার জাগো, গৌরবময় অতীতকে ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করো, তাতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, দেশমাতার লক্ষ লক্ষ নয়নে দরবিগলিত ধারায় তোমার জন্য শোকাশ্রুর উষ্ণ প্রস্রবণ ঝর্ ঝর্ করে ঝর্‌বে।

(তিন জন সেবাব্রতচারীর প্রবেশ)

১ম সেবাব্রতচারী। কি গুরুদেব কেন ডেকেছেন?

প্রেমদেব। হাঁ তোমাদের ডেকেছি সম্মুখে তোমাদের একটা বড় কর্ত্তব্য এসে পড়েছে। আর্ত্তের সেবাকে তোমরা জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছ। সেই ব্রত উদ্‌যাপনের একটা সুযোগ আজ তোমরা পাবে। বাঙ্গালী সৈন্য যুদ্ধে যাচ্ছে। যুদ্ধে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য আজই তোমাদের আমার সঙ্গে রওনা হতে হবে। সকলে প্রস্তুত হও।

২য় সেবাব্রতচারী। যে আজ্ঞে, গুরুদেব!

(প্রমদের গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপ)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী নাম তৃতীয় বল্লীর আভাসে!

—:০:—

কোন্ এক বসন্ত প্রভাতে,
গিরীন্দ্র শিখর চূড়ে হিমমুক্ত রবিকর পাতে,
চির শান্ত স্নিগ্ধ তপোবনে,
বন্দনা জাগিয়াছিল ঝঙ্কৃত সামবেদ গানে!
অতুলন অরূপ রতন!
বৈতালিক কলস্বরে গায়, গায় দখিন পবন
প্রভাতের আরক্ত আভাসে,
তরুশিরে, ফুলদলে কি বিচিত্র বরণ বিকাশে:
বর্ণে, গন্ধে, গানে উছলিত,
অপূর্ব্ব এ ফুলবনে ফুলশর চির পরাজিত!

লুব্ধ কাম সঙ্গোপনে ফিরে !
আজন্ম তপস্বী কোথা, পলকের মনোজ বিকারে,
উর্ব্বশী অঞ্চল তল চায় !
লাজরক্ত দিনমণি, ফুলদল সরমে শুকায়,
লীলাময় লীলা ওঠে ফুটি !
সৃষ্টির সরোজ সম, শকুন্তলা মেলে আঁখি দুটী।
কামনার পঙ্কিল পল্বলে !
দীর্ঘালস মগ্ন ঋষি, চাহে ফিরে আলোক হিল্লোলে !
নমিত সে দীর্ঘ জটাভার !
জননী গৌরব তলে,—মাতৃমূর্ত্তি হীন গণিকার।
নহে অন্ধ বিলাসের খেলা !
মাতৃত্ব তুলসীদলে নয় আর, নহে অবহেলা।
প্রনমি ফিরিয়া চলে ঋষি !
স'রে গেছে তপোবন,—স্খলিত সে পুণ্যালোক রাশি,
কার কত যুগান্ত অর্জ্জিত !
পবিত্র অগ্নিনালয়, শূণ্য আজি ম্লান লজ্জাহত,
সুপবিত্র ঋষির আশ্রমে !
ওই যে কল্লোল বহে ভেদি কার গোপন মরমে,
প্রিয়তম পরশ আকুলা !
নবোঢ়ার মত ধরা ;—এলায়িত কুসুমকুন্তলা,—
নবজাত কিশলয় সাজে !
অমর জীবনাকাঙ্ক্ষা জাগে কার মরমের মাঝে !

অরূপ, অসীম, নিরাকার !
মাণিকের আভাসম কার চোখে জ্যোতি জাগে তাঁর ?
বরুণের শ্রীচরণ ছায় !
তরুণ কুমার ভৃগু, কোন্ ধন সকাতরে চায় ?
তৃষাতুর কি সে অভিলাষ ?
চপল তরুণ চিত,—চাহে কিগো নারী বাহু পাশ ?

আপনারে শৃঙ্খলিত করি,
চুম্বন মদিরা পিয়ে, অবসান দিবা বিভাবরী ?
নহে, নহে উদার নয়ন
হেরি দীর্ঘ যাত্রাপথ, পাথের যে করিছে স্মরণ,
অপূর্ণ, তৃষিত হিয়া মাঝে !
দীন সে ভিখারী নিত্য, কি বৈভব সকাতরে যাচে !

বিরহিণী রমণীর প্রায়,
প্রিয়তম কান্ত পদে আপনাকে বিকাইতে চায় !
কিন্তু কই কোথা সেই ধন ?
দাও পিতা ব্রহ্মজ্ঞান এ পিপাসা কর নিবারণ !
বরুণের মহান্ বচন !
নির্দেশিল পঞ্চদ্বার অন্ন, প্রাণ, চক্ষু শ্রোত্র মন,
লহ খুঁজে বাঞ্ছিত বল্লভ !
ইন্দ্রিয় অগম্য তিনি অনির্দেশ্য অনন্ত পল্লব !

তপস্যান্তে বুঝিলা বারুণী !
অন্ন প্রাণ; জীবাধার, অন্নই কি সেই দিনমণি ?

পুরিল না, পুরিল না প্রাণ!
কই পিতা দাও মোরে,—দাও সেই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান!
সংশয়াকুলিত মোর মন!
দেখ বৎস, খুঁজে দেখ, মন তিনি দেখাবার ধন!
সুদীর্ঘ সাধন অবশেষে!
ভাবে ঋষি প্রাণ ব্রহ্ম, নহে নহে প্রাণ কহে হেসে!
আবার, আবার কর তপ!
হৃদয় মন্দিরে তুমি নিজে কর দেবতা আরোপ!
দেখে নাও কি তব বাঞ্ছিত!
মন কি বিজ্ঞান ব্রহ্ম? নহে, নহে, পূর্ণ নহে চিত!
কর বৎস কর অন্বেষণ।
আনন্দে ভরিল হিয়া, ভূমানন্দে ভরিল ভুবন!
এ যে তৃপ্তি অনির্ব্বচনীয়!
সৎ, চিৎ আনন্দ রূপ, তৃষিতের প্রাণাধিক প্রিয়!
ভার্গবীয় সুধা উচ্ছ্বসিত!
বুঝেছি আনন্দ তিনি, প্রাণ মন জ্ঞানেরও অতীত!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মভাব।

—:o:—

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়ান নামক সংবাদপত্রের একজন বিশেষ সংবাদদাতা লখনৌ হইতে সেই সংবাদপত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"সাধারণ একটা বিশ্বাস এই যে ইয়োরোপের লোক অপেক্ষা ভারতবাসী অধিকতর ধর্ম্মভাবাপন্ন আধ্যাত্মিক এবং আত্মবাদী এবং ইয়োরোপীয়ের মত তত জড়বাদী নহে। এই বিশ্বাসটা কি প্রকৃত? আমি এই প্রশ্নটা ইউরোপীয় এবং ভারতীয় শিক্ষকদিগকে করিয়া এবং ছাত্র ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মুখে ধর্ম্মভাব এবং মনোভাবের কথা শুনিয়া আমার নিজের একটা ধারণা গঠন করিয়াছি। একজন বহুদর্শী ভারতীয় শিক্ষক যিনি ভারতীয়দিগকে এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইয়োরোপীয়দিগকে জানেন তিনি এতৎসম্বন্ধে যে মত পোষণ করেন সেই মতটা আমিও গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহার সিদ্ধান্তটা এইরূপ; পূর্ব্বদেশেই কি পশ্চিমদেশেই কি আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ প্রবল ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব উভয় এই বিরল। ইংরেজ বালক অপেক্ষা ভারতীয় বালক অধিকতর ভাবগ্রাহী (Impressionable) and ভাবুক (Emotional). ভারতীয় বালককে তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের কথা মনে করাইয়া কোন কথা বলিলে সে সেই কথা মন দিয়া শুনিয়া থাকে কিন্তু ইয়োরোপীয় বালক সেরূপ কথায় বড় মন দেয় না। আরও একটা কথা এই যে আর্থিক অবস্থা এবং জলবায়ুর অবস্থার ফলে ভারতবাসীর জীবনী শক্তি অল্প এবং সে জীবনকে তেমন দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিতে পারে না। আত্মরক্ষার Instinct (সহজাত জ্ঞান)ও তাহার দুর্ব্বল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া সে অবস্থাকে অতিক্রম করিবার অধ্যবসায় তাহার অল্প এবং কোন অজ্ঞাত শক্তির ইচ্ছায় নির্ভর করিতেই সে ইচ্ছুক। সেইজন্য ধর্ম্মভাবাপন্ন, ধ্যান করা তাহার পক্ষে সহজ। অন্য পক্ষে ভারতের ছাত্র অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া গুরুভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। বাইশ বৎসর বয়স্ক ইংরেজ বালকের মনে যে সকল ভাব উদিত হয় সেই সকল ভাব ভাবিয়া দেখিবার সময় তাহার আছে। সেই বয়সে

ভারতবাসীর দুই তিনটী সন্তান হয় সুতরাং তাহার সমস্ত চিন্তা এবং প্রচেষ্টা তাহার পরিবারের ভরণ পোষণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেই নিয়োজিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সে সর্ব্বাপেক্ষা অতি অধিক পরিমাণে জড়বাদী। ইহাতে তাহাকে বিশেষ দোষী মনে করা যাইতে পারে না।'

"গাম্ভীর শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিয়াও আমি ভারতীয় যুবকদিগের একমাত্র ধর্ম্মভাব এই দেখিয়াছি যে স্বদেশের জন্য এবং স্বজাতির জন্য আত্মত্যাগ করা তাহাদের ইচ্ছা। এই ভাবটা একরূপ সাধারণ এবং যথেষ্ট প্রবল। প্রমাণ শত শত রাজনৈতিক কারাবাসী এবং আকালীগণ।"

"কখন কখন আমি এমন মধ্য বয়স্ক ও বৃদ্ধদিগকে দেখিয়াছি যাহারা জীবনের অনেক সময় ধর্ম্মভাবের ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া থাকে। "ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ", "নিজের ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরে নিমজ্জিত করা", "ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব এমন কি যাহা কষ্টকর এবং অপ্রীতিকর তাহাতে তাঁহার ব্যাপিত্ব এই সকল কথা দ্বারাই তাহারা তাহাদের ধর্ম্মভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কখন কখন আমার মনে এরূপ ভাবও উদিত হইয়াছে যে এই সকল লোক মনে করে যে পেটেণ্ট ঔষধের মত তাহাদের ধর্ম্ম তাহাদিগকে এই নশ্বর জগতের দুঃখ কষ্টের সুতীব্র অনুভব হইতে রক্ষা করে।

"পল্লীগ্রামের ধর্ম্মভাব আবার আর এক প্রকারের। কিন্তু সেই ধর্ম্মভাব কি রোমান কাথোলিক ইয়োরোপের পল্লীগ্রামের ধর্ম্মভাব অপেক্ষা অধিক? আমি ঠিক্ বলিতে পারি না। আইরিশ কৃষকের ধর্ম্মভাবের শক্তি ও দুর্ব্বলতায় বিষয় আপনারা অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে অবগত আছেন। আমি এমন দুই একটা সংবাদ বলিতেছি যাহা হইতে ভারতীয় পল্লীগ্রামের ধর্ম্মভাবের প্রকার ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। প্রথমে ইহার কুৎসিত দিক্‌টাই দেখা যাউক।

দেবতাকে জুতা মারা।

"দুই বৎসর গত হইল একজন ভারতীয় পল্লীগ্রামবাসী একজন ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে আনীত হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে সে এমন একটা কাজ করিয়াছে তাহাতে তাহার প্রতিবেশীদিগের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগিতে পারে। ম্যাজিষ্ট্রেটের

রায় হইতে দেখা যায় যে লোকটা গ্রামের মন্দির হইতে সেই দেবীমূর্ত্তিকে টানিয়া প্রকাশ্য পথে লইয়া দেবীর মাথায় কয়েক ঘা জুতা মারে। বিচারকের সহানুভূতিটা বিবাদীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। বিবাদী প্রমাণ করিল যে সে দেবীর পরম ভক্ত ছিল—তাঁহার পূজার সে বহু ব্যয়ও করিত। দেবীর পক্ষ হইতে এমন কোন কথা বলা হয় নাই যাহা হইতে এরূপ প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি তাঁহার পূজার কোন ত্রুটি করিয়াছে। কিন্তু এত ভক্তি সত্ত্বেও বিবাদীর অল্পদিনের মধ্যে ধৈর্য্যচ্যুতিকারক গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল। একমাসের মধ্যে তাহার লাঙ্গলবাহী গরু দুইটা, তাহার স্ত্রী এবং পুত্র মরিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনা তাহার অপরাধের গুরুত্বটাকে ক্ষীণ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং দেবীর প্রতি তাহার ক্রোধ স্বাভাবিক এবং মার্জ্জনীয়। অন্য পক্ষে তাহার কার্য্য দ্বারা যে তাহার প্রতিবেশীরা তাহাদের ধর্ম্মভাবে বড় আঘাত পাইয়াছিল তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আদালত যদি এরূপ নির্দ্ধারণ করেন যে লোকটা তাহার ব্যক্তিগত বৈর সাধন করিয়া কোন অপরাধ করে নাই তাহা হইলে সেই নির্দ্ধারণও বিপজ্জনক হইবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আদালত তাহার প্রতি এক মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ করিলেন।

"এখন আমরা গ্রাম্য ধর্ম্মভাবের চিত্তাকর্ষক দিকটার প্রতি দৃষ্টি করিব। দুই জন কুলি পরস্পর কথা কহিতে কহিতে বাজারে যাইতেছিল। প্রথম ব্যক্তি তাহার প্রভুর কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিয়াছিল—কিরূপে তাহার পরিশ্রমের ফলেই তাঁহার ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইয়াছিল তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিতেছিল। সে তাহার কার্য্যের জন্য প্রভুর নিকট হইতে যৎসামান্য পুরস্কার পাইয়াছিল বা পাইবে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দুঃখ করিতেছিল। প্রথম ব্যক্তি তাহা শুনিয়া বলিল 'তাহাতে কি আসে যায়? আমি সর্ব্বদাই সরলভাবে এবং বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করিয়া থাকি, ঈশ্বর আমাকে অবশ্যই একদিন পুরস্কার দিবেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন কর্ত্তৃপক্ষ এই আলাপটা শুনিয়াছিলেন এবং আমাকে পল্লীগ্রামের ধর্ম্মভাব কিরূপ তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছিলেন। এই আখ্যানের উপরে আমি নিম্নলিখিত আখ্যানটী জুড়িয়া দিতে পারিয়াছিলাম। কিছুদিন গত হইল আমি একটী ব্রাহ্মণের,—পেনশন প্রাপ্ত কর্ম্মচারী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া এক জন ব্রাহ্মণ উকীলের নিকট হইতে এই উত্তর পাইলাম যে, তিনি ভালই আছেন তাঁহার তিনটী পুত্রই ভাল কাজ পাইয়াছে। তিনি সৎপথে থাকিয়া

সরকারের চাকরী করিয়া ও পদোন্নতি লাভ করিলেন না একজ ঈশ্বর তাঁহাকে তিনটী পুলবার দিয়াছেন।

"আবার সে দিন আমি এক জন পুরাতন-তন্ত্রের পল্লীবাসী হিন্দু জমিদারের সহিত একজন হিতার্থীর সাহায্যে আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি ভূমির উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার কারণ কি? তিনি প্রথমে বলিলেন সংসারে পাপের বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া। তিনি আর একটা কারণের কথা বলিলেন। যে কারণে এই যে নগরে ইন্ধনের মূল্য বাড়িয়াছে। ইহার ফলে লোকের গবাদির বিষ্ঠা মাটিতে ফেলিয়া না দিয়া শুকাইয়া তাহা ইন্ধনরূপ নগরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেছে। তাহার আবার সেই বিষ্ঠার সহিত মাটি মিশাইয়া থাকে। এরূপ পাপের ফল অবশ্যম্ভাবী।

"ভারতবাসীর মোটামুটি ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে আমি এই মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। গ্রামে, ধর্ম্মের অর্থ পুরস্কার ও দণ্ড। কখন কখন ইহা যেন একটা চুক্তি। শিক্ষিত বৃদ্ধগণ বিবেচনা করেন যে ধর্ম্মের অর্থ Philosophic resignation (অর্থাৎ যাহা ঘটে বিনা প্রতিকারের চেষ্টায় বা বিনা প্রতিবাদে তাহা গ্রহণ করা) অথবা উদ্বেগ নিবারণের উপায় (Prevention of warry). জাতীয়তা-বাদী যুবকদের বিবেচনায় ধর্ম্মভাবের অর্থ দেশের জন্য আত্মত্যাগ। দেশের মঙ্গলটা যে কি এবং কিরূপে সেই মঙ্গল সংসাধিত হইবে তাহা তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া বিশেষ সাবধানে গবেষনা করা প্রয়োজন মনে করেন না।"

প্রকৃত ধর্ম্মভাব কি তদ্বিষয়ে বারান্তরে সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

ভারতের দুর্ভাগ্য।

ভারতভূমি জগতের জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মতত্ত্বের আদি জননী। প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্ ঋষি মহোদয়গণ বলেন, বহু পুণ্য ফলে লোকে এই পবিত্র কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

ভারতবাসী এক সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে সমগ্র ভূমণ্ডলের শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় ও বুদ্ধিবিপাকে অদ্য সর্ব্ববিধ অধোগতি প্রাপ্ত। বস্তুতঃ বুদ্ধিবল উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির বুদ্ধি কস্মিন কালেও উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে না। পরন্তু এতদ্দেশে রাজসিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এতদ্দেশবাসীর চিন্তাস্রোত রাজসিক ভাবাপন্ন, বুদ্ধিবৃত্তি মোহাভিভূত, আত্মাভিমান ও আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হওয়ায় স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি তাহাদের ভক্তি হ্রাস হইয়াছে। নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার মোহময় জালে আবদ্ধ হইয়া ভারতবাসিগণ এক্ষণে দেশের অনেক পুরাতন উৎকৃষ্ট প্রথা বর্ব্বরোচিত ও পূর্ব্বপুরুষদিগকে অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য বিবেচনা করিতেছে।

প্রাচীন রীতিনীতি ও শাস্ত্রবিধির প্রতি অবহেলা করিয়া পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে সমুচিত যত্ন চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া সকলই স্ব-প্রধান হইয়া উঠিতেছে।

সাধারণ দলাদলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, উহা বর্ত্তমানেও আছে, পূর্ব্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কোন্ সংসার গার্হস্থ্য কলহ পরিশূন্য? কোন্ সমাজে দলাদলি নাই? কোন্ সভায় স্বাধীন মতাবলম্বী সদস্যেরা নির্ব্বিরোধ? এমন যে সুসভ্য সুসংযত বৃটিশ পার্লামেন্ট তাহাতেও সদস্যদিগের মধ্যে অসম্প্রীতির নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এমন কি সুসভ্য সুশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে সময়ে সময়ে বাক্যালাপ বন্ধ হয়। ঈদৃশ অবস্থায়ও তাঁহারা

[illegible] জাতীয় ও সামাজিক জীবনের উন্নতিকল্পে সকলে একমত। কিন্তু এতদ্দেশীয় সমস্ত [illegible]গুলি ভীষণ বিভীষিকাময়, উহা দ্বারা জাতীয় ও সামাজিক জীবনের উন্নতি ব্যাপারে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। শিক্ষাপদ্ধতিতে ধর্ম্মের অবস্থিতির অভাবে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে না। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত নাই।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের বর্ত্তমান উন্নতির মূল। তদ্ধেতু আমরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছি। কিন্তু আমরা এবম্বিধ মোহান্ধ যে, ইংরেজী গ্রন্থে বিজ্ঞান বিদ্যার আভাস পাইয়াই আত্মহারা হইয়াছি। এতজ্জন্য সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিকতা প্রকাশে আমাদের আগ্রহ বাড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কার সমূহকেও বিজ্ঞানবিরোধী ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেও আমরা অগ্রসর হইয়াছি। পরন্তু বিজ্ঞান বিদ্যার সহিত প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের অদ্যাপি যে আদৌ পরিচয় হয় নাই; তাহা আমরা সম্যক বুঝিতে পারিতেছি না। এতদ্দেশে বিজ্ঞানবিদ্যা পুস্তকগত হইয়াছে। উহাদ্বারা আমাদের বুদ্ধি বা চিত্তের কোনও সংস্কার হয় নাই এবং দেশের উপভোগ্য শিল্পজাত বস্তু সংবর্দ্ধিত অথবা স্বল্প মূল্য হইয়া উঠে নাই। অধিক কি, আমাদের ছাত্রেরা অদ্যাপি জাপানী ছাত্রদিগের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদিগকে বলিতে শিখে নাই; "Please, Sir, We don't want to read American and European history any more, we want to read how balloons are made." সুদীর্ঘ কালের ইংরেজ সংসর্গ ও ইংরেজী শিক্ষার পরও আমাদিগের মধ্যে যে বিজ্ঞান-প্রীতির সঞ্চার হয় নাই; জাপানীদিগের মধ্যে ত্রিংশৎ বৎসরে সে বিজ্ঞান প্রীতি অভূতপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। তজ্জন্য জাপানী শিল্পপণ্যে ভারতীয় বিপণী শ্রেণী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কিরূপ অন্তঃসার শূন্য তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অথচ এই শূন্য গর্ভ শিক্ষার মোহে আমরা অভিভূত হইয়া প্রাচ্য সুনীতি সদাচার ও আত্মদৃষ্টি হারাইতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মহোপকারক অংশ অস্মদ্দেশে প্রচারিত হয় নাই, যে অংশ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা অহেতুক সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিতেছি। সেই বিপ্লবের আবর্ত্তনে পড়িয়া আমাদের কর্ম্মশক্তি বহু পরিমাণে ভস্মীভূত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিশ্লেষণ কার্য্যে বিশেষ পটু; জগতে ঐক্যের মধ্যে কোথায় অনৈক্য

আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা প্রধান অঙ্গ। পক্ষান্তরে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান—এই বৈচিত্র্যময় জগতে চর্ম্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান পার্থক্যের বিনাশ পুরঃসর বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহার মধ্যস্থিত নিগূঢ় ঐক্যসূত্র অধিকার পূর্ব্বক ঋজুকুটিল নানাপথে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন হওয়াই প্রাচ্য-বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং তজ্জন্য সকল বিরোধের মধ্যে নির্ব্বিবাদে কেমন একটি—সামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম্মফলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াও আমাদের দেবভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। বিশ্ব সংসারকে মায়া ও মোহ বলিয়া উড়াইয়া দেই; আবার সমগ্র বিশ্বে দেবতার আবির্ভাব দেখিয়া, তরুলতাগুল্ম হইতে সর্ব্বলোকে মায়াতীত বিশ্বেশ্বরের মহতী মঙ্গল ইচ্ছার বিকাশ অনুভব করিয়া প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি। দেবতা এক এবং অদ্বিতীয় জানিয়া ইতর বস্তুর পূজা নিষ্ফল বলিয়া বুঝি, আবার প্রতি ক্ষুদ্র পাষাণ খণ্ডে নৈবিদ্য নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারি না। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদকে সমানভাবে অন্তরে স্থান দিয়া থাকি। ব্রহ্মকে নির্গুণও বলি, আবার সগুণ জানিয়া পূজাও করি। যেখানে বিভিন্ন মতের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও আমরা উভয়কে আত্মসাৎ করিয়া লই। যে সমস্ত বড় বড় ধর্ম্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য সংস্কারকেরা অধুনা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করাইতেছেন। যেমন, জাতি উচ্ছেদ, মানবে মানবে সাম্য, ঈশ্বর এক এবং প্রতিমার অকিঞ্চিৎকরতা,—সে সমস্তই আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে নূতন কথা নহে। সামান্য কুটীরবাসী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলিবে ধর্ম্মের নিকট জাতি নাই, সকলই সেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের সৃষ্টি; এবং সেই মহামহান্ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বঘটে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করিতেছেন। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়যে তবে শিলাখণ্ডকে পূজা করিয়া ফল কি? সেও বলিবে ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণ করিবার সামর্থ্য অস্বীকার করিয়া বিনীত ভাবে সর্ব্ব-সমক্ষে আপনার অজ্ঞতা নিবেদন করিবে। কিন্তু নিজে শিলাখণ্ডকে পূজা করে বলিয়া অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসনার মহত্ত্ব অস্বীকার করিবে না। এবং সর্ব্বত্র নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া চিত্ত সমগ্র বহির্জ্জগৎকে অন্তরে আয়ত্ত করিতে শিখে। এই বিরোধগ্রাসিতাই হিন্দুধর্ম্মের জীবন। নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন ঐক্যের আবিষ্কারই অদ্বৈতবাদের প্রধান শিক্ষা।

এই শিক্ষা ভক্তির প্রতিকূল নহে। এই মহোদার শিক্ষা যত প্রচারিত হইবে ততই তুচ্ছ বিরোধে উপেক্ষা ও জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি হইবে। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে একনাথ, রামদাস ও তুকারাম প্রভৃতি সাধু পুরুষদিগের চেষ্টায় দেশে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হওয়ায় বর্ণভেদময় মহারাষ্ট্র সমাজে অসাধারণ একতা ও একাগ্রতার সঞ্চার হইয়া স্বাধীন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অদ্বৈতবাদের বলেই শক-যবন-হুন-পহ্লবাদি বহিঃশত্রুর ও বৌদ্ধ চার্ব্বাক নানক কবীর পন্থী প্রভৃতি অন্তঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে অদ্বৈতবাদের মহোদারতা আমরা এখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারি না। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির বিরোধপ্রবণতা ক্রমে আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহকর মায়ায় অভিভূত হইয়া আমরা দেশের সুখ সৌভাগ্য ও অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসনার ভাবনা পরিহার পুরঃসর শুধু মসীজীবী হইয়া নিতান্ত হীনদশায় জীবন যাপন করিতেছি।

ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব পাশ্চাত্য ভূখণ্ডজাত ম্যাকসমূলার, ম্যাকডোনেল, কাওয়েল্—কোলব্রুক্ জোনস্ ও প্রিন্সেপ প্রভৃতি মহা মনীষীগণ—শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসীগণ জাতীয় সভ্যতাকে অবজ্ঞা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে কেরাণী রূপধারণ করতঃ দিন দিন অধিকতর গৌরব বোধ করিতেছে। অভিনব শিক্ষার প্রভাবে এখন আর ভারতে প্রাচীন কালের ন্যায় সুপণ্ডিত, তত্ত্ববিদ্ রাজনীতিবিদ্, সুবিজ্ঞ ব্যবস্থা প্রণেতা ও ব্রহ্মবাদী ঋষি উপজাত হয় না। একমাত্র মসীজীবীর সংখ্যাই দৈনন্দিন বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিতেছে। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান লোপ হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইহাই ভারতীয় দুর্ভাগ্যের নিদান।*

৺শশীপ্রভা দেবী।

* লেখিকা স্বর্গগতা—সুতরাং তাঁহার মতামত ও ভাষায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, তাঁহার মতকে নারীর একাংশের মতরূপে প্রকাশিত হইল। পঃ সঃ।

নারী-প্রচেষ্টা

—:০:—

মেয়েদের মুক্তির কোন কথা হইতেই তাহারা ছাড়া পাইলে কি অন্যায় করিতে পারে তাহার কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কত যে ভাল হইতে পারে, সে কথা তেমন শোনা যায় না কেন? প্রত্যেক মানুষই যখন আপনার রুচি, শক্তি ও প্রয়োজনানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে, তখন তাহার সুযোগ পাইলে মন্দলোকে মন্দকাজ করিতে পারে বলিয়া ভাললোকে ভালকাজও করিতে পাইবে না? আর মানবাত্মার এই প্রথম স্বাভাবিক অধিকার ও আকাঙ্ক্ষাকে চাপা দেওয়া যখন অন্যায় ও পাপ—তখন কতকগুলি অযোগ্য লোকের কোন মতে মন্দকাজে অসামর্থ্যই কি তাহার মূল্যে বজায় রাখিতে হইবে? এই নীতি পৃথিবীর অন্য সকল বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে ইহার দশাটা কেমন হইত? "৯৯ জন দোষী খালাস পাওয়াও ভাল, তথাপি নির্দ্দোষ একজনও যেন শাস্তি না পায়"—ইহাইত বর্ত্তমান বিচার-ব্যবহার মূলনীতি। তাহার পর একটু ছাড়া পাইতে না পাইতেই চারিদিক হইতে সমালোচনার বাণ বর্ষণ হইতে থাকিলে মেয়েরা আত্মোপলব্ধির সুযোগ ও সময়ই বা পাইবেন কি করিয়া? ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়া আপনাকে চিনিয়া লইতে না পারিলে মানুষ কখনো মানুষ হইতে পারে না। মেয়েদের বেলা কি সকল সনাতন সত্যই বদলাইয়া যাইবে?

তাহার পর মেয়েদের সহিত পুরুষদের এখনকার অবস্থার তুলনা চলে কি? তাঁহাদের ক্ষেত্রে শাসনবন্ধন যতই শিথিল হউক, পুরুষেরা বরাবর আপনাদের সুবিধা মত একতরফা নৈতিক আদর্শের সৃষ্টি করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়া আসিতেছেন, মেয়েদের তাহার শতাংশের একাংশও করা কখনই সম্ভব নয়। এতদিন মেয়েদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়া তাঁহারা সব করিয়াছেন—মেয়েরা ত আর তাঁহাদের বাদ দিতেছেন না, নিজেদের অংশের দাবী করিতেছেন মাত্র। আর তাঁহাদের ঐ রকম ব্যবস্থার ফলে মেয়েরা সম্পূর্ণ নিরপরাধে যে সকল অকথ্য যন্ত্রণা এতদিন সহিয়া আসিতেছেন, মেয়েদের সহস্রশাসন-শৈথিল্যেও তাঁহাদের

সেরূপ সহিতে হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ২।১টী অপ্রীতিকর ঘটনা যদিই হয়, নারীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারিলে তাঁহার সনাতন বিশেষত্ব সকল ক্ষেত্রে নৈতিক বিশুদ্ধির হাওয়া প্রবলতরই করিবে। সুতরাং নারীকে মানুষ হইবার সুযোগ দিতে না দিতেই ঐ সকল ঘটনা বাড়াইয়া ঢাকঢোল সহকারে প্রচার করিয়া তাহাও কাড়িয়া লইবার চেষ্টা না করাই উচিত বিশেষতঃ নারী যখন তাহাদের হাতের গড়া (তাহার জন্য যতই চেষ্টা হউক !) নহেন, তখন নারীর উপর কথায় কথায় হস্তক্ষেপের অধিকারও যখন পুরুষের নাই, তখন তাহাকে তাহার আপনার ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মুখে প্রথমে নিজেকে বুঝিতেই সুযোগ দেওয়াই উচিত।

তাহার পর এত যে বিপদের ভয় তাহাই বা কেন ? প্রধানতঃ অপর পক্ষের জন্যই নয় কি ? তাঁহারা যদি মেয়েদের অনভিজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতার সুযোগে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষা ও সাহায্যদানে অগ্রসর হন, তাহা হইলেই ত সব সহজ, শোভন ও নিরাপদ হইয়া উঠিতে পারে। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে যাহারা মেয়েদের ঐরূপে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাহাদেরই ত শাস্তি দেওয়া উচিত।

এমন কি মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার ও উপার্জ্জনের সুবিধা হইলেই অনেকে divorce ইত্যাদি প্রচলিত করিতে হইবে বলিয়া ভয় পাইয়া যান। ঐ সকল প্রচলিত হওয়া উচিত কি অনুচিত তাহা একটী স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু মেয়েদের খাওয়া পরার সংস্থানের সম্ভাবনা মাত্রেই যদি ঐ কথা মনে হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে কি ধরা পড়ে ? তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থাটাই আরও পরিষ্কার রূপে চোখে পড়িয়া যায় না কি ? অর্থাৎ ঐ কারণগুলি সবই রহিয়াছে,—কেবল খাওয়া পরার পর্য্যন্ত কোন উপায় না থকাতেই তাঁহাদের সকল রকম অপমান, নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও পড়িয়া থাকিতে হয়। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাহারই জন্যও তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে সুবিধা ও অধিকার পাওয়া একান্ত আবশ্যক দেখা যাইতেছে।

তাহার পর বর্ব্বর যুগের সংস্কারের উপর সভ্যতার চাকচিক্য মিশ্রিত হইয়া যে সকল মিথ্যা ও বাহিরের দৃষ্টিতে মধুর বলিয়া প্রতীয়মান আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলানুসন্ধান করিয়া সংস্কার করিতে হইবে। ইহাতে যদি আমাদের বড়ই পরিচিত ও প্রিয় ২।১টী

কবিত্বপূর্ণ ভাবাদর্শের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। অসভ্যাবস্থায় মানুষ সরল বিশ্বাসেও যাহা করে, সভ্য নরনারীর কাছে তাহা হস্যাস্পদ। সভ্যতার উন্নতির সহিত মানুষের ভাব ও আদর্শ ক্রমেই বিশুদ্ধতর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সকল প্রকার মন্দের মধ্যেই কিছু ভালও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার দোহাই দিয়া অথবা মোহে অধীর না হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে যাহা গ্রহণ করা হইতেছে তাহা পূর্ণ ও নির্ম্মলতর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না ইহাই দেখিতে হইবে। আগের আদর্শগুলির মধ্যেও যদি সনাতন সত্য কিছু থাকে, তাহাও লোপ পাইতে পারে না, অন্য বা পূর্ণতর বেশে দেখা দিবে মাত্র। বাস্তবিক্ সত্যকে ভয় করিলে মঙ্গল নাই, তাহা যদি বিনাশও করে, তবু তাহাই আমাদের বরণীয়। উহা আমাদের ঘরকন্নার মাপে গঠিত না হওয়ায় রাষ্ট্রে ও সমাজে স্থান দিতে চিরাভ্যস্ত সুখ, ও আরামের সময়ে সময়ে কিছু ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব, বিশেষতঃ অহেতুক দৃষ্টি-পীড়ার কারণ ত হইতেই পারে। তবে বিনাশ সত্যের ধর্ম্ম নয়, বর্ত্তমান রাষ্ট্রে সমাজ ব্যবস্থায় অনেক মিথ্যার জাল জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠায় উহার ঐ রূপটাই আমাদের কাছে প্রথমে প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু যতই সত্যের অভিমুখী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যায় ততই তাহার মধ্যে সত্যের প্রকাশ সহজ হইয়া আসে। ইহাতেও নানা নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু সত্যের রোধ তাহার প্রতিবিধান নয়। নদীতে বান আসার সম্ভাবনা থাকিলেও মূল প্রস্রবণই বন্ধ করিয়া দেওয়া তাহার প্রতিকার বলিয়া গণ্য হয় না।

মেয়েরা অনেক কাজ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের তাহা হইতে আটকাইয়া রাখার জন্য যে আইনকানুন করা হয়, তাহার কোন অর্থ আছে কি?—তাঁহাদের ত কেহ দয়া করিয়া কিছু করিতে বলে না, তাঁহারা যে কাজ করিতে পারেন না, তাহা ত বাধা না থাকিলেও পারিবেন না,—সুতরাং তাহার জন্য আইন গড়িয়া রাখার আবশ্যকতা কি?

অনেকে বলেন পারিলেও অনেক অনেক কাজ তাঁহাদের করা উচিত নয়। কিন্তু পাপ ও অন্যায় ভিন্ন মানুষের কোন্ কাজ "করা উচিত নয়"—তাহার কোন একটা নিয়ম সকলের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব। কারণ সকলের পক্ষে "উচিত" এক নয়, ও হইতে পারে না। প্রত্যেকের শক্তি, প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার "উচিত" ঠিক করিতে হয়।

কেবল পাপ ও অন্যায়ের কথা যে স্বতন্ত্র, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। তাহাই কেবল কাহারও কোন সময়েই "উচিত" এমন কি প্রয়োজনীয়ও হইতে পারে না।

তাহার পর পুরুষেরা মেয়েদের কিছুই ছাড়িয়াও দিবেন না,—সাহায্যও করিবেন না—অথচ তাঁহারা আপনারা কিছু করিতে গেলেও ঘরে বাহিরে অসন্তোষ, অপ্রেম, বিরুদ্ধতার প্রবল বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে! তাঁহাদের কিছু করিতে গেলে ঘরকন্নার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজের কড়ায় কড়ায় হিসাব বুঝাইয়া দিয়াও নিস্তার নাই।—বাধা দিবেন,—অথচ তাঁহারা নিজে কিছু করিতে গেলেও তাহা দুর্দ্দান্ততা, রমণীজনোচিত ব্যবহারের অভাব বলিয়া আখ্যা পাইবে;—এমন কি তাঁহারা যে নারীই নহেন তাহার প্রমাণও সিদ্ধান্ত হইয়া যাইতে পারে। অনেকে আবার তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহা অন্যায় বলেন না, কিম্বা অন্য মেয়েদের তাহার জন্য চেষ্টা করিতে দেখিলেই হয় ত প্রশংসাই করেন,—কিন্তু বাড়ীর কাহাকেও তাহা করিতে দেখিলেই জ্ঞানহারা হইয়া যান। মেয়েরা যখন আকাশ হইতে পড়েন নাই, বা সেখানেই বাস করেন না, তখন তাঁহাদের ঘর হইতেই ত সব করিতে হইবে এবং বাহিরও হইতে হইবে! তাহা না হইলে তাঁহারা কেমন করিয়া আপনাদের মুক্ত করিতে পারেন, তাহার একটা রাজপথের সন্ধান পুরুষেরাই বলিয়া দিন।

বাস্তবিক মেয়েদের উন্নতির চেষ্টা করিতে তাঁহাদের সাহায্য পাইলেও মেয়েদেরও অনেকের বহুদিন জীবন উৎসর্গ করা আবশ্যক জানিয়াও প্রত্যেকে যদি বাড়ীর মেয়েদের তাহার চেষ্টায় বাধা দেন, তাহা হইলে ঐ সকল কাজ করিবে কে? কেবল কুমারী বা বিধবারাই ঐ কাজ করিবেন বলিয়া যদি ধরা হয়, তাহা হইলেও বলিতে হয়, কুমারী থাকার সুযোগই ত তাঁহাদের দেওয়া হয় না। বিবাহিতার মত জগৎ সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভও তাঁহাদের হওয়া কঠিন। আর মেয়েদের কোন কাজের কথাতেই যে ভয় সর্ব্বাগ্রে সকলের মনে জাগিয়া থাকে তাহার আশঙ্কাও তাঁহাদের সম্বন্ধে আর সকলের অপেক্ষা স্বভাবতই একটু বেশী থাকার সম্ভাবনা। তারপর তাঁহাদেরও কি কিছু করিতে দেওয়া হয়?

বিধবাদের সম্বন্ধেও বলা যায়, তাঁহারা অনেক বিষয়ে মুক্ত হইলেও তাঁহাদের "বৈধব্য-যন্ত্রণা" নামক পৃথিবীর অন্য সকল স্থানে অজ্ঞাত বিষম ব্যাপারটী, যে বিরাট আকারে তাঁহাদের গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নাগপাশের বন্ধন হইতে উদ্ধার না হইতে পারিলে

তাঁহাদের কোন কাজ রীতিমত করিয়া উঠা বড় সহজ হয় না। তাহার পর তাঁহাদের অনেকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান আবশ্যকীয় জিনিষগুলিরই অভাব থাকায় তাহা সংগ্রহের চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকিতে হয়, এবং অনেক সময়ে তাহারই জন্য দিবারাত্রি পশুর মত খাটিয়া অতি হীন জীবন কাটাইতে হয়। সে অবস্থায় অবশ্য ওরূপ কোন কাজ বা তাহার উপযুক্ত শিক্ষা কিছুই সম্ভব নয়। তবে সৌভাগ্যশালীরা ভার লইতে ও ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলে ইঁহাদের দ্বারা অনেক কাজ করাইতে ও ইঁহাদের মানুষ করিয়া তুলিতেও পারেন বটে;—কিন্তু তাহাতেও সৌভাগ্যশালীদেরই আগে নামার প্রয়োজন প্রতিপন্ন হইতেছে। তারপর ইঁহাদের পক্ষেও কুমারীদের সম্বন্ধের যে আতঙ্কটীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কিছু খাটে।

কিন্তু কোন কাজ কেবল বিশেষ এক অবস্থার লোকে মাত্র করিতে পারিবে এই নিয়মের প্রধান আপত্তি এই যে, কুমারী বা বিধবা হইলেই কাহারও ঐ বিষয়ে যোগ্যতা বা প্রেরণা গজাইয়া উঠিতে পারে না।—এদিকে সধবার মধ্যেও আবার তাহা থাকা আশ্চর্য্য নয়। সুতরাং পারিবারিক বিশেষ কোন অনতিক্রম্য বাধা না থাকিলে, কেন যে তাঁহাদের দেশের ও দশের কোন কাজে বাধা থাকিবে বোঝা কঠিন। ঐরূপ বাধা থাকিলেও ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকিলে নিজেদের কর্ত্তব্য নিজেরা বুঝিয়া করিবার সুযোগ ও অধিকারই বা কাহারও থাকিবে না কেন? সকল বিষয়ে এমন শিশুর মত আগলাইয়া রাখার অর্থ কি? শিশুদেরও ত আগলান অপেক্ষা ছাড়িয়া দেওয়ায় শ্রেষ্টত্ব ও উপযুক্ততা দিন দিন প্রমাণিত হইতেছে। তাহার পর যাঁহারা বয়স্কা ও নানারকম বাধামুক্ত তাঁহাদের বিষয়ও কিছু বলিতে যাওয়াই বহুলা,—তাঁহাদের এ বিষয়ে যোগ্যতমের মধ্যেই পরিগণিত করা উচিত নয় কি? না, তখন তাঁহাদের শরীর, মন যতই ক্লিষ্ট হউক, পৃথিবীর পাপতাপ যতই প্রবল হউক, তথাপি অতি তুচ্ছ ও অধিকাংশস্থলে অনাবশ্যক ঘরকন্নার খুঁটিনাটি লইয়াই মাত্র চিরকাল কাটাইতে হইবে? জগতের উদার ক্ষেত্রে যদি তাঁহাদের কিছু করিবার বা দিবার থাকে, তাহার জন্য চেষ্টা করারও অধিকার থাকিবে না? আগেকার গৃহিণীরা এ সময় তীর্থযাত্রা, পূজা ব্রত ইত্যাদি করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা পাইতেন কিন্তু এখনকার নবযুগের পূজার আরতি ঘণ্টাধ্বনি যাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে আসিয়া পৌচিয়াছে,

তাঁহাদের তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে, বাধা দিতে এত প্রয়াস কেন ?—তখনও কি তাঁহাদের ঘরের কাজে নূন হইতে চূণ খসিবার যো নাই ? ঐরকম চাপিতে চেষ্টা না করিলে তাঁহারা আপনার শক্তি, সামর্থ, সুবিধা অনুসারে তাহার ব্যবস্থা ঠিকমতই করিতে পারেন ! কিন্তু তাহা না হইয়া "ঘরের কাজের" দাবী আমরণ সর্ব্বগ্রাস করিবার চেষ্টা চলিলে তাঁহাদের তাহাতে বৈরাগ্য আসাই ত একান্ত স্বাভাবিক। আর "ঘরের কাজ" বলিয়া লাল মার্কায় চিহ্নিত সব কাজগুলি সকল নারীর সমস্ত জীবনের কাজ কিনা তাহাতেও সন্দেহ করিবার আছে।

সধবারা স্বামীর সহিত ঐসকল কাজ করিবেন বলিলেও বলা যায়, তাহা যদি সত্যই সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাপেক্ষা সুখের বিষয় কি হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা হওয়া সম্ভব কি ? পত্নীর যে বিষয়ে অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা আছে, স্বামীর তাহাতে তাহা না থাকিতে পারে, তাঁহার সময় না থাকাও খুবই সম্ভব বিশেষতঃ মেয়েদের উন্নতির প্রয়াস অনেক স্বামীরই রুচিকর না হওয়ার সম্ভাবনা ; কিন্তু তাই বলিয়াই কি উহারা ইচ্ছা ও সামর্থ থাকিলেও ঐ সকল কাজের চেষ্টা করিবেন না ? এ বিষয়ে যথার্থ অনুরাগ ও অন্তর হইতে বেদনাবোধ যাঁহাদের জাগিয়াছে ও সেজন্য জীবন উৎসর্গ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত আছেন, এরূপ নারীর সংখ্যা কোন দেশেই সুলভ নয়, আমাদের দেশের কথা ত বলাই বাহুল্য। সুতরাং কাহারও তাহা থাকিলে অসন্তোষ, অপ্রেম ও বিরুদ্ধভাব না আনিয়া অন্ততঃ তাঁহাদের নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করিবার সুবিধাটুকু দেওয়াও একান্তই উচিত নয় কি ? এই সকল জীবনের প্রধান কাজ বলিয়া লইলে বা তাহার জন্য চেষ্টা করিলেই যে একেবারে সন্ন্যাসিনীই হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন উচ্চতর বিষয়ে অনুরাগ থাকিলেই কাহারও সাধারণ মানব ধর্ম্ম ও জীবনের সার পদার্থ, ভালবাসার আকাঙ্খা বা তাহা দিবার যোগ্যতা থাকে না এমন নয়। বিশেষতঃ এরূপ নারীরা বুদ্ধি ও হৃদয় বৃত্তিতে বিশেষ সমৃদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহাদের মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইলে তাহা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা লোপ পাইবে। ভালবাসার প্রস্রবণও তাঁহাদের ভিতর নির্ম্মলতর ও উচ্চশ্রেণীর হওয়াই সম্ভব বলিয়া পত্নীত্বেও তাঁহাদের কোনই অযোগ্যতা থাকিতে পারে না। কিন্তু উহার প্রচলিত ধারণা ও দাবীই যদি তাহার একমাত্র আদর্শ বলিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাদের তাহার মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে না। কিন্তু এ কথায় বড় বুড়ারা

হউক, তাঁহাদের খেলার পুতুল, অধিকৃত বস্তু ও গৃহদাসী মাত্র ভাবে না দেখিয়া যথার্থ যদি জীবন-সঙ্গিনী বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে সাধারণ নারীদের অপেক্ষা ইঁহাদের মধ্যে তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা বেশীই থাকিবে। তবে যাঁহারা সংসারে সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া কেবল ঐ সব কাজেই জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; —সুবিধা পাইলে তাঁহারা আপনা হইতেই বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইবেন না।

গৃহকর্ম্মের বিরুদ্ধে বলিতে হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাতে বিদ্বেষের কিছুই নাই, এবং প্রচলিত আদর্শের গৃহকর্ম্ম-পরায়ণা সুশীলা নারীদের মধ্যেও শ্রদ্ধা করিবার অনেক জিনিষই আছে। কিন্তু তাহাই যে নারীর একমাত্র বা চরম আদর্শ নয় চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বারবারই বলিতে বাধ্য হইতে হয়। বুদ্ধিমতী, মহৎহৃদয়া নারীরা কেহই যে গৃহকর্ম্ম বা তাহার পরিদর্শন করিবেন না এমনও নয়; অধিকাংশস্থলেই বরং তাহা আপনা হইতেই অধিকতর নিপুণতার সহিত করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অসংখ্য প্রকার বৈচিত্র্য ও শক্তি, প্রবৃত্তির তারতম্য থাকিতে পারে, সুতরাং সকলকে একদলে ফেলিয়া বিচার করা অসঙ্গত। মাতা ও পত্নীর মুখ্যকর্ত্তব্যগুলি করিতেছেন কিনা ও আপনাদের জীবন কি ভাবে অতিবাহিত করেন, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের বিচার করা উচিত। মাতা ও পত্নীর উপযুক্ত স্নেহ, প্রেম, মঙ্গলাকাঙ্খা থাকিলেই হইল, নতুবা একটী গুরুতর বা বিশেষ কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিলেও কাহাকেও সকল সময়ে, সকল বিষয়ে প্রত্যেক খুঁটিনাটি লইয়া দোষ দিতে থাকা কি অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা নয়? পুরুষেরা কোন একটী গুরুতর বা বিশেষ কর্ত্তব্যের ভার লইলে কি করিয়া থাকেন? তাঁহাদের ঐরূপ কাজের ফলে তাঁহাদের পত্নী ও সন্তানদের দারিদ্র্য ইত্যাদিতে অনেক সময়ে কি পর্য্যন্ত না কষ্ট পাইতে হয়,—মেয়েদের অবশ্য পতিপুত্রদের ঐরূপ কষ্ট দিয়া কেহ কিছু করিতে বলে না, এবং তাহার সম্ভাবনাও নাই! তবু তাঁহাদের বেলা এত বিরুদ্ধতা কেন?

বাস্তবিক গার্হস্থ্য জীবনের রক্ষার মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়াও যাহাতে মেয়েরা সকল রকম কাজ ও বিদ্যার সাধনা ইত্যাদি করিতে পারেন, গৃহস্থালীর ব্যবস্থাও আদর্শ সেইভাবে গঠিত করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে যে সকল মেয়েদেরই সুবিধা হইবে এমন নয়, গৃহের হাওয়া বাতাসও উচ্চ ও বিশুদ্ধতর হইতে পারিবে।

নতুবা যাঁহারই কোন উচ্চ চিন্তার দুঃসাহস আছে, তাঁহাকেই যদি সংসারের বাহিরে একঘরে হইয়া থাকিতে হয়, তাহা তাঁহার বা সমাজের কাহারও পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। তবে ব্যক্তিবিশেষের কথা যে স্বতন্ত্র তাহা আগেই বলা হইয়াছে।

এ বিষয়ে বিলাতের দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? সেখানকার নারী-প্রচেষ্টায় পুরুষেরা গোঁয়ারের মত বাধা না দিলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা নিবারিত হইতে পারিত। এইরূপ সংঘর্ষে অনেক সময় আত্মনির্ভরতা ও আত্মোপলব্ধি বাড়াইতে পারে বটে,—কিন্তু তাহার সহিত দুই পক্ষের আতিশয্য ঈর্ষা দ্বেষ, গোলমালের সৃষ্টি এবং উন্নতিও যে কেবল অনর্থক কিছুদিন পিছাইয়া রাখা হয়, ইহাও মনে রাখা উচিত। সুতরাং যুগধর্ম্মের গতি যে আটকাইবার নয়, ইহাই মনে রাখিয়া নতশিরে তাহার বিকাশে সাহায্য করাই বুদ্ধিমান নরনারীর কর্ত্তব্য। পুরুষেরা মেয়েদের সাহায্যে অগ্রসর হইলে মেয়েদেরও তাঁহাদের দিকে দেখিবার বেশী সম্ভাবনা। নতুবা এতদিনের অন্যায়, অত্যাচারের পর এখনও চাপিবার চেষ্টা করিলে সহস্র গালি দিলেও তাঁহাদের প্রতি মেয়েদের সদ্ভাব ও বিশ্বাস ক্রমেই হারাইতে হইবে মাত্র। ইহাতে কতকগুলি ভীরু আরামপ্রিয়, স্থূলদৃষ্টি বা চতুর নারীও তাঁহাদের পক্ষে জুটিতে পারেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের লইয়া তাঁহারাও তৃপ্ত হইতে পারিবেন না। কোন শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকেরাই যে সে শ্রেণীর সর্ব্বোত্তমের মধ্যে নয়, ইহা বোধ করি আর বলিবার অপেক্ষা করে না।—সুতরাং সহস্র চাটুবাদ ও তোষামোদেও ইঁহারা প্রভুপক্ষের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের লইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। এদিকে মেয়েদের মধ্যের উৎকৃষ্টভাগও বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া আপনাদের প্রকৃতির অনেক শ্রেষ্ঠগুণের প্রকাশ ও বিকাশ সাধন করিয়া উঠিতে পারেন না। এমন কি আপনাদের দলের বাজেলোকগুলির যে সব অতিশয্য স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহারা নিজেরাই দমন করিতেন, সেগুলিতে মন দেওয়া অনেক সময়েই সম্ভব হয় না, আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন স্থলে তাহা সমর্থন পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়। বিশেষতঃ সত্যের প্রকাশের জন্য দুঃখলাভ যদি আবশ্যক হয়, পাশ্চাত্য নারীদের আত্মোৎসর্গের ফলে সমস্ত জগতের নারীগণই তাহা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সত্যো

আর তাঁহাদের কোনই দ্বিধা বা সংশয় নাই, এখন পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা এবং প্রাচ্য-সদ্গুণগুলির দ্বারা তাহার যেটুকু অসম্পূর্ণতা আছে তাহাও পূরণ করিয়া লওয়া যে তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে, জগতের এই বিশেষ আহ্বান প্রাচ্য-নারীগণের মর্ম্মে মর্ম্মে জাগিয়াছে। সুতরাং ইহার গতিরোধের চেষ্টা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

'বিজলী' বঙ্গনারী।

নারীর সাহস।

--:-:*:-:—

দেশের ঘোর দুর্দিনে, আজ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের বাণী স্মরণ হচ্ছে; তাঁরা যা বলে গেছেন, যদিও আজকাল তা সেকেলে "কুসংস্কার" নামে অভিহিত হচ্ছে। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে মিঠে; তাই আজ কাঙ্গালের কথাই বারংবার মনে হচ্ছে। যারা চোকে বিলাতী ঠুলি বেঁধে, কাণে তুলো দিয়েছেন তাদের কথা অবশ্য জানি না! কিন্তু আমার মত যারা কাঙ্গালিনী, তাদের যে সেই পুরোণো কথা মনে হবেই তাতে আর ভুল নাই।

আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহেরা বলে গেছেন, "সাহসই লক্ষ্মী; দুঃখ ও বিপদে পড়েও সাহস হারিও না।" কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সাহসটাকেই সর্ব্বাগ্রে হারিয়ে বসে আছি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, সংযম ও ন্যায়পরায়ণতাকেও বিসর্জ্জন দিয়েছি। পুরুষদের ত কথাই নাই "জল উঁচু" ও জল নীচুর দলের প্রায় পোনর আনাই। উচিত বলবার, অপ্রিয় সত্য বলবার সাহসটুকুও নেই তাদের। অন্তরে অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলক্ষণ আছে; কারণ বিধাতাপুরুষ বিবেক নামক একটা জিনিষ মানুষের মধ্যে দিয়েছেন, যার জোরে অন্যায়কে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের বীর পুরুষগণের বীরত্বে এই বিবেকটাও ধামা চাপা হয়ে থাকে, দংশন করবার সুযোগই পায় না। তাদের শারীরিক শক্তি সাহসের পলাশীক্ষেত্রেই সমাধি হয়েছে। গায়ের জোরই জোর নয়, মনের বল না থাকলে। তোমাদের যে, তারই অভাব। তোমাদের

মানসিক বল কোথায়, তার দৃঢ়তা কোথায়? তোমাদের ধৈর্য্য সংযম কোথায়, তবে তোমাদের সাহস কোথায় ভাই?

বড়ই দুঃখে বলতে হচ্ছে, নারীদের অবনতি ভয়োৎধিক। কেন বোন, আমরা এত ভীত হব! এই সাহস হারাবার জন্য কেউ ত আমাদের মারধর করেন। তবে কেন, আমরা অবলা নামধারিণী। জোঁক শুয়া পোকা দেখে দৌড়তে কে আমাদের উপদেশ দিয়েছিল? নিজের সাহস নিজে কেন হারাও! তুমি নারী, তোমার অসীম সাহস, অসাধারণ সংযম থাকা কর্ত্তব্য। তুমি নিপীড়িতা হয়ে, নিগৃহিতা হয়ে পীড়ন ও নিগ্রহ সহ্য করে করে শুধু নিজের সম্মান, নিজের সাহস হারাচ্ছ। পুরুষ যতই কেন বলুকনা, "নারী দেবী, আমরা নারীকে সম্মান করি" কিন্তু সংসার ঘেঁটে দেখ, উপলব্ধি হয়, আমরা কেন দেবী। তাই বলছি বোন, বিপুল সাহসে বুক বেঁধে প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হও। নিজেকে রক্ষা কর। সুপ্ত সিংহীনি জেগে উঠুক। ন্যায়ের জ্বলন্ত অনলে, অন্যায়কে আহুতি দেও, তোমার শিরায় শিরায় ন্যায়পরায়ণতার রক্ত বহিতে থাকুক নিজ গৌরবে গৌরবময়ী হয়ে দেশকে গৌরবান্বিত কর। গান্ধী-জননীর মত বীরজননী হও।

পরপদলেহনের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা গৃহকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে, শিশু পালনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ সেবায় কেন আত্মনিয়োগ করব না? কিন্তু কেহ অধিকার চাহিতে গেলেই, অলসতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে, স্বাবলম্বী হতে হবে। স্বামীর উপার্জ্জনের দিকে শকুনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থেকো না। এতেই পতি দেবতারা ভাবেন পতি বিনে গতি নেই, প্রেমের দিক থেকে না হলেও অন্ততঃ পেটের দিক দিয়ে। এবং এই জন্যই দেবতার তাচ্ছিল্য দৃষ্টি তোমাদের উপর। তাই বলছি তোমার নারীত্বের অবমাননা করিও না। ক্রীত দাসীর মত জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। পুরুষরা মুখে যতই বলুক না কেন কার্য্যে কিন্তু তাদের অন্য ভাব। অনেক রকমে তার পরিচয় পেয়েছি।

অথচ সবাই স্বাধীনতাকামী! আমাদের সভাতে বসিয়া থাকিলে আমরা যে অবলা সেই অবলাই থেকে যাব। ওঠ, লুপ্ত সাহস ফিরিয়ে আন, আমাদের জাগরণ সুদূরপরাহত নয়, যদি আমরা কায়মনোবাক্যে তাহাই চাই।

'জনশক্তি' মিসেস্ জেড. রহিম চৌধুরী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা

ইঞ্চকেপ কমিটি সরকারের অভাব মোচনকল্পে নারশিক্ষয়িত্রীর ও ইন্‌স্পেকট্রেসদের সংখ্যা কমাইতে উপদেশ দিয়াছেন। শিক্ষাই মানব জীবনের সার্থকতার মূলে। এদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিলে মানুষকে খর্ব্বের পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে।

"সমস্ত সভ্য দেশেই জাতীয় শিক্ষা বলিতে আমরা এই বুঝি যে জাতীয় স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী জাতীয়ত্বের পরিপোষক শিক্ষা, শিক্ষার উদ্দেশ্য এক হইলেও স্থান, কাল, পাত্রভেদে পথও বিভিন্ন। অভিজ্ঞ ও যোগ্য ভারতবাসীর দ্বারা ভারতবাসীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছিত হইলে, স্ত্রীজাতির শিক্ষাও যোগ্য স্ত্রীলোকের দ্বারা নিয়মিত হওয়াই স্বাভাবিক; ইহার বিরুদ্ধাচরণ অস্বাভাবিক, ইহাই সর্ববাদীসম্মত সত্য। বালিকাগণের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি অনুধাবন করতঃ তাহাদের শিক্ষা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুফল লাভ করিতে হইলে মহিলাগণকেই উপযুক্ত শিক্ষাদাত্রীরূপে গ্রহণ করিতে হয়। অধিকন্তু কালক্রমে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুকোমলমতি বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষা বিধানও শিক্ষয়িত্রীগণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলে এক পক্ষে যেমন শিক্ষাবিভাগের ব্যয়স্বল্পতা অবশ্যম্ভাবী পক্ষান্তরে বালকবালিকাগণের কোমল বৃত্তি নিচয় শিক্ষয়িত্রীদের হস্তে অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করিবে ইহা বলাই বাহুল্য, সভ্যদেশের কার্য্যপ্রণালী এই ধারণারই পরিপোষক ও এই সত্যেরই প্রবর্ত্তক; ভারতবর্ষেও মহীয়সী মহিলা স্বনাম ধন্য। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে সহৃদয় সহৃদয়া নরনারীগণ দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে নারীর কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষারূপ অবাধ ও স্বাভাবিক সরল অধিকারের সার্থকতা সাধন করা কতদূর সমীচীন ও উদারতার পরিচায়ক] তাহা সুধী ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচ্য।

অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় বালকবালিকাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা মহিলাগণের হস্তে ন্যস্ত হইলে, মহিলাগণ সুমাতা, সুগৃহিণী, সমাজের কার্য্যে সহধর্ম্মিণী ও পুরুষ পুরুষোচিত কর্ম্মতৎপরতায় কর্ম্মঠ হইয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বা উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিলেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরিত্রে কর্ম্মে, বিশ্বজগতের সম্মুখে স্বীয় স্থান গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেই জাতীয় মঙ্গলের সূচনা হইবে, নতুবা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিতে হইবে।"

নারী পুলিস।

"কলিকাতার ইংরেজেরা তাঁহাদের আয়াদের পাহারা দিবার জন্য নারী-পুলিস চাহিতেছেন। কিন্তু আয়াদের পাহারা অপেক্ষা আরও অনেক গুরুতর কাজের জন্যও তাহারা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এখন মেয়েরা বাহিরে যাইতেছেন এবং ক্রমেই আরও যাইবেন কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষেরা এখনও তাহাতে অভ্যস্ত না হওয়ায় তাঁহাদের যে রকম সভ্যতার জ্ঞানমাত্রের অভাবের পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের রক্ষার জন্যই নারী পুলিসের আবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদের মেয়েরা বাহিরে গেলেও পুরুষের সঙ্গে তেমন করিয়া কথা কহিতে এখনও পারেন না, আর পুরুষ পুলিসেরাও সংস্কারের বশে ভাল চোখে দেখে না ও সহজে তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হয় না। মেয়েরাও লজ্জাশীলা এবং তাহাদের ভাব দেখিয়া তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন। নারী পুলিস হইলে অনেক দুষ্ট লোকের শিক্ষা হইতে পারে। মেয়েরাও একটু সম্ভ্রম স্বাচ্ছন্দ্যের এই প্রাথমিক অধিকারটুকু উপভোগ করিতে পারেন, এটুকু তাঁহাদের একান্তই ন্যায্য দাবী। তাঁহারাও যখন দেশে বাস করেন, তাঁহাদের মানসম্ভ্রম রক্ষার ভার লওয়া রাষ্ট্রের একটা মুখ্য কর্ত্তব্য। অন্য সকল ক্ষেত্রেই দুষ্টের দমন করিয়া শিষ্টেরা যাহাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা বহুদিন হইয়াছে, মেয়েদের ক্ষেত্রেই কেবল দুষ্ট পুরুষদিগকে ছাড়িয়া দিয়া এতদিন তাঁহাদেরই বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এখন যখন এই জাতটী জাগ্রত হইয়াছে, আর পুরাতন ভ্রান্ত ব্যবস্থা লইয়া চলিতে পারে না।

তাহার পর স্কুলের মেয়েদের রক্ষার জন্যও ইহার বড়ই প্রয়োজন। এখন স্কুল হইতে গাড়ী পাঠাইয়া বাড়ী বাড়ী মেয়ে সংগ্রহের যে রীতি আছে, তাহাতে তাহাদের স্কুলের সময়ের অনেক আগেই স্নানহার সারিতে হয় এবং খাওয়ার পরই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্য অনেকে একত্রবদ্ধ অবস্থায় চাপাচাপি করিয়া স্কুলে আসিতে হয়। এদিকে তাহাতে তাহাদের ছুটীর পর অনেকক্ষণ সেই অভুক্ত থাকিতে হয়। আসার সময় যে কারণে সকালে আসিতে হয়, যাওয়ার সময় অবার ঠিক সেইকারণেই বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিতেও অত্যন্ত দেরী হয়। এই সবই মেয়েদের পক্ষে একান্ত স্বাস্থ্যহানিকর। তাহাপেক্ষা অনেকে দলবদ্ধ হইয়া একজন শিক্ষয়িত্রী বা কোন বয়স্ক মহিলার সহিত হাঁটিয়া আসা সকল বিষয়েই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে যে খাওয়াতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তাহাতে স্বাস্থ্যলাভ হইতে পারে। এই ভাবে মেয়েদের আসার জন্য দূরের স্কুলে ট্রামেও বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা যাইতে পারে। মেয়েদের গাড়ীতে আসার যে সকল বিবরণ আমাদের কাণে আসিয়াছে, তাহাতে ইহা তাহাপেক্ষা নিরাপদও হইবে। এই সব সময়ে নারী পুলিস অনেক কাজে লাগিতে পারে। মেয়েদের পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি, বাড়ীর কেহ না কেহ সেই সময় আফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে যাতায়াত অনেকেই করিয়া থাকেন, তাঁহারাও অবশ্য কন্যা ভগিনীদের সহজে সঙ্গে করিয়া আনা নেওয়া করিতে পারেন।

শিশুরক্ষাতেও নারী পুলিসের দ্বারা অধিকতর সুফল পাওয়ার আশা করা যায়। আজকালকার সহস্র রকম যানবাহনপূর্ণ বিপদসঙ্কুল রাস্তায় কত শিশু ও ছোট ছোট বালকবালিকা যে অরক্ষিত ভাবে বাহির হয়, তাহাতে বিপদ কম ঘটে না। তাহার পর প্রতারিত, পথ ভ্রান্ত বালিকা ও নারীদের রক্ষার জন্য তাহার যে কত আবশ্যক তাহা ত বলাই যায় না। অনেক বিপদ অত্যাচার ইহাতে নিবারিত হইতে পারে। মেয়েদের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটী নূতন যুগ ইহাতে খুলিবার সম্ভাবনা। সব যদি এখনই না হয়, যতটা সম্ভব যে সব স্থানে আবশ্যক, তাহা দেখিয়াই প্রথমে ইহার ব্যবস্থা করা উচিত।

বঙ্গনারী।

* * *

মেমদের জন্য মেয়ে পুলিসের আবশ্যক নাই,—আবশ্যক আমাদের জন্য! কেন? কারণ মেমরা আত্মরক্ষায় পটু,—সবল সাহেব তাহাদের পশ্চাতে আছে—একথা অত্যাচারীর

মনে সর্ব্বদা জাগ্রত ;—একটি মেম অপমানিতা হইলে সমগ্র ইংরেজ সমাজ তাহার প্রতীকারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে—অত্যাচারীর শাস্তি না হইলে কিছুতেই তাঁহারা ক্ষান্ত হয় না—এ কথা আততায়ীর জানিতে বাকী নাই,—তাহার ফলে মেমের দিকে তাহারা তাকাইতেও ভীত। আর অসহায়া আমাদের সে সাহস নাই,—বঙ্গনারীরও সেই অবস্থা,—সম্মুখে নারী নিগ্রহ হইতে দেখিলেও সহজে কেহ সাহায্যে অগ্রসর হইতে চায় না;—একবার একটি অসহায়া নারীকে রেল ষ্টেশনে দুর্বৃত্ত রেল-কর্ম্মচারীর কুচক্র হইতে রক্ষা করিতে এ সত্য অনুভব করিয়াছি,—উপস্থিত ভদ্র আখ্যাধারী নর-পশুরা সে কার্য্যে সাহায্য করা ত দূরের কথা,—যুবতীর সাহায্যে অগ্রসর হওয়ায় প্রকাশ্যে অশ্লীল বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়া ইতরামী করিতে ছাড়েন নাই! দেশের লোকের মনের এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে মেয়ে পুলিস পেছনে বাঁধিয়া কি ফল? সে আরও উপসর্গ বৃদ্ধি করা! মেয়ে পুলিস হইবে কাহারা? উচ্চ শ্রেণীর নারী এ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না নিশ্চয়,—যাঁহারা এ বিষয় নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের নীতিজ্ঞান পরিস্ফুট নয়,—সে অবস্থায় নারী পুলিস কুলোকের কুকার্য্য সাধনের যন্ত্র হইয়া যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি না করে! বাঙ্গর পুলিস বিভাগের সুনাম প্রভাব কাহারও অজ্ঞাত নাই,—আবার তারই দ্বিতীয় সংস্করণে আবশ্যক? বরং মেয়েরা আত্মীয় বন্ধুর সহিত আবশ্যকমত বাহির হইয়া বাহিরের সহিত পরিচিত হউন,—নিজে সপ্রতিভ সাহসী হউন,—আত্মীয় পুরুষ ভয়ে জুজু না হইয়া অত্যাচারের প্রতিকারপরায়ণ হউন,—ভদ্র সমাজ সর্ব্বদা অন্যের সাহায্যে প্রস্তুত হউন—আদালতে সাক্ষী দিবার ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন—নিরালায় লুকাইয়া নিরাপদ হইবার প্রবৃত্তি যতদিন আমাদের মধ্যে হইতে দূর না হইতেছে ততদিন কোন প্রকার অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা লাভের আশা বৃথা। পদে পদে অত্যাচার! চলা ফেরায় পেলে, আদালতে সকল স্থানে আমরা গাঁঠের কড়ি দিয়াও কাঁটিয়া পার হই,—আমাদেরই পয়সায় পুষ্ট,—সাধারণের টাকায় প্রভু হইয়া আমাদিগকে অপমান করে—আমরা তাহাদের প্রতাপ নীরবে সহ্য করি—তাহাতে তাহাদের বৃদ্ধি হইবে না কেন! বস্তাগাদা হইয়া তৃতীয় শ্রেণী বা মধ্যম শ্রেণীর রেল গাড়ীতে অনেক শিক্ষিত মহাশয়কে দুরন্ত মনের ক্ষোভে বলিতে শুনিয়াছি,—কাগজে লিখিয়া রেল কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া ইহার প্রতীকার না করিলেই নয় কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রেলে অবস্থান পর্য্যন্ত,—বাড়ী গিয়াই তিনি

নিশ্চিন্ত! কার কার জন্য চেষ্টা,—আমাদের এরূপ উদ্যমের পুরস্কার যে অশেষ কষ্ট হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি! মনটা হওয়া চাই—আত্মরক্ষায় তৎপর নতুবা পুলিস পাহারা আমাদের আরও করিবে কাপুরুষ!

এ তথাকথিত সভ্যতার যুগে সুখ সচ্ছন্দতার ত সীমা নাই। ট্যাক্সে ট্যাক্সে দেশটা শেষ হইতে চলিল, পুরুষ পুলিসের ব্যয় ভার বহনেই আমরা আসি যাই করিতেছি,—আবার ইহার উপর মেয়ে পুলিস! যে দেশের লোকের অন্ন বস্ত্রের ঐরূপ অভাব, সে দেশে ব্যয় বাহুল্যের কথা—সর্ব্ব প্রথমে চিন্তা করিবার!

লবণের ট্যাক্স।

মোটা ভাত মোটা কাপড়,—তাহারও সংস্থান হয় না আর এ দেশে,—প্রাণ ও লজ্জা রক্ষা হয় না। কেবল লবণকে সম্বল করিয়া এ দেশের আট আনা লোক অর্দ্ধাশনে কোন ক্রমে শরীর রক্ষা করে। দেহ রক্ষার শেষ উপায়, অন্ন গ্রহণের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় ও প্রধান উপকরণ,—লবণ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হ'ল তবে আর থাকিল কি! এই যদি সভ্য জগতের ব্যবস্থা হয়, অসভ্যতা আমার চিরদিন, প্রাণ বাঁচিলে না অন্য কথা,—এবারে অভাবে সরকার এ করিলেন কি? প্রজা শেষ হইয়া গেলে কর আদায় হইবে কাহার নিকট হইতে,—এ হইয়াছে প্রাণ মারার ব্যবস্থা। ইহার প্রতীকারের জন্য দেশময় আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। ধনি! নিজে চড়া দরে লবণ কিনিতে পায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না,—যাইয়া দেখ তোমার কৃষক প্রতিবাসীর প্রতি,—তাহার মৃত্যু ঘটিলে তোমার স্বার্থ কিছুতেই রক্ষা হইতে পারে না,—অন্নের ব্যবস্থা যে তাহাদের হাতে—সে যদি অন্নহীন হয় অন্ন যোগাইবে কি ভূতে!

সরকারের আয়ের হানি হয় বলিয়া লবণ প্রস্তুত করা আইন বিরুদ্ধ সুতরাং অভাবে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া দেশের লোক এ অপরাধে অপরাধী হইতেছে নিত্য,—সাময়িক পত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। সঞ্জীবনী সংবাদ দিয়াছেন—

বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা মহকুমার অধীন মৃজাকালু গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া ছিল। নিমক বিভাগের ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু সে

সংবাদ পাইয়া মৃত্তাকান্দ্রগ্রামে উপনীত হন। লবণপ্রস্তুতকারীদিগকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করাতে তাহারা হেমবাবু ও তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে আক্রমণ করে। তখন গুলি চালাইবার হুকুম দেওয়া হয়, একজন খুন হইয়াছে, নিমক বিভাগের অনেক লোক গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, যশোহর কনফারেন্সে এই নির্দ্ধারণ হইয়াছিল যে লবণকর বৃদ্ধি করা হইয়াছে সেই হেতুতে আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়া লবণ প্রস্তুত আইনের বিধি অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ঐ নির্দ্ধারণের ফলেই মৃত্তাকুলের লোকেরা আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিতেছেন তাঁহারা বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ রাখেন না। অগ্নির উত্তাপে লোনা জল শুষ্ক করিয়া লবণ হয়, বাকরগঞ্জের সমুদ্রতীরের অধিবাসীরা সহজেই তাহাতে প্রলুব্ধ হয়। এখন ব্যাপার বুঝুন।

মসৃণ আড়াল।

—:0:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কি করিয়া বুঝাইব বল, আমার সে সময়ের মনের অবস্থা! মানুষ বাঁচিতে চায় ভবিষ্যতের সুখের আশায়, অতীত জীবনের স্মৃতি যদি হয় তাহার সুখের। আমার জীবনে সুখ বলিবার আর কি ছিল! অতীত,—সে ত অতি ভয়ানক। ভবিষ্যত,—সে আরও ভীষণ! পাপ রাজচন্দ্র যখন আমার সন্ধান পাইয়াছে, ভবিষ্যত আমার আর কিছুতেই সুখের হইতে পারে না। ইহা আমার ভীতি, বুদ্ধিভ্রষ্ট মস্তিষ্কের কল্পনা নহে,—অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা,—পরীক্ষিত সত্য। ওগো, যদিও আমি অতি শৈশবে মাতৃপিতৃহীন, তবুও আমি, তোমাদের দশের মতই সংসারে সুখী ছিলাম; নিকট আত্মীয় না থাকিলেও সুহৃদয় বন্ধুর আমার অভাব ছিল না। পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না সত্য, কিন্তু পিতার সময়ের বৃদ্ধ কর্ম্মচারী

নরহরি দা পিতৃস্থানীয় ছিলেন ; মাতা ছিলেন না,—নিভার মাতাই ছিলেন আমার মাতার অধিক, তাঁহার স্নেহ আদরে কোন দিনই বুঝিতে পারি নাই আমি মাতৃহীন ! নিভা আমার ছিল যে কি তাহা, আজ, এতদিন পরেও বুঝাইতে পারিব না। সহৃদয়া সহোদরা ভগিনী বল, সখী বল, সখা বল, সর্ব্বদার সঙ্গিনী বল,—সবই ছিল সে আমার ! আনন্দ—আনন্দ হাসি-খেলা-সুখে লুটোপুটি ! দুটিতে একমনে, একপ্রাণে মিলিয়া মিশিয়া দিন কাটানই ছিল সে সময়ের কাজ। আমার সকল কার্য্যেই ছিল নিভা,—নিভার সকল কার্য্যেই ছিলাম আমি। সে পড়িত, আমি পড়া বলিয়া দিতাম ; আমি পড়িতাম, তাহাতে তাহার ছিল কত উৎসাহ ; পরীক্ষায় প্রথম হইয়া পুরস্কার পাইয়াছি আমি, আমা' অপেক্ষা তাহাতে আনন্দ পাইত সে অনেক বেশী ! বড় ভাল লাগিত তাহাকে আমার ; সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়েটি,—কেমন বুদ্ধি, কোন বিষয় বুঝাইলে কত সহজে সে সেটাকে ধরিতে পারিত—তাহাকে পড়াইতে, বুঝাইতে কত আনন্দ ! পরিশ্রমীও সে কম ছিল না, বাড়ীর কাজ কর্ম্মে কখনও তাহার আলস্য দেখি নাই। কেমন সহজ সরলভাবে অবলীলাক্রমে ঘড়ির কাঁটার মত সে সংসারের কাজ যথাসময়ে করিয়া যাইত, অথচ আমোদ আহ্লাদের শেষ ছিল না। নিভার নাম স্মরণে আসিবা মাত্র আমার প্রাণ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে,—আমি যে তার গুণের অন্ত পাই না গো !

অদৃষ্টের কি পরিহাস ! অবশেষে সেই নিভাই কিনা হইয়াছিল আমার সকল যন্ত্রণার নিমিত্ত ! তাহাকে,—সংসারের আমার প্রিয়তম বন্ধুকে,—সেই পবিত্র নির্ম্মল স্নেহময়ীকে উপলক্ষ্য করিয়াই দুরন্ত শনি আমাকে আশ্রয় করিয়াছিল,—আমার কাল হইয়াছিল,—নিভার প্রতি আমার অগাধ অনুরাগ, প্রেম—স্নেহ—না ভালবাসা—কি যে সে আকর্ষণ,—কি নামে বুঝাইব—তাহাই আমার জীবন পথের অন্তরায়। পাপ রাজচন্দ্র যখন লালসার তাড়নায় নিভার জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল আমি কি তখন নীরব থাকিতে পারি ? সংসারের আর শত অত্যাচার সহ্য হইত কিন্তু নিভার প্রতি অবিচার যে আমার ছিল অসহ্য,—আমি প্রাণ পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম রাজচন্দ্রের বিরুদ্ধে ! আশা ছিল সৎকার্য্যে ভগবান সহায়—ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছিল ভগবান ক্রুর সংসার, বক্র সমাজের অনেক দূরে,—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর বন্ধু হইতে পারেন তিনি—সংসারে তাঁহার

বিচার আদালতেরই মত—সমস্তই সাজান-সাক্ষীর মারফতে—তাহাও এত বিলম্বিত, হাজতের প্রভাত পরিস্কার হইতেই জীবন আলোক নির্ব্বাপিত হয় প্রায়! আস্তিক নাস্তিকের বাদ-প্রতিবাদ আলোচনায় কখনই আগ্রহ প্রকাশ করি নাই; শক্তিও নাই, তর্কে ভক্তিও নাই,—জীবনে যাহা সহিতে হইতেছে, তাহার পরিণাম যদি জীবনপাতই হয়—তবে আর আমার সৎ থাকিবার ইচ্ছায় ফল কি! আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াও কি বলিতে দোষ—এই যে এত অত্যাচারেও আজীবন যেটাকে সু বলিয়া জানিয়াছি তাহাই অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—তাহার পুরস্কার কি এই! বলিবে হয় ত বিবেচনার অভাবে জীবন-গতিতে কোথায় কোন ভুল করিয়াছ,—অজ্ঞাত অপরাধ, তাহারই এই ফল! সেই জন্য এই অনন্ত কষ্ট—অসহ্য যন্ত্রণা! দয়াময় তবে কিসে তুমি ভগবান? তোমা হইতে বড় বলিয়া মানে আমার জীবন, তাকেই ব্যর্থ করিয়া দেয় যে, তাহাকে কি আখ্যা দেব? থাক্,—যে দেশে শক্তি হইতে ভক্তির স্তুতি বেশী,—ভক্তি হইতে ভয়েরই যেখানে প্রাবল্য—দেওয়ানার ভয়ে শিবানীর পূজা, সে দেশে থাক, আর ওকথা তুলিয়া কাজ নাই! একটি নয়, দুটি নয়, দশ দশটা বৎসর নরক যন্ত্রণা দিয়াও কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হইল না? আরও আছে তাড়নার আবশ্যক,—জীবনটাকে নূতন করিয়া যেই ধরিতে যাইতেছি অমনি আনিয়া জুটাইলে সেই পাপ রামচন্দ্র! ইহাতে কি করিতে ইচ্ছা হয় বল? প্রাণ কি করিতে চায়? মনে হয় না কি এ জগতটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলি ধূলি করিয়া একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেই—দূর হযে থাক সকল ভাল মন্দ—মরিয়া নিজেও মরি,—পড়িয়া পড়িয়া মার খাইয়া তোমাদের ও ভালমানুষিনীর সাধটা, মৌখিক নীতিবাদের প্রচার, প্রসারটা বেশ করিয়া মিটাইয়া দেই—তবে না মিটে গায়ের জ্বালা! কি করিয়া আজ আমি এ অবস্থায় হইতে পারি তোমাদের নীতিবোধের সুবোধ ছাত্র, অহিংসার অবতার—মন হইতে দূর করা এখন আমার পক্ষে সম্ভব—কি অত্যাচার অবিচারটাই গিয়াছে এ জীবনটার উপর দিয়া! খুটিনাটী করিয়া সে সকল দফায় দফায় স্মরণ হয় না সত্য,—স্মরণ হইলেও মন আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে কিন্তু—কিন্তু সেই অত্যাচার,—নির্দ্দোষের প্রতি অযথা পীড়ন—এ বক্ষে যে একটা গভীর কালিমা রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, তাহা কি কোন কালে অপসারিত হইবার? আমি কি করিয়া সে সকল বিস্মৃত হইব—আজ যে নূতন হইয়া মনে পড়িতেছে সমস্তই! কি অত্যাচারটাই না করিয়াছে রামচন্দ্র, তার স্ত্রীর

উপর আর বিধবা কন্যার উপর—সংসারটা অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়াও তাহার পাপ-স্পৃহার পরিতৃপ্তি হইল না! সহ্য করে যে কতদূর সে সহিতে পারে—তার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাই বুঝি লক্ষ্য এ সমাজের,—সাধ্বী রমনী অযত্নে অচিকিৎসায় অকালে প্রাণ দিলেন যক্ষ্মায়। প্রতিবাসী সব আমরা,—রাজচন্দ্রের স্ত্রীর অবস্থা শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গেলাম—তাঁহাকে দেখিতে, শুশ্রূষা করিবার আশায়,—ভদ্রপরিবারের কড়া নিয়মে নিজের ব্যবহার ঢাকিবার জন্যই বুঝি—সেবার অধিকার দেওয়া ত হইলই না বরং মন্তব্য হইল 'যত সব কলেজের বয়াটে ছেলে আড়ম্বরের একটা সুবিধে পেলে হয়—সে দিনকার একরত্তি ছেলে সে কিনা আসে আমায় ভালমন্দ শিখাতে!' অবাক! সকলের প্রাণ সকলের বুঝিবার ক্ষমতা নাই,—তুচ্ছ হইতে পারি তাচ্ছিল্য লাভের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না একবারেই—স্পষ্টই মুখের উপর শুনিয়াদিলাম; সেই আমার শনি সঞ্চারের আদি পর্ব্ব! উদ্ধত যুবক আমরা,—তখন থোরাই কেয়ার করিতাম, রাজচন্দ্রের ও বাস্তুঘুঘুর আস্ফালনকে। সেইখানেই হয়ত তার শেষও হইয়া যাইত কিন্তু যখন শুনিলাম স্ত্রী বিয়োগের পর একটা মাস অতীত না হইতেই, রাজচন্দ্র আবার তাহার শূন্য গৃহ নিভার দ্বারা পূর্ণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তখন রাগে ঘৃণায় পিত্তটা জ্বলিয়া গেল। কি ধৃষ্টতা! নিভাকে বিবাহ করিবে ঐ দুর্বৃত্ত,—পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ! এখনও ওর বিবাহের সাধ! সে সাধ ওর আমাকে বিধিমতে মিটাতে হবে! অস্থির হইয়া নিভার মাতার নিকট চলিলাম,—কোন প্রাণে, কন্যার জননী হইয়া তিনি সে প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন! রাজচন্দ্রের সহিত বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা স্বহস্তে তাহাকে বিষ দেওয়াও যে সুখের! প্রতিবাসী হইয়াও জানেন না কি তিনি, কি অত্যাচারে রাজচন্দ্র তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে?—হত্যা নিশ্চয়ই হত্যা—অত যন্ত্রণা দিয়া তিলে তিলে একজনের জীবনের সমস্ত আশা আনন্দকে নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়া মরণের মুখে ঠেলিয়া দেওয়াকে হত্যা বলিব না ত কি বলিব? আর সেই হত্যাকারী হইবে নিভার স্বামী! অসহ্য! আজ মনে পড়ে না সমস্ত কথা—মনে পড়ে শুধু সেই সময়ের আমার মনের প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা-বাতের তুমুল গর্জ্জন,—অধীর অস্থির তখন আমি,—ডাল ভাঙ্গে কি মূল ছিঁড়ে সে চিন্তার অবসর তখন ছিল না—কেবল উচ্ছাসের প্রাবল্যে—প্রবল বাত্যায় হৃদয় মন দেহ আন্দোলিত হইতেছিল—আমি অগ্র পশ্চাত না ভাবিয়া ঝড়ের মত উপস্থিত হইয়াছিলাম নিভাদের গৃহ দ্বারে! নিভার মাতা ও

রাজচন্দ্রে কি কথাবার্ত্তা চলিতেছিল—বোধহয় রাজচন্দ্র তাহার প্রচুর অর্থের মোহে মাতৃহৃদয় জয় করিতে সগর্ব্বে বাক্যজাল বিস্তার করিয়াছিল! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল,—শুধু অন্তরে জ্বলিয়া উঠিলাম না, বাহ্যিক ব্যবহারেও সংযত হইতে পারিলাম না,—রাজচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—'মুমূর্ষ' রোগীর শুশ্রূষার জন্য যার বাড়ীতে লোকে প্রবেশ অধিকার পায় না সে কোন্ নীতি বলে পরের গৃহে প্রবেশ করে!" রাজচন্দ্র রুক্ষ স্বরে উত্তর দিল—"আমায় জিজ্ঞেস কর্‌বার আগে তোমার নিজের এখানে আসবার কি অধিকার ভেবে দেখ না কেন? তোমার এ রকম স্বভাবে এঁদের যথেষ্ট উপকার করেছ! পরের শুশ্রূষা করে বেড়ান হয় বদমাস কোথাকার! এ বাড়ীতে আর ও বুজরুকী খাটছে না!"

আমার স্বভাবের উপর কটাক্ষ! বুদ্ধি হারাইলাম,—চিরকালের গোঁয়ার আমি—বাক্য ব্যয় না করিয়া ক্ষিপ্র গতিতে এক হাতে দৃঢ় মুষ্টিতে রাজচন্দ্রের বাম হস্ত ধরিয়া ফেলিলাম, দক্ষিণ হস্তে তাহার গরদান পাকড়াইয়া একদম দাঁড়করাইয়া দাওয়া হইতে নামাইয়া দিলাম, বলিলাম "এখন সোজা পথ দেখ—বদমাস এক স্ত্রীকে হত্যা করে সুখ হয় নি!"

নিভার মা "কি করিস্, কি করিস্—মেরে ফেল্লি যে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁর বাক্যে কর্ণপাত করিবার প্রবৃত্তি আমার তখন ছিল না। আমার ন্যায় বলিষ্ঠ যুবকের সহিত অর্দ্ধ-বৃদ্ধের সাক্ষাৎ-দ্বন্দ্বযুদ্ধের কি পরিণাম, ক্রূঢ় বুদ্ধি রাজচন্দ্র বোধহয় বেশ বুঝিত,—সে দিরুক্তি না করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। পলায়নপর কাপুরুষের অন্তর্ধানে আমার ক্রোধ ধ্বংস করিতে চাহিল নিভার মাতাকে। আত্মসংবরণ করিলাম—তিনি যে মাতা! বলিলাম "মাসীমা, কি করে বলুন ত ঐ পিশাচটার হাতে মেয়ে দিতে চান—জানেন না কি ওর স্বভাব?"

মাতা একটু দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিলেন—"কি করতে আর বলিস বাপু; ঘরে যার ষোল বছরের মেয়ে তার আবার কি ভাল মন্দ ভাববার উপায় আছে? যেখানে যাই সেখানেই চাই টাকা, হাজারের কম কোন দরিদ্রও মেয়ে নিতে চায় না,—গরীব বিধবা আমি,—খাওয়া পরার উপায় নাই—তোর গুণে কোন মতে দিন কাটাচ্ছি—টাকা দিয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে পারি আমি? রাজচন্দ্র বিনা টাকায় মেয়ে নিতে চাচ্ছে—মানুষ ও যেমন হ'ক—হাতে টাকা কে

আছে যথেষ্ট, সকলেই জানে—ওর সঙ্গে হলে নিভার মোটা ভাত কাপড়ের কষ্ট হবে না—এর চাইতে আমার মত দরিদ্র আর কি ভাল আশা করতে পারে!"

হায়, মোটা ভাত কাপড়! ইহার সংস্থানের জন্যই বাঙ্গলার কন্যার বিবাহ,—প্রেমহীন পরিণয়—মেয়ে মূল্যহীন,—মাতা হিতাহিত জ্ঞানহীন পাষাণ! উত্তর নাই আমার। সমাজের এই ব্যবস্থা—শির নত করিয়া গ্রহণ করিতে সকলেই বাধ্য। হৃদপিণ্ড তাহাতে শতছিন্ন হইয়া ছিন্নমস্তার মত আত্মরক্তে স্নাত হক সেও শ্রেয়, তথাপি সমাজের মান্য রাখিতে হইবে অক্ষুন্ন! যে সমাজে এমন বৃদ্ধের সহিত মাতা নিজে কন্যার বিবাহ দানে উদ্যত,—সমাজের বিবাহ-ব্রত রক্ষা করিয়া মান রক্ষার শোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে চান, সেখানে মনুষ্যত্বের অধিকার,—প্রাণধর্ম্মের বিচারের স্থান বহু পশ্চাতে! স্বহস্তে পিশাচের পদে কন্যাকে বলি দেওয়া ব্যতীত সেখানে কি আর আশা করা যায়? সে সমাজের আবার জীবন লইয়া কথা!

মাতার বাক্য শ্রবণে একেবারে দমিয়া গিয়াছিলাম,—তাঁহার উক্তি আমার উদ্যত ফণাকে প্রবল পদাঘাতে ধরালুণ্ঠিত, নিষ্পেষিত করিয়া দিল। সমাজের কি কদাচার অথচ অপ্রতিহত কুচিত্র আমার মানস পটে উদিত হইয়া জীবনটাকে দুর্ব্বহ ঘৃণা রূপে প্রতিভাত করিল! সমাজ রাক্ষসীর বেদীর সমক্ষে যূপবদ্ধ নিভা,—কি অসহায় তাহার মাতা,—ভক্তিতে না ত্রাসে কন্যা বলি দিতে প্রস্তুত—স্নেহময়ী হইয়া আজ পাষাণীর প্রসাদ লাভেচ্ছায় পাষাণী! বুঝাইব কাহাকে? কে মাতা? কন্যা কে? আমি কে? বাক্য সরিল না,—প্রশ্ন নেঃস্মুখ হইলাম,—মনে কেবল বাজিতেছিল নিভার মাতার বাক্য কয়টি,—অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তাহা আমার পাষাণ হৃদয়ে,—আজও তা ভুলিতে পারি নাই,—বহু কথা স্মৃতিতে সমাধিলাভ করিয়াছে কিন্তু আজও সেই মহা কষ্টের মহাদান মাতৃবক্ষের তপ্ত রক্তে লিখিত অক্ষর অবিকৃত অলন্ত আছে এ হৃদয়ে।

নিভা ছিল পাশেই কোথাও;—সে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া অকম্পিত কণ্ঠে রোজকারই মত সহজভাবে বলিল—"বিনোদদা তুমি অত উতলা হয়েছ কেন! মিছে কেন ভাব্‌ছ দাদা, সকলি ভগবানের হাত—মার যেখানে মত হয়েছে সেখানে আর বাধা হয়ো না,—উনি একটু নিশ্চিন্ত হ'ন!"

অবাক্! মেয়েটা বলে কি! আপনার ভালমন্দ শুভাশুভ চিন্তা করিয়া দেখিবার শক্তিটুকুও কি উহার নাই? বঙ্গের স্ত্রীজাতীর এমনি অধঃপতন ঘটিয়াছে!

অন্যদিন হইলে নিভার কথায় উত্তর দিতাম— সেদিন কোন কথা মনে আসিল না—কেবল মনে হইতেছিল—ইহাদের অতল তলে ডুবিয়া যাইবারই অবস্থা—যাক, তাই ডুবিয়া যাক্—শক্তি নাই কাহারো ইহাদিগকে রক্ষা করিবার—পুরুষ স্ত্রী, কন্যা সকলেই যেখানে দুরপনেয় সমাজ-কলঙ্ককে গৌরব-চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে ব্যগ্র, সেখানে আর মঙ্গল কোথা? মরণই সেখানে মঙ্গল—এ পাপ অভিনয়ের পরিসমাপ্তি!

নিভার হস্ত সরাইয়া দিয়া পাগলের মত গৃহে ফিরিলাম। নরহরিদার চক্ষু প্রতারিত হইবার নয়,—সে আমার চেহারা দেখিয়া প্রশ্ন করিল "কি,—চেহারা এমন লাগ্‌ছে যে অসুখ বিসুখ হয়নি ত?"

বলিলাম "অসুখ ত সকলেরই—শুনেছ না নিভার সঙ্গে রাজচন্দ্রের বিয়ে।"

নরহরিদা বলিল "না দিয়ে আর করে কি বল—নিভার মার যে অবস্থা!"

আবার সেই কথা! সকলেরই এক সুর। বলিলাম "বল কি নরহরিদা—তাই বলে কি অমন পিশাচ বুড়োটার হাতে মেয়ে দিতে হবে? কি করে ওর স্ত্রীর প্রাণটা গেছে তুমিও এরই মধ্যে ভুলে গেলে নরহরিদা!"

নরহরিদা উদাসভাবে বলিল "কিছুই ভুলিনি ভাই! মনে রেখেও বা ফল কি? সবই অদৃষ্ট!"

"অদৃষ্ট! রাখ তোমার অদৃষ্ট—আমি দেখব তোমার অদৃষ্টই কেমন! এ বিয়ে কিছুতেই আমি হতে দেব না!"

নরহরিদা সেবারে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"বেশ ত ভাই, বিয়েটা তুমিই কর না!"

বুড়ার উপর রাগও হইল, হাসিও পাইল—বুড়টা অবশেষে ভাবিল কিনা, নিভাকে হাত করিবার জন্যই আমার এত! সে ইচ্ছাই যদি আমার অন্তরে থাকিত,—নিভার লাভ আমার পক্ষে এমন কি কঠিন ছিল! যে অর্থে রাজচন্দ্র মাতার মনকে বশ করিয়াছে, আমারও সে অর্থের উপায় নাই,—বয়সে, দৈহিক সৌন্দর্য্যে ও বিদ্যায় আমি রাজচন্দ্র অপেক্ষা কোন অংশে হীন [illegible]? রাজ[illegible] যে ক্ষেত্রে যোগ্য বর রূপে বিবেচিত, আমি তথায় অবশ্য প্রার্থনীয়, কিন্তু

নিভাকে আমি কোন প্রাণে ক'রব গৃহিণী,--আমার হৃদি গঙ্গার পূর্ণ প্রবাহে পাহাড়ের প্রাকার অবরোধের সৃষ্টি করিব! বাঙ্গলার স্বামী স্ত্রী দুটিতে বড় মিল মিশ—একটা সংসারে দুইটী কর্ত্তাকর্ত্রী তাহারা এক সন্তানের মাতাপিতা—স্নেহের বাঁধনে উভয়ে বাঁধা, বেশ শান্তির, শৃঙ্খলায়, স্নিগ্ধ সুন্দর শান্ত চিত্র,—বাঁধা পথে চলিতে বেশ,—বড় আয়াসের, অনায়াসের চলা ফেরা বেশ সুবিধা কিন্তু জীবনের অভাব কোথায় তাহাতে?—পূর্ণতোয়া প্রেম প্রবাহিণীর উদ্দাম গতি কোথায় তাহাতে—উচ্ছলিত তরঙ্গ ভঙ্গের কল্লোল, উত্তরোল, ভাঙ্গন, গঠন—ক্রিয়ার চাঞ্চল্য বঙ্গদম্পতির জীবনে কোথায়? সে স্ত্রী—আমি পতি,—সম্বন্ধের বন্ধনে আমি তাহার প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য, সেও আমার অনুগমনে বাধ্য—বাধ্যবাধকতার সীমায় জীবনের লীলা, প্রেমের পরীক্ষা। তুচ্ছ,—তুচ্ছ,—প্রেমের অতি তুচ্ছ আদর্শ! তাহাতে আমার মন ভরিবে না—সে কেন হইতে যাইবে নিয়মের বাঁধনে আমার বাধা,—গতানুগতিক সংসারের আদর্শে আমি তুষিব তাহাকে? তাহার নাম তার প্রতি আমার আকর্ষণ? অতি দীন ছবি হইবে যে সেটা আমার হৃদয়ের! নিভার জন্য আমার এ প্রাণ-ছেঁড়া আকর্ষণ,—তাহাকে সুখী করিবার জন্য অগাধ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত তুলিবার সাধ,—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পদামে তাহাকে দেবীর সাজে সজ্জিত করিবার কল্পনা আমার, তাহা হইলে বৃথা হইয়া যাইবে—দুইটী দাম্পত্য জীবন একটা পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ হইয়া চিররুদ্ধ সীমাবদ্ধ পল্বলের মত কোন দুরন্ত গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রতাপে শুষ্ক হইবার ভয়ে বিক্ষোভিত বক্ষে কাল কটাইবে। না তাহা আমি পারিব না—আমি কল্পনা করিতে পারি নাই কখন নিভাতে আমাতে বিবাহ—নিভা যে আমার প্রভাতের স্বাধীন হিল্লোল—তাহার অবরোধ আমার দ্বারা অসম্ভব! 'কেন অসম্ভব? অবরোধ আমি না করি—এ অবরোধের দেশে অন্যে যে তাহার অবরোধ ঘটাইবে নিশ্চয়—তবে বঞ্চিত হইয়া আমার লাভ,—নিভারইবা তাহাতে স্বার্থকতা কি? বরং অন্যের হস্তে পড়িলে তার অধীনতা—আবিলা অনেক বেশী হইবার সম্ভাবনা!' মনের এ যুক্তি হৃদয় গ্রহণ করিতে রাজী নয়,—অন্যে অন্যায় করে করুক, বঞ্চিত হইব কেন? আর বঞ্চিত হইই যদি বঞ্চনা করিব কেন? সংসারের হিসাবেও সে যাহাতে সুখী হয় সেই আমার কাম্য!

বৃদ্ধকে আমার মনের ভাব বুঝাইবার নয়—তাহাতে তাহার সংস্কারবদ্ধ মনে কেবল সংশয় জন্মাইবে বৈত নয়। বলিলাম "নরহরিদা এও তোমার ঐ সেই অদৃষ্ট! এ অদৃষ্টে বিবাহ লেখা নেই! ওটায় আমার মন উঠে না—যে কুলীন বংশে বৃদ্ধ বয়সেও দশটা পাণিগ্রহণ করার রীতি, সে বংশে জন্মেও আমার একটায়ও অরুচি. বংশের কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার!"

সে দিনের অবস্থার কথা স্মরণে আসিলে আজও সুখদুঃখে হাসি পায়। নরহরিদা কিছুতেই বুঝিতে চাহিতেছিল না—বিবাহে আমার কেন আপত্তি.—যেখানে আমি নিভাকে পত্নীর প গ্রহণ করিলে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়, সুখের সংসার পত্তন হয়, সেখানেও আমি তাতে বিমুখ কেন!

যা'ক সে কথা, তখন চেষ্টাই হইল আমার রাজচন্দ্রের হস্ত হইতে নিভাকে রক্ষা করা—তাহার মানে তাহাকে অন্যত্র সৎপাত্রে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করা। সেই চেষ্টাই করিয়াছিলাম. অনেক কথা কাটাকাটির পর আমারই সতীর্থ,—সেও সেবারে বি-এ, দিয়াছিল—পরেশকে নিভার বর মনোনীত করিলাম। পরেশ. নরহরিদার দূরসম্পর্কীয় এক ভাগিনেয়ের পুত্র, পরেশ মেধাবী, পরিশ্রমী—কিন্তু তার সাংসারিক অবস্থা অতি সাধারণ—মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থানই তাহার উপযুক্ত চাকরী না মিলিলে অচল! তাহার ব্যবস্থা করিলাম—আমার অত অর্থের প্রয়োজন? আমার অর্দ্ধসম্পত্তির মালিক পরেশের ভাবি অর্দ্ধাঙ্গিনী নিভাননীকে করিবার কৃতসঙ্কল্প হইয়া—পরেশের সহিত নিভার বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। কোন পক্ষে অমত হইবার কথা নয়—কেবল নরহরিদা খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল!

সমস্ত ঠিক্—কনেকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য পরেশের পিতা পরেশ সহ এক দিন উপস্থিত হইলেন। নিভা কি অপছন্দের পাত্রী!—উভয় পক্ষেই মহা খুসী! ঠিক সেই সময়েই গগনের কোণে কাল মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল কে জানিত! সেই রাত্রে পরেশ ও তাহার পিতা এই অধমের আলয়ে অতিথি! গল্পগুজোবে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, রাত দুপুরের অনেক পরে শয়ন করিয়াছি, সহসা বিষম চীৎকারে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সর্ব্বনাশ!—খুন—খুন—পরেশকে কে খুন করিয়াছে! এঁ্যা—এ কি হইল!—আমি এ কি করিলাম!—কেন ওর অপমৃত্যু ঘটাইতে এখানে আনয়ন করিয়াছিলাম! উহার পরিবর্ত্তে আমাকে খুন করিল না কেন! এ পরিতাপ রাখিব কোথায়?

নরহরিদা আমার কক্ষে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "ও ওসব বলে কি ?—ছেলেটার এখনও প্রাণ আছে—গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে বলে কিনা—বিনোদ আমার প্রাণ নিল। যে হত্যাকারী আমার বক্ষে ছোরা মারিয়াছে সে দম্ভ করিয়া বলিয়া গেল 'নিভাকে এখন মনের সুখে বিবাহ কর !—বিনোদকে বঞ্চিত করে বিয়ে কর্‌বি নিভাকে !"

এ কি কথা ! মুমূর্ষের কক্ষে তদ্দণ্ডেই উপস্থিত হইলাম। তখন তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তাহার পিতা আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"রাক্ষস্, মনে যদি এই ছিল—তবে কেন...... "

আমি তাহার সে হৃদিবিদারক ধ্বনি সহ্য করিতে পারিলাম না, নিজ কক্ষে পলাইয়া আসিলাম—সেই হইল আমার কাল !

নরহত্যার অপরাধে আমি হইলাম অভিযুক্ত !—সে ভোগের কাহিনী স্মরণে আর আবশ্যক ! আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগের ত্রুটী একটুকুও দেখিলাম না—কোথা হইতে অজস্র সাক্ষী দেখা দিতে লাগিল—সকলেই সত্য পাঠান্তে নিগূঢ় সত্য তথ্য জ্ঞাপন করিয়া আদালতকে সত্য সন্ধানে সাহায্য করিল। বৃদ্ধ নরহরিদার অশ্রু আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। জামিনে খালাস হওয়া অপেক্ষা হাজতই আমার সে অবস্থায় ছিল শ্লাঘ্য—নীরবে সমস্তই সহ্য করিতাম। সংসারের, সমাজের, মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারের নিত্য নূতন পরিচয় পাইয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। কাহারও কিছু প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা, 'আমি হত্যা করি নাই,'--ব্যতীত অন্য কাহারও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে আমার ঘৃণা বোধ হইত। এ জঘন্য পাপ নরকে বাস করা অপেক্ষা ফাঁসীও আমার মনে হইতেছিল কাম্য। ফাঁসী হইল না—আমার জেল হইল নয় বৎসরের ! সেই দিন আদালতে রাজচন্দ্রকে দেখিলাম—ঈর্ষা পরিতৃপ্তির বিকট লাস্যে তাহার ললাট রেখাঙ্কিত,—নয়নে কুটিল হাস্য—লোলুপ রাক্ষসের ন্যায় আমার দিকে চাহিতেছিল। তাহার নয়নে নয়ন পড়িতেই,—আমার মনে আর সন্দেহ রহিল না-- আমার এ সকলের মূলে ঐ পিশাচ ! দ্বিতীয়বার আর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ক্রন্দনরত নরহরিদাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলাম "বৃথা আর চোখের জল ফেল্‌ছ কেন নরহরিদা ? তুমি না বলেছিলে সবই অদৃষ্ট ! আমার এ অদৃষ্ট ! নৈলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়েও খুনী বলে জেলে যাব কেন ! কেঁদনা দাদা, কাঁদলে কাজ হবে না—তোমার

অনেক এখন একাই করতে হবে—নিভা রইল, তুমি রইলে—নিভাকে রাজচন্দ্রের হাত হতে রক্ষা করতে পারবে কি না জানি না—আমি নিশ্চয় জেনেছি রাজচন্দ্রই আমার এ দশার মূলে—যা হয় হবে—নিভা যেন অভাবে কষ্ট না পায়, তোমার নিজের জন্যে খরচ করতে কার্পণ্য করোনা নরহরিদা। বেঁচে থাকি যদি, বেঁচে থাক যদি—এ দিন এমন থাকবে না—আমি এখনও বিশ্বাস করি—এ শুধু শুধু অদৃষ্টের পরিহাস নয় নরহরিদা—এ পরীক্ষা—আমি যদি মনে প্রাণে নির্দ্দোষ—নিরপরাধী হই—পরিণামে আমার জয় হবে নিশ্চয় !"

প্রহরী আর অপেক্ষা করিতে দিল না ? বৃদ্ধের চোখের জল উপেক্ষা করিয়া জেলে চলিলাম !—বলিয়াছি সে কি স্থান—কি ভীষণ জীবন্ত নরক সে জেল.—সে জেলও আমার তখন স্বর্গ বলিয়া মনে হইয়াছিল,—পুণ্যের আবরণে সেখানে এমন ঘোর পাপ বিরাজিত নয়—সেখানে সমস্ত একাকার—জাত মান—যাহার সমস্তই গিয়াছে—তাহার পক্ষে জগতের সহিত সম্পর্কহীন, জাতকুল নাশা জেলের জীবনে কিসের বিতৃষ্ণা !

সমাজে, মানুষে বিশ্বাস হারাইয়া—ঘৃণায় দুঃখ ক্ষোভে মনের তখনকার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—তাহার বলেই সহ্য করিতে পারিয়াছিলাম জেলকে ! হেয়তম জীবনই হইয়াছিল সে সময় আমার বরণীয় কিন্তু কেন আবার অগ্নিকাণ্ডের সহিত আমার জীবনে আগ্নকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল,—জীবন নদে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অস্থির হইয়া জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছিলাম—ফল তাহার হইল কি ! আশা কোথা ? কি শুনিলাম, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে,—রাজচন্দ্র আজও জীবিত ! আজও সে আমার রন্ধ্রগত শনি ! আমার পশ্চাতে আজও লাগিয়া আছে, আমার সর্ব্ব দুঃখের মূল—সেই পিশাচ দুর্দ্দান্ত শত্রু রাজচন্দ্র !

শ্রী—

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩৩০ সাল। { ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বর্ষ-বোধন।

—:-*-:—

এল রে বর্ষ এল
বোশেখী ঝঞ্ঝাবায়ে,
দোলায়ে শুক্‌নো শাখা
ফাগুনের কুঞ্জছায়ে!
চোখে তা'র চপল হাসি,
হাতে তা'র খেলার বাঁশী,
গমনে চম্‌কে জাগে
নাচনের ছন্দ পায়ে!

ওরে কোন্ কিশোর এল
জননীর বক্ষহারা ?
এল কে তরুণ টুটি'
জড়িমার অন্ধকারা ?
বিজয়ার বিজন সাঁঝে
বোধনের শঙ্খ বাজে !
চলে ওই মরণ ছাপি'
জীবনের মুক্তধারা !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

জাহানারা, লালকুমারী।

জাহানারা। ইম্‌তিয়াজ, কুহকিনী, তুমি আমায় এ কী করেছ ? আমার চোখের কোণে কী স্বপ্নের অঞ্জন তুমি পরিয়ে দিয়েছ ? আকাশে, বাতাসে কে যেন রক্তফাগের রাশ ছড়িয়ে দিয়েছে—কত লক্ষ কামনার আকুল শ্বাস ফুলের গন্ধটুকু অধরে নিয়ে মিলনের রাত্রির অনুরাগের রক্তে রাঙা করে তুলেছে। এ কোন কুহক মন্ত্রে ঘুমন্ত পুরীর অসাড় প্রাণ আজ

হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল—রুদ্ধ সৌন্দর্য্য নির্ঝরের কারা স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়ে জগতের মাঝে আপনাকে সে এমন ভাবে বিলিয়ে দিল? বল ইম্‌তিয়াজ, একি আমার চোখের ভুল?

লাল্‌কুমারী। শাহজাদা, এ ভুল নয় চির সত্য। এ যদি ভুল হয় সমস্ত জীবনটাই একটা ভুলের খেলা—কাল নিশিথের মিলন স্পর্শে আমার এ দেহবীণায় প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার উঠেছিল, তার শেষ রেশটুকু যে এখনও কেঁপে কেঁপে আমার পা' হতে মাথা পর্য্যন্ত অসহ্য পুলকের স্পন্দন তুল্‌ছে—এ কি ভুল হতে পারে?

জাহান্দার। তাইত, কাকে ভুল বল্‌ছি—তবে তোমায়ও ভুল বল্‌তে হয় ইম্‌তিয়াজ তবে ঐ আকাশের নীলিমাটুকুও একটা মোহ, তবে বসন্তের মদির সৌন্দর্য্য একটা স্বপ্ন, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা, কামনা একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা।

লাল্‌কুমারী। সাহজাদা, তুমি না আমায় কিন্‌তে চেয়েছিলে?

জাহান্দার। হাঁ, তোমার ও-রূপের একটা মূল্য আমি দিতে চেয়েছিলাম।

লাল্‌কুমারী। কেন শাহজাদা?

জাহান্দার। কেন? আজ ওকথা শুন্‌লে তোমার লজ্জার অবধি থাক্‌বে না ইম্‌তিয়াজ। বসন্তে লতায় পুষ্পাগমের মত যৌবন যেদিন হতে তার রূপের সম্ভারে তোমার ঐ দেহটাকে সাজিয়ে তুলেছিল সেদিন হতে আজ অবধি, মনে করে দেখ কতজন তোমার ঐ রূপ দেখে ভুলেছে—সবাই তোমাকে কিছু না কিছু অর্থ দিয়ে গেছে, তাই আমিও তোমায় সব চাইতে বহুমূল্য জিনিষ দিতে চেয়েছিলাম।

লাল্‌কুমারী। হাঁ, ঠিক্ বলেছ শাহজাদা—এ তুনিয়ার সঙ্গে আমার শুধু বেচা কেনার সম্বন্ধ। আমার এ রূপের দর কত হতে পারে সে যাচাই আজ আমায় কর্ত্তে হবে শাহজাদা, শুনলুম তুমি নাকি দিল্লীর সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছ?

জাহান্দার। হাঁ।

লাল্‌কুমারী। কেন ত্যাগ কর্লে?

জাহান্দার। পিতার কাছে শপথ করেছি।

লালকুমারী। শপথ করেছ? অন্যায় করেছ। যে সিংহাসন তুমি মিথ্যা শপথে ত্যাগ করেছ, আজ আমি বলছি আমার এ রূপের মূল্য সেই সিংহাসন।

জাহান্দার। ইমতিয়াজ, আজ তুমি একী বলছ?

লালকুমারী। আমি নির্ধন শাহজাদা—প্রেম জানিনা ভালবাসা জানিনা। বাইজী আমি চিরকাল এ রূপের হাটে ব্যবসা ফেঁদে বসেছি। আজ আমায় দেখতে হবে এ রূপের মূল্য কত! এ যে যমুনা পারে যে সুন্দরীর স্মৃতিটাকে চিরন্তন কর্‌বার জন্য মর্ম্মর গঠিত তাজমহল নির্ম্মিত হয়েছে তাঁর রূপের সঙ্গে আমার রূপটার পাল্লা চলে কি না আজ আমায় দেখতে হবে। আমার রূপের মূল্য ঐ ময়ূর সিংহাসন। দিতে পার্ব্বে?

জাহান্দার। নারি! একী তামাসা!.........খেলিয়ে নেবার অসীম শক্তি নিয়ে তোমরা জগতে এসেছ তাই নিষ্ঠুর ভাবে সকলকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ......এক নিমেষে আমার এই আলোর জগৎটাকে একেবারে কালি মাখিয়ে কালো করে দিলে? আমার সুখ-স্বপ্নের হাওয়ায় ওড়া রঙীন বসনখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিলে—ইমতিয়াজ্ সত্যিই কি প্রেম নেই?—না এ তোমার অভিমান।

লালকুমারী। এ আমার অভিমান নয়। অভিমান করা আর যাদের সাজে সাজুক, আমাদের সাজে না—তুমি আমায় কিনতে এসেছ, কিনতে পার্ব্বে?

জাহান্দার। তোমার এত অহংকার! ব'ল আমায় কি কর্ত্তে হবে। তোমার কি চাই? জাহান্দার আজ তোমায় সত্যই মূল্য নিয়ে কিনবে। প্রেমের বন্ধনের মূল্য তোমরা কি বুঝবে?......তাই অর্থের বাঁধনে আজ তোমায় বাঁধব। বল কি মূল্য তোমার চাই?

লালকুমারী। ঠিক বুঝেছ, শাহজাদা। অর্থই আমাদের সব......আমায় কেনবার মূল্য তোমাকে মোগল সাম্রাজ্যের বাদশা' হতে হবে।

জাহান্দার। তার চাইতে বল' তোমার বেগম হবার ইচ্ছাটা পূর্ণ কর্ত্তে হবে—তাই নয় কি?

লালকুমারী। হাঁ শাহজাদা, আমি বেগম হতে চাই।

জাহান্দার। ইম্‌তিয়াজ, তোমার জন্য জীবনের আদর্শ ত্যাগ করেছি—আজ তোমার জন্য পিতার কাছে যে শপথ করেছিলাম সে শপথটাও ভাঙ্গব। ভাই জাহান এসে যখন শুনবে যে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে আমি সিংহাসন অধিকার করে বসেছি, তখন সে নিশ্চয়ই ভাববে যে এ আগে হতেই ভেবে ঠিক্ করা ছিল। ইম্‌তিয়াজ, আজ হতে তুমি দিল্লীর সম্রাজ্ঞী।

লালকুমারী। থাক্ শাহজাদা এ ধর্ম্মহীনা সামান্য একটা নারীর জন্য তুমি কেন এত ত্যাগ কর্ত্তে যাচ্ছ?

জাহান্দার। তোমায় যে আমার চাই-ই ইম্‌তিয়াজ, আজ নিজকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, তুমি যেখানে ইচ্ছা আমায় নিয়ে যাও—এ জগতের আলো ছেড়ে ওই মৃত্যুর আঁধার ভরা কূপের মধ্যেও তোমার সঙ্গে যেতে আমার একটুও দ্বিধা হবে না। ইম্‌তিয়াজ, ইম্‌তিয়াজ—তুমি আমার।

লালকুমারী। হাঁ, আমি তোমারি, সম্রাট।

(পটনিক্ষেপ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—শিবির।

আজীম ও রুস্তমদিল।

রুস্তম। শাহজাদা, কাল শেষ রাত্রে খবর পেয়েছি, শাহজাদা জাহান ও হামিদ অনেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিকটেই আমাদের প্রতীক্ষা করছে।

আজীম। জাহান সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করছে! রুস্তম, তবে কি পিতা জীবিত নেই? বল রুস্তম, বল, পিতার সম্বন্ধে কিছু শুনেচ কি? আমায় লুকাচ্ছ কেন?

রুস্তম। না শাহজাদা, কিছুই নেই।

আজীম। আর বৃথা আশা। রুস্তম মিথ্যা সাম্রাজ্যের আশায়, মিথ্যা সিংহাসনের লোভে সৈন্য সংগ্রহ করবার জন্য অপেক্ষা করে পিতার শেষ সময়টাকে দেখ্‌তে পেলাম না না কষ্ট যে আমার চির-জীবন থাক্‌বে।

রুস্তম। শাহজাদা, ও পরামর্শ আপনাকে আমিই দিয়েছিলাম সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এত হতাশ হয়ে পড়লেন কেন, এত কেবল মাত্র সন্দেহ।

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজসিংহ। শাহজাদা, মাড়বারাধিপতি অজিতসিংহ আপনার সাহায্যের জন্য দশ সহস্র সৈন্য সহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তিনিও শীঘ্রই রওনা হবেন। এই যে তিনি পত্র দিয়েছেন।

আজিম। (পত্রখানা পাঠ করিয়া) সেনাপতি রাজসিংহ, এ অনুগ্রহের জন্য মহারাজ অজিতসিংহ আর আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সেনাপতি দিল্লীর কোনও খবর জানেন কি ?

রাজসিংহ। কেন আপনি কি কোন খবরই পান নি ?

আজিম। না রাজসিংহ, পিতা মৃত্যুশয্যায় পড়ে আমার জন্য পথেরদিকে তাকিয়ে দিন কাটাচ্ছেন—এ খবর আমি পেয়েছি যখন আমি বাঙলায় ছিলাম। তারপর আর কোন খবর পাই নি। বলুন, পিতা জীবিত আছেন কিনা ?

রাজসিংহ। শাহজাদা, এ দুনিয়ায় কেহই চিরদিনের জন্য আসে নি, তা জেনেও প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে আমাদের মন অধীর হয়ে পড়ে, প্রবোধ মানে না তাই আপনাকে আমি কোনও সান্ত্বনার কথা বলতে পারব না, বড়ই দুঃসংবাদ, শাহজাদা, বাহাদুর বাদশা স্বর্গে।

রাজসিংহ। চলে গেছেন।

আজিম। পিতা নেই রুস্তম। (কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রুমালের দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া তরবারির উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান।) রুস্তম, আর চেয়ে দেখছ কি ? সব শেষ হয়ে গেছে,—এই রইল আমার তরবারি—আমি যুদ্ধ করব না। সেনাপতি রাজসিংহ, আপনি ফিরে যান।

রাজসিংহ। একটু স্থির হোন, শাহজাদা। আমি দিল্লীতে শুনেছি যে আপনার পিতা সম্রাট বাহাদুর শা' আপনাকেই সিংহাসন দিয়ে গেছেন কিন্তু জাহান্দার ও জাহান একত্র হয়ে আপনাকে বঞ্চিত করবার চেষ্টায় আছে !

[গুড়ুম, গুড়ুম কামান গর্জ্জন]

ঐ যে জাহান বোধহয় আক্রমণের জন্য সৈন্য নিয়ে এসে পড়েছে।

রুস্তম। শাহজাদা, আমি বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

(রুস্তমের প্রস্থান)

(আবার কামান গর্জ্জন)

রাজসিংহ। শোক করবার সময় নেই; শাহজাদা, শান্ত হোন—দেরী কর্ব্বেন না এখনি এসে পড়বে।

(রুস্তমের প্রবেশ)

রুস্তম। হাঁ সেনাপতি আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। শাহজাদা জাহান অসংখ্য মোগল সৈন্য নিয়ে কামান দাগ্‌তে দাগ্‌তে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন।

(আবার কামান গর্জ্জন)

ঐ যে আবার গর্জ্জন! শাহজাদা, এই যে তরবারী গ্রহন করুন (তরবারি প্রদানে উদ্যত) আর দেরী করবার সময় নেই।

আজীম। কেন আমায় অনুরোধ কচ্ছ রুস্তম? আমার সাম্রাজ্যে কোন প্রয়োজন নেই।

রুস্তম। আপনি একি কর্ল্লেন, সেনাপতি? এ সর্ব্বনাশের খবরটা কি এখন না দিলে চল্‌ত না? শাহজাদা, সিংহাসনে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে কিন্তু সিরাজের প্রয়োজন আছে। আজ যদি আপনি আপনার এ প্রাপ্য অধিকার ছেড়ে দেন, তবে যে মোগল-সাম্রাজ্যে তার আর কোন অধিকারই থাকবে না।

(আবার কামানে অভ্রভেদী হুহুঙ্কার)

এই নিন্—আর সময় নেই—ঐ দেখুন সাম্‌নে কামানের ধুমে আর ধুলারাশিতে আকাশ সমাচ্ছন্ন করে মোগল সৈন্য এসে পড়েছে।

আজীম। দাও রুস্তম, তরবারি দাও।

(তরবারি আজিমের হস্তে অর্পণ)

পিতা, ক্ষমা কর্ব্বেন একদণ্ড বসে যে আপনার জন্য কয়েক ফোঁটা জল ফেল্‌ব, খোদা আমায় সে অবসরটুকুও দিলেন না।

(আবার শব্দ)

কুস্তম। রাজসিংহ, রাজপুত সৈন্য পথ ভ্রমণে বোধহয় অতিশয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এ বেলায় আক্রমণ আমি বাঙ্‌লার সৈন্য নিয়ে প্রতিরোধ করি, আপনি সে অবসরে একটু বিশ্রাম নিয়ে তাজা হয়ে উঠে, বিকেল বেলায় যুদ্ধে নাম্‌বেন।

আজীম। হাঁ, সেই ভাল রাজসিংহ, আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আচ্ছা, আজকে যুদ্ধ না করে কয়টা দিন অপেক্ষা কর্লে হয় না, কুস্তম?

কুস্তম। সে কি করে হবে শাহজাদা? ঐ যে তারা এসে পড়েছে।

আজীম। কেন তারা যতই আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌বে আমরা ততই পেছিয়ে পড়্‌ব।

কুস্তম। না শাহজাদা সে ভুল হবে, সৈন্যরা যুদ্ধের আশায় প্রস্তুত হয়ে আছে এখন যদি যুদ্ধ না করে পেছনে যেতে আরম্ভ করি তবে তারা হতাশ হয়ে পড়বে, আর বিপক্ষের সৈন্য উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌বে।

রাজসিংহ। শাহজাদা যা সঙ্গত মনে করেন তাই হউক, রাজপুত সৈন্য সকল সময়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

আজীম। তবে তাই হবে, আজই যুদ্ধ। সেনাপতি রাজসিংহ, আপনি যান্‌, বিশ্রাম করুন, যখন দরকার হবে আপনাকে খবর পাঠাব, প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

(রাজসিংহের প্রস্থান)

কুস্তম। আমিও যাই শাহজাদা সৈন্যদের সজ্জিত করে উপযুক্ত স্থানে তাদের স্থাপন কর্ত্তে হবে।

(কামান ভৈরব রবে গর্জ্জিয়া উঠিল)

আজীম। যাও কুস্তম, যা কর্ত্তব্য তুমিই সব কর্ব্বে।

(কুস্তমের প্রস্থান)

আজীম। দুটী বন্ধন আমার ছিল, এক পিতা আর সিয়ার। একটী বাঁধন আজ ছিঁড়ে গেল।—মৃত্যু সেও শান্তি, নিদ্রা জীবনের কোলাহল সব থেমে যায়, অসীম দুঃখ, উজ্জ্বল আশা শেষ হয়ে যায়, সব ফেলে চলে যেতে হয়—জীবনের ওপারে। সাম্রাজ্য, সিংহাসন কিছুই

আমি চাই না—আজ ঐ সবুজঘাসের চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়াই আমার একান্ত ইচ্ছা।—শুধু সিয়ার—

(আবার শব্দ)

ঐ যে কামান মৃত্যুর দণ্ড নিয়ে আহ্বান কচ্ছে—যাই মরণোৎসবের উদ্যোগ কতটা হল দেখ্‌তে হবে।

(পটনিক্ষেপ)

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—প্রান্তরস্থিত একটা উচ্চভূমি।

হামিদ ও জাহান।

জাহান। হামিদ, দক্ষিণদিকে রুস্তম ঘোরতর যুদ্ধ কচ্ছে, পেছন থেকে দু'দল সৈন্য যারা এতক্ষণ পর্যান্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়নি, তাদের সাম্‌নে নিয়ে এস তারপর ঐ দিক পরিচালনা কর—শীঘ্র, দেরী কোর না—আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পারেই আমাদের জয় হবে।

(হামিদের প্রস্থান)

জাহান। রাজসিংহ উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত মোগল সৈন্যের উপর লাফিয়ে পড়েছিল—উঃ কী ভয়ানক দুর্দ্ধর্ষ—রাজপুত সৈন্য প্রথম আক্রমণ প্রতিহত হওয়ায় ফিরে গিয়েছে। ঐ যে আবার আস্‌ছে নয়—একদল অশ্বারোহী সৈন্য তীরের মত মাঝখানে এসে পড়েছে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক খবর কি?

সৈনিক। দক্ষিণদিকে আমাদের বেগ সহ্য কর্ত্তে না পেরে রুস্তমদিল খাঁ সৈন্য নিয়ে পেছিয়ে পড়েছে।

জাহান। যাও প্রহরী, সত্বর হামিদ খাঁকে মাঝখান দিয়ে সৈন্য নিয়ে আস্‌তে বলো—আমার আদেশ জানিয়ে এস।

প্রহরী। আদাব শাহজাদা।

(প্রহরীর প্রস্থান)

জাহান। ঐ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নিশ্চয়ই আজীম শেষ চেষ্টা দেখ্‌তে এসেছে।—ঐ যে একটা জ্বলন্ত রক্তবর্ণ গোলা কার অশ্বের বক্ষ বিদীর্ণ করে চলে গেল? যাই:—

(জাহানের প্রস্থান)

(আজিম ও রুস্তমের প্রবেশ)

আজীম। রুস্তম, আঁধার হয়ে আস্‌ছে, সমস্ত দিন যুদ্ধ করে সৈন্যগুলি পরিশ্রান্ত! ঐ দেখ আক্রমণ কর্ত্তে গিয়ে দলে দলে বাত্যাহত লতার মত পড়েছে—আর আশা নেই। শুনেছিলুম মহারাজ অজিত সিংহ সাহায্যের জন্য আস্‌বেন—এ সময়ে যদি তিনি এসে পড়্‌তেন।

রুস্তম। শাহজাদা, আমি যাই, আর একবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে। এখনও আশা আছে।

(রুস্তমের প্রস্থান)

আজীম। রুস্তম, তুমি আমায় দুনিয়ার আর একটা চিত্র দেখালে। পাশাপাশি দুটো কি বিসদৃশ—একেবারে বিপরীত—আজ আমরা সিংহাসনের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই কর্চ্ছি। আর তুমি নিজের প্রাণের দিকে একটীবার না তাকিয়ে পরের জন্য এ ভীষণ যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌লে!

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজসিংহ। শাহজাদা, আপনি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন। আর জয়ের আশা নেই।

আজীম। রাজসিংহ, আপনি না রাজপুত! তবে আমায় পালাতে বল্‌ছেন কেন? আপনারা আমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছেন, আর এই বিপদের মাঝে ফেলে আমি প্রাণ ভয়ে পালাব—এত কাপুরুষ আমি নই, রাজসিংহ। এস।

(কামানের ভীমরবে গর্জ্জন)

এই দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের দীপ্তিটুকুও নিভে যাক্—ঘোর আঁধার।

(পটনিক্ষেপ)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বৈশাখী বর্ষা।

—ঃ-*-ঃ—

সভয়ে হেরেছি তোরে লো কাল-বৈশাখি !
গৈরিক-বসনা বামা, জ্বালাময় আঁখি,
নৃমুণ্ডে আসব-পান-মত্তা কাপালিকা,
ভৈরবী ত্রিশূলপাণি ! রক্ত ললাটিকা
জ্বল জ্বল দীপ্ত ভালে, ভীষণ দর্শন,
এলায়িত রুক্ষ কেশে তাণ্ডব নর্ত্তন !
হেরেছি চঞ্চলা নারী ঘোরা উন্মাদিনী,
রুদ্রাক্ষ-মালিকা কণ্ঠে ভীমা সন্ন্যাসিনী।
হা তাপসী কে জাগাল সুষুপ্ত পরাণ
গৈরিকের অন্তরালে ?—দীপ্ত দু' নয়ান
নিমেষে মেদুর হল ভরি অশ্রুজলে,
ঝরঝর ঝরে আঁখি বসন-অঞ্চলে !
মোহিনী সাজিলে মরি পরি' নীলবাস,
সজল নয়ন দুটি, মুখে মৃদুহাস !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বুদ্ধদেবের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধদেবের জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর সংক্ষেপে তাঁহার ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে বোধিদ্রুমমূলে প্রতীত্যসমুৎপাদ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। এই ব্যাপারটী জটিল ও দুর্ব্বোধ। বিনয় পিটকে লিখিত আছে—"অবিজ্জা পচ্চয়া সংখারা, সংখার পচ্চয়া বিঞ্ঞানং, বিঞ্ঞানপচ্চয়া নামরূপং, নামরূপপচ্চয়া সলায়তনং, সলায়তনপচ্চয়া ফস্সো, ফস্সপচ্চয়া বেদনা, বেদনাপচ্চয়া তণ্হা, তণ্হাপচ্চয়া উপাদানং, উপাদান পচ্চয়া ভবো, ভব পচ্চয়া জাতি, জাতি পচ্চয়া জরামরণং সোক পরিদেব দুক্খ-দোমনস্সুপায়াসা ভবন্তি। এবং এতস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স সমুদয়ো হোতি। অবিজ্জায় ত্বেব অসেসবিরাগ নিরোধা সংখার নিরোধো, সংখারনিরোধো বিঞ্ঞাননিরোধো···পে...জাতিনিরোধা জরামরণ সোক পরিদেব দুক্খ দোমনস্সুপায়াসা নিরুজ্ঝন্তি।"

সংসারচক্রে আবর্ত্তনের এই দ্বাদশটী নিদান—পরস্পর শৃঙ্খলিত। অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান হইতে নামরূপের নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের, ষড়ায়তন হইতে বেদনার, বেদনা হইতে তৃষ্ণার তৃষ্ণা হইতে উপাদানের, উপাদান হইতে ভবের, ভব হইতে জাতির অর্থাৎ জন্মের, এবং জাতি হইতে জরামরণের উৎপত্তি হইয়াছে। অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, এইরূপ পর পর জরামরণের নিরোধে সকল শোক পরিবেদনা দুঃখ দৌর্মনস্যের নিরোধ হয়। এই নিদান শৃঙ্খলের এক প্রান্তে অবিদ্যা, অন্য প্রান্তে জরামরণ। একের অবিদ্যার স্থিতিতে শৃঙ্খলস্থ তাবৎ নিদানের স্থিতি, এক অবিদ্যার নিরোধে সকলের নিরোধ। এই অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দগুলি সকলই পারিভাষিক শব্দ। বিষয়টী জটিল, সময়ও অল্প, পূর্ণ ব্যাখ্যা সুতরাং অসম্ভব। ইহার যথাসম্ভব ব্যাখ্যা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'জিজ্ঞাসা' নামক পুস্তকে করিয়াছেন। মোটামুটি সংক্ষেপে একটি ব্যাখ্যা দিতেছি।—জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা বাস্তবিক

ভ্রান্ত জ্ঞান, অজ্ঞান, অবিদ্যা। মনুষ্যের সমস্ত চিত্তবৃত্তির নাম সংস্কার, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, অনুভূতি, ভয়, মোহ সকলই সংস্কার—তাহারাই আমার অন্তঃশরীরের বিভিন্ন অংশ। সেগুলির সমষ্টিমাত্রই আমার সমগ্র অন্তঃশরীরের নহে, তজ্জন্য আর একটী জিনিষের প্রয়োজন হয় তাহা বিজ্ঞান (অর্থাৎ Consciousness) ইহার কার্য্য বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করা, তাহাদিগকে সন্নিবিষ্ট করা, যথাযোগ্য কর্ম্মে বিনিযুক্ত করা। তাহার পর নামরূপ; বেদনা (Sensation), সংজ্ঞা, (perception) সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারিটি স্কন্ধের একযোগে নাম অর্থাৎ অন্তর্জগৎ অথবা মনোজগতের সৃষ্টি; ক্ষিতি অপ্‌, তেজ ও মরুৎ এই চারিটী মহাভূতের সমষ্টি পঞ্চম স্কন্ধ অর্থাৎ রূপ অথবা বাহ্যজগৎ; অতএব নামরূপ হইতেছে সমগ্র জগৎ,—বিশ্ব জগৎ অন্তর ও বাহ্য। অতএব—"অবিদ্যা বশে সংস্কারগুলি বিজ্ঞান কর্তৃক সুবিন্যস্ত হইয়া নামরূপে পরিণত হইয়া বিশ্বজগতের সৃষ্টি করিয়াছে। দর্শন প্রভৃতি পাঁচ এবং অন্তঃকরণ এই ছয়টী ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ষড়ায়তনের সাহায্যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের আদান প্রদান চলে। এই ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগৎ ও মনোজগতের যে Contact তাহা স্পর্শ। তাহার ফলে বেদনা অর্থাৎ বিবিধ অনুভূতির নূতন নূতন বিকাশ। তাহার ফলে তৃষ্ণার উদ্‌গম, বাহ্যজগতের সহিত আদান প্রদান চালাইবার আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব। তাহা হইতে উপাদান—বাহ্যজগতের প্রতি অন্তর্জগতের আকর্ষণ বাহ্যজগতে আসক্তি। এক্ষণে বাহ্যজগৎ অন্তর্জগৎ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, উভয়ের মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এখন অহং প্রত্যয়ের বিকাশ হইয়াছে। এখন আমি হইয়াছি, ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না। আমার এই উৎপত্তির নাম ভব। সেই আমার উৎপত্তির নামান্তর জাতি বা জীবরূপে জন্ম। জীব জন্মের মুখ্য ফল—ভগবান সিদ্ধার্থের মতে জরামরণ। জরামরণের সহকারী শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য।"

বৌদ্ধগণ আত্মা স্বীকার করেন না; অথচ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন। হিন্দুদের নিকট এরূপ ব্যাপার অভাব্য, অচিন্তনীয়, দুর্ব্বোধ ও আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিভাত

হয়। কিন্তু বৌদ্ধের নিকট আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার নির্ব্বাণ লাভের পরিপন্থী—ইহাকে সক্কায় দিট্‌ঠি বলে, (fallacy of Soul) সংযুক্ত নিকায়ে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—

*   *   *

সক্কায় দিট্‌ঠি প্পহনায়
সতো ভিক্‌খু পরিব্বজে।

Buddhistic Compendium of Philosophy নামক পুস্তকের ১৭১ পৃষ্ঠায় আত্মা-বাদকে চতুর্থ উপাদান বলিয়া ধরা হইয়াছে—a theory of Soul অত্তবাদ—উপাদানং। উপাদান নির্ব্বাণ লাভের পরিপন্থী।

"Ego" এবং "Continuous Personal Identity" বৌদ্ধ স্বীকার করেন না। এতদ্বিষয়ে মিলিন্দ প্রশ্নে (মিলিন্দ পঞ্‌হো) বিস্তারিত আলোচনা আছে। আচার্য্য নাগসেন যবনরাজ মিলিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রথে আসিয়াছেন?"

"হুঁ।"

"রথটা কি? ঈষ কি রথ?"

"না।"

"অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর, রথদণ্ড, যুগ, রশ্মি...কি রথ?"

"না।"

"অক্ষ চক্র রথপঞ্জর রথদণ্ড যুগ রশ্মি ব্যতীত অন্য বস্তু কি রথ?"

"না"

"আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া রথ দেখিতে পাইতেছি না—তবে রথ কোথায়? আপনি অলীক বলিতেছেন—আপনি সকল জম্বুদ্বীপের রাজা, আপনি কাহার ভয়ে মিথ্যা বলিতেছেন? হে পঞ্চশত যবন, হে অশীতি সহস্র ভিক্ষু, তোমরা দেখ আমি মহারাজ মিলিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন রথে আসিয়াছি—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার রথ কই বলুন, কিন্তু রথ তিনি 'সম্পাদন' (দেখাইতে) করিতে পারিলেন না। দেখ তিনি মিথ্যা বলিতেছেন।"

তখন মহারাজ মিলিন্দ বলিলেন—"ভদন্ত নাগসেন, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া (পটিচ্চ=অর্থাৎ ইহাদেরই হেতু, প্রত্যয়ে) রথের নাম হইয়াছে।"

তখন ভদন্ত নাগসেন বলিলেন—"সাধু সাধু, মহারাজা রথ কি তাহা জানেন দেখিতেছি। সেইরূপ মহারাজা আমার লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, প্লীহা, যকৃত, রক্ত ইত্যাদি হেতু অবলম্বন করিয়া রূপ, বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া নাগসেন এই সংখ্যা নামমাত্র প্রবর্তিত হইয়াছে, পরমার্থতঃ এ স্থলে কোনও পুদ্‌গলের উপলব্ধি নাই।"

অন্যস্থলে দেখি রাজা বলিলেন—"ভদন্ত নাগসেন, যে উৎপন্ন হয় সে কি সেই? অথবা অন্য ব্যক্তি?" নাগসেন বলিলেন—"ন চ সো ন চ অঞ্ঞো—অর্থাৎ—সে সেও নয় অন্যও নয়।"

রাজা বলিলেন—উপমা দিন।

নাগসেন—"আপনি কি মনে করেন মহারাজ, যখন আপনি শিশু তরুণ উত্তানশায়ী ছিলেন সেই কি আপান এখন এত বড়?"

'না'

"শিশু তরুণ উত্তানশায়ী অন্য, এবং এই যে বড় আপনি ইনি অন্য?"

"না।"

তাহার পর নাগসেন বলিলেন এই কায় অবলম্বন করিয়া তরুণত্ব, বৃদ্ধত্ব হয়। তাহার পর তিনি বলিলেন—"যে যদি একটা প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলে, প্রথম যামের অচ্চি, মধ্যম যামের অচ্চি নহে, অথবা পশ্চিম যামের অচ্চি নহে—প্রথম যামের প্রদীপ, দ্বিতীয় যামের প্রদীপ ও তৃতীয় যামের প্রদীপ—সে একই প্রদীপ। সেই প্রদীপের জন্যই (হেতু) সর্ব্বরাত্রি আলো জ্বলিতেছে।" নামরূপকে অবলম্বন করিয়াই রূপান্তর ঘটিতেছে। অতএব Rebirth is not Transmigration. এই শেষোক্ত বিষয়টাও উপমাদ্বারা বুঝান হইয়াছে—তাহা এখনে বলিবার সময় নাই।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বলি—"বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য অক্ষরে অস্তিত্ব মানেন না। যাহা বেদান্তের নিকট স্বতঃসিদ্ধ তাহা বৌদ্ধের নিকট একেবারে অসিদ্ধ। বৌদ্ধের নিকট নামরূপই সব অর্থাৎ যে জ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরা আমাদের প্রতীয়মান হয় তাহাই সব। জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞাতা নাই। এই পরস্পর সম্পর্ক রহিত বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক জ্ঞানগুলির পারিভাষিক নাম সংস্কার। তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, তবে একটা সম্বন্ধের কল্পনা করা হয় বটে। সেই সম্বন্ধ বিজ্ঞান নামক পদার্থ দ্বারা সংস্থাপিত হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞান ও ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র। উহাও একটা অনির্ব্বাচ্য কোন একটা কিছু নহে। এই সংস্কার সমূহ ও সংস্কারে সমূহের প্রভু বিজ্ঞান উভয়েরই সমষ্টি একত্র করিয়া একটা মিথ্যা "আত্মা" বা "আমি" কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু তাহা অমূলক ও অনাবশ্যক কল্পনা।... সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টি করিলে যাহা হয় তাহাই নামরূপ। কিন্তু সেই নামরূপের সাক্ষী কেহ কোথাও নাই।"

এই কথাই অন্য ভাষায় Rhys Davids বলিয়াছেন—

(Hibbert Lectures 1881)—"The object of the wise man should be to know, inwardly and consiously, the great soul of all ; and by this knowledge his individual soul would become united to the Supreme Being the true and absolute self. This was the highest point of the old Indian Philosophy (that is the Upanishads).

কিন্তু—"The distinguishing characteristic of Buddhism was that it started on a new line, that it looked at the deepest questions men have to solve from an entirely different standpoint. It swept away from the field of its vision the whole of the great soul-theory which had hithirto so completly filled and dominated the minds of the superstitious and the thoughtful alike. For the first time in the history of the world it proclaimed a salvation which each man could gain for himself, and by himself in this world, during this life, without any the least reference to god or to gods, either great or small.

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সময় অল্প। বৌদ্ধেরা আত্মা মানেন না, ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনাকে সময়ের অপব্যবহার মনে করেন। মজ্ঝিমা নিকায়ান্তর্গত সব্বাসবসূত্রে এই জল্পনা বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—ভবিষ্যৎ জন্মে আমি কি বা কেমন হইব? সত্যই কি আমি আছি না নাই? আমি কেমন? কোথা হইতে আমার সত্তা আসিয়াছে, কোথায় যাইবে।" এইরূপ জল্পনা একেবারে—নিষ্প্রয়োজন।

Rhys Davids (of cit. p-91) বলিয়াছেন—"I have no hesitation in maintaning that Gotama did not teach transmigration of soul. What he did teach world be better summarized, if we wish to retain the word transmigration, as the transmigration of character. But it would be more accurate to drop the word transmigration altogether when speaking of Buddhism, and to call its doctrine the doctrine of Karma. Gotama held that after the death of any being, whether human or not, there survived nothing at all but that being's *Karma*, the result that is, of its mental and bodily actions. Every individual, whether human or divine was the last inheritor & the last result of karma of a long series of part idividual........."

এই কর্ম্মবাদ বড়ই দুর্ব্বোধ্য। অতএব বৌদ্ধগণ একটুকু ঘুরাইয়া বলিলেন যে তণ্হা অর্থাৎ তৃষ্ণাই নূতন জীবের জন্মের জন্য দায়ী এবং এই জীবকেই পূর্ব্ব জীবের কর্ম্মের উত্তরাধিকারী হইতে হয়। কিন্তু কি করিয়া যে ইহা ঠিক ঘটিত তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিত না—ইহার গূঢ় তথ্য কেবল বুদ্ধই বুঝিতেন। জীবন অনন্ত অস্তিত্বের শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়; এই সংসারের বৃত্ত হইতে বহির্গত হইবার অবস্থা প্রাপ্তি কাম্যবস্তু, এবং তাহার কারণ সমূহ ও জানিতে হইবে। এই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলেই শৃঙ্খলচ্ছেদ হইবে, কর্ম্মবন্ধন টুটিয়া যাইবে, আর জন্ম হইবে না।

অতএব জন্মের কারণ বা উপাদান—তৃষ্ণা। সংসারে (The endlessly reborn life flux of beings), বট্ট (বর্ত্ত), আবট্ট (আবর্ত্ত) এই তৃষ্ণার ফল। এই তৃষ্ণারই অপর বিকাশ উপাধিকে, তাহারাই 'bases or substrate of rebirth'; ইহাই পঞ্চকামগুণর

(Sensuous enjoyment), পঞ্চকখন্দা অথবা 'কিলেস।' পুনর্জ্জন্ম চারিটী যোনিতে হইতে পারে—(১) অন্ডজ, (২) জলাবুজ (জরায়ুজ), (৩) সংবাদজ এবং (৪) 'ওপ পাতিকা' (Apparitional birth—পিতৃ সহযোগ ব্যতীত ও জন্মকে 'ওপপাতিকা' জন্ম বলে)। এই পুনর্জন্মের পাঁচটি গতি আছে—পঞ্চগতিয়ো—(১) নিরয়ো, (২) তিরচ্ছান যোণি, (৩) পিত্তিবিসয়ো, (৪) মনুস্‌সা, (৫) দেব।—অর্থাৎ নরক, পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক জাতিতে জন্মগ্রহণ প্রেতযোনিতে জন্মগ্রহণ, মানুষ হইয়া এবং দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ। জন্মের নিরোধ হয় কি করিয়া ? দেখা যাউক ইহার কি উত্তর আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বুদ্ধদেব ইসিপত্তন মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া তিনি কহিলেন—হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রাজক ব্যক্তি দুইটি অন্ত পরিহার করিবে—যথা হীন অনার্য্য অনর্থমূল কামসুখ ভোগ এবং অনার্য্য অনর্থমূল শরীর ক্লেশকর কঠোর তপশ্চর্য্যা। এই দুয়ের অন্তবর্ত্তী অর্থাৎ মধ্যম পদই অভিজ্ঞা, সম্বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণে লইয়া যায়। ইহাই অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো)—তাহা হইতেছে এই; সম্যক দৃষ্টি (সম্মাদিট্‌ঠি), সম্যক সঙ্কল্প (সম্মা সঙ্কপ্পো), সম্যক্ বাক (সম্মা বাচা), সম্যক কর্ম্ম (সম্মা কম্মন্তো), সম্যক আজীব (সম্মা আজীবো—Right livelihood), সম্যক ব্যায়াম (সম্মা বায়াম—Right exertion) সম্যক স্মৃতি (সম্মাসতি) এবং সম্যক সমাধি (সম্মা সমাধি)। তাহার পর তিনি চতুরার্য্যসত্যের ব্যাখ্যা করিলেন—

১। দুক্খম্ অরিয় সচ্চম্—জাতি পি দুক্খা, জরা পি দুক্খা, ব্যাধি পি দুক্খা, মরণম্ দুক্খং, অপ্পিয়েহি সম্পয়োগ দুক্খা; পিয়েহি বিপ্পয়োগো দুক্খো, যম্পি ইচ্ছং ন লভতি তং পি দুক্খং, সংখিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা পি দুক্খা। অর্থাৎ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়ের সহিত যোগ, প্রিয় হইতে বিচ্ছেদ যাহা ইচ্ছা করিয়া পাওয়া যায় না—সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানজই দুঃখ।

২। ইদং খোপন ভিক্খবে দুক্খ—সমুদয়ং অরিয় সচ্চং—যায়ং তণ্হা পোনোব্ভবিকা। নন্দিরাগসহ গতা তত্র তত্রাভিনন্দিনি। সেয্যাথীদং—কাম তণ্হা ভবতণ্হা,

বিভব তণ্হা—। অর্থাৎ দুঃখের উদ্ভব (হেতু) দ্বিতীয় আর্য্য সত্য তৃষ্ণাই পুনর্জ্জন্ম (ভব) ঘটায়, তাবৎ বস্তুতে আনন্দ, মোহ ও আকর্ষণের সহিত ইহার যোগ আছে—এই তৃষ্ণা ত্রিবিধ, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে অভিলাষ, জীবনের অভিলাষ এবং ধনের অভিলাষ।

৩। ইদং খোপন ভিক্খবে দুক্খনিরোধম্ অরিয় সচ্চম: যো তস্সা যেব তণ্হায় অসেস বিরাগ নিরোধো চাগো, পটিনিস্সগ্গো মুত্তি অনালয়ো।—অর্থাৎ দুঃখ নিরোধ তৃতীয় আর্য্যসত্য—যথা (আকর্ষণের বস্তু হইতে) নিঃশেষ নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিসর্গ, মুক্তি ও অনাসক্তি।

ইদং খো ভিক্খবে দুক্খনিরোধগামিনি পটিপদা অরিয়সচ্চং অয়মেব অরিয় অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো—অর্থাৎ দুঃখনিরোধের পথ চতুর্থ আর্য্যসত্য তাহা পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

তবে তৃষ্ণার নিরোধই হইতেছে নির্ব্বাণ—এবং তাহা লাভ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে। যে সরিৎ বাহিয়া নির্ব্বাণ সমুদ্রে পৌঁছা যায়—তাহার চারিটী ক্রম আছে।—এই চারিটী মার্গ (চত্তারো মগ্গো) প্রথম সোতাপন্নের (স্রোতাপন্নের) দ্বিতীয় সকদাগামীর (সকৃদাগামীর)—নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব্বে ইহাঁকে আর একবার জন্মিতে হইবে; তৃতীয় অনাগামীর (ইনি আর মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিবেন না, পরন্তু ব্রহ্ম লোক হইতে নির্ব্বাণে পৌঁছিবেন), এবং চতুর্থ অর্হত্ত্বের অর্থাৎ নির্ব্বাণের। প্রত্যেক ক্রমের আবার নীচ উচ্চ ভেদে দুই স্তর আছে—যথা স্রোতাপত্তি, স্রোতাপত্তিফল ইত্যাদি। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র এবং সুমঙ্গলা বিলাসিনী দ্রষ্টব্য।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত মত আছে। সংযুত্ত নিকায় মজ্ঝিমনিকায়, কথাবত্থু, ইতিবুত্তক প্রভৃতি সকল পুস্তকেই এ বিষয়ে এক মত—নির্ব্বাণ হইতেছে তৃষ্ণার নিরোধ। নির্ব্বাণ তৃষ্ণার উপসম—বূপসমো; অচ্চন্ত সন্তি—অত্যন্ত শান্তি (final peace); অতএব ইহাই পরম সুখ—সারীপুত্র বলিতেছেন—তত্র খো আয়স্মা সারীপুত্তো ভিক্খূ আমন্তেসি—সুখমিদম আবুসো নিব্বানং, সুখমিদম আবুসো নিব্বানং তি।—পরমত্থদীপনীকার ধর্ম্মপাল বিমানবত্থুর টীকায় কোন ও স্থলে ইহার ব্যাখ্যা

করিতেছেন—নিব্বাণইভাবং নিব্বানং অর্থাৎ নিস্তৃষ্ণাভাবই নির্ব্বাণ। কেহ কেহ বলেন নির্ব্বাণ অগ্নির নির্ব্বাপণ; আত্মাই সেই অগ্নি—এই মত একবারে ভ্রান্ত। কি সেই অগ্নি?—রাগ, দোস (দ্বেষ), মোহ—তৃষ্ণারই বিকার। Rhys Davids বলিতেছেন—(Hirbert lectures 1887 V. 100)—"That Arhatship is called Nibbana or Nirvana, a word which means the going out, the becoming extinct, and has been therefore by writer ignorant of the first principlys of Buddism, been supposed to mean the extinction of the soul! It is the going out of craving (তণ্হা) and the three fires just referred to (Viz. The inward force of lust, hatred and dilusion)."

রীস্ ডেভিডস মন্দ বলেন নাই—কেননা অনেকেই এই নির্ব্বাণের সহিত বেদান্তের তুরীয় অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াছেন—বোধহয় দুই অবস্থা একই ধরিয়াছেন। আমি বেদান্তীও নহি, বৌদ্ধও নহি, কাহারও সাধন জানি না—দুই অবস্থা এক কিনা বলিতেও পারি না। যাহা হউক যাহা পুঁথিতে আছে তাহাই নিবেদন করিতেছি—

কঠোপনিষদে (৩.৫ বল্ল) আছে—

তদেতদিতি মন্যন্তে হনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি নচন্দ্র তারকম্নেমা বিদ্যুতো ভাতি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

অর্থাৎ—সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি, কিছুই জ্বলে না। তাঁহার ভাসা আলো সকলই উদ্ভাসিত হয়।

পালিপুস্তক 'উদানে' এইরূপ একটি শ্লোক আছে—

"যত্থ আপো চ পঠবী, তেজো বায়ো ন গাধতি
ন তথ সুক্কা জোতন্তি, আদিচ্চো নপ্পকাসতি
ন তত্থ চন্দিমা ভাতি, তমো তথ ন বিজ্জতি।"

অর্থাৎ—সেখানে জল, পৃথিবী তেজ বায়ু প্রবেশ করে না; শুক্র বস্তুও তাহা নাই, আদিত্য প্রকাশিত হন না, চন্দ্রমা উদিত হন না, অন্ধকার নাই।

বুদ্ধদেব ঠিক নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না, তবুও তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদী নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন কপিল এবং তাঁহার বাদকে সাংখ্যের মায়াবাদ ধরিয়া লইয়া প্রমাণ দিয়াছেন যে বুদ্ধ কপিল-বস্তুতে জন্মিয়াছেন ও তাঁহার মাতা মায়াদেবী ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর প্রমাণ আর কি আছে? (এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মহাযান তন্ত্রের কথা প্রসঙ্গে বলিবার ইচ্ছা ছিল।) অনেকে চার্ব্বাক মতের সহিত বৌদ্ধ মতের সাদৃশ্য দেখেন। এক সময়ে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ জৈন মত ও বৌদ্ধ মতের ভিতর পার্থক্য দেখিতে পাইতেন না। মোসাহেবের আলুর মত বেদান্তের ঝোলে, সাংখ্যের ঝালে, লোকায়তবাদের অম্বলে ও জৈন মতের চচ্চড়িতে বৌদ্ধ মত দিব্য চলিত!

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ দেবতা মানিতেন না। এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় যথা আজীবকগণের—কঠোর তপশ্চর্য্যায় বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'নঙ্গুট্ঠ জাতকে'র কথা বলিব। 'বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কহিলেন—বৎস তিনটা বেদ (ত্রয়ী) অধ্যয়ন করিয়া, তোমার জন্মের সময় যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল সেই অগ্নি দেবতার পরিচর্য্যা কর; তাহা হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। বোধিসত্ত্ব অগ্নি লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে দানে একটা গরু পাইলেন। তখন তাহাকে অগ্নি দেবতার নিকটে বলি দিবার সঙ্কল্প করিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল—লবণ তো নাই, বিনা লবণে অগ্নি গৌ মাংস ভক্ষণ করিবেন কিরূপে? অতএব গরুটাকে বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া লবণের সন্ধানে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। এদিকে এক দল দস্যু সেই বনে প্রবেশ করিয়া বেওয়ারিশ গরুটাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল—খালি লাঙ্গুল, চর্ম্ম ও অস্থি পড়িয়া রহিল। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়া সেই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন—"যে দেবতা নিজের জিনিষ সামলাইতে পারে না, সে আমাকে রক্ষা করিবে কি করিয়া? অতএব দেবতা, দস্যুরা যখন মাংসটা খাইয়াই গিয়াছে, তখন লেজ ও চামড়া পাইয়াই তুমি তুষ্টিবৃত্তি কর। যে হীন

জ্বালবেন এই লণ্ড ভণ্ড লাঙ্গুলটা।" পরে জল দিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মজ্ঝিমনিকায়ে তাপিক অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের কঠোর তপশ্চর্য্যার এক তালিকা দেওয়া হইয়াছে—কেহ বা গোড়ালীর উপর কষ্টে বসিয়া আছে, কেহ বাদুড়ের মত বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত হইয়া আছে, কেহ বা কণ্টক শয্যায় শায়িত, কেহ বা পঞ্চ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছে, কেহ বা জলে দেহ মগ্ন করিয়া বসিয়া আছে। বুদ্ধদেব এই সকলের বিরোধী ছিলেন।

বুদ্ধদেব বেদ স্বীকার করিতেন না। দীঘনিকায়ান্তর্গত তেবিজ্জ সুত্তে বেদবিদ্যার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বাসেট্ঠ নামক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারই মুখ হইতে গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—"তাহা হইলে সাতপুরুষের মধ্যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণদের একজন ও ব্রহ্মকে চাক্ষুষ দেখে নাই—যে ঋষিদের বচন এই ব্রাহ্মণ গণ আওড়াইতেছেন তাঁহাদের কেহই ব্রহ্মাকে জানেন নাই; দেখেন নাই; দেখিবার ভাণ পর্য্যন্ত করেন নাই—ব্রহ্মা কোথায়, ব্রহ্মা কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন। সারি সারি অন্ধ ব্যক্তিগণ না দেখিয়া যেমন গল্প করে এও যে তাই হইতেছে!"......"আচ্ছা ধর এই রাপ্তী নদীতে বান আসিল। এখন যদি কোন লোক তাহার অপর তীরে কার্য্য আছে সে যদি অপর তীরকে সম্বোধন করিয়া বলে—হে অপর তীর তুমি একবার এ তীরে এস এবং সে অপর তীরের স্তব, প্রশংসা করিয়া এদিকে আসিতে প্রার্থনা করে তবে তাহা আসিবে?"

"কখনই না।"

"সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত গুণ বিগর্হিত হইয়া অবিরত ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, যমকে নিরন্তর আহ্বান করে, তবে দেহান্তে কি তাহারা ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবে?" পরে তিনি প্রতিপন্ন করিবেন—যে এই ত্রয়ীর বিদ্যা জলশূন্য মরুভূমি, পথশূন্য বন-প্রদেশের ন্যায় ধ্বংসের মূল। তাহার পর তাঁহার মতে প্রকৃত বিদ্যা কি ও প্রকৃত ব্রাহ্মণকে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানতঃ নীতিমূলক (Ethical, moral) ছিল। তাহাতে দশশীল রক্ষা করিতে হইত—প্রাণাতিপাত অথবা প্রাণিবধ, অদত্ত দ্রব্যের গ্রহণ (চৌর্য্য—অদিন্নাদান),

অব্রহ্মচর্য্য, মৃষাবাদ, সুরা মৈরেয় প্রভৃতি প্রমাদ স্থান বিকাল ভোজন, নৃত্যগীতবাদ্যাদি, মাল্য, গন্ধ বিলেপন ধারণ মণ্ডনাদি, উচ্চশয়ন মহাশয়ন ও স্বর্ণ এবং রৌপ্য গ্রহণ হইতে বিরত হইবে, নানাবিধ ধ্যান (ঝান) ধারণা, কর্ম্মস্থান, ভাবনা—সাধনের অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহা বিস্তৃত ভাবে বলিবার সময় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের একটা স্থূল আভাস মত দিলাম।

পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা এ প্রবন্ধে বলা অসম্ভব। এই আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধে অনেক কথা যথা,--নীবরণ, সংযোজন, ইদ্ধি, কিলেস, উপাধি ইত্যাদি বলিবার ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সে সব কথা বলিবার উপক্রম করিলে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। অতএব আমার প্রবন্ধ এইখানেই নির্ব্বাণ লাভ করিল

শ্রীকালীপদ মিত্র

বিধবা

এখনো ত' বছর খানেক হয়নি আজো শেষ
তবুও কেন পরতে হলো এমন ধারা বেশ—
সিঁদুর-রেখা পরতে নাহি—শুভ্র ভালে টিপ্,
বাজবে নাকো হাতের চুড়ী জ্বালতে সাঁঝের দীপ।

প্রসাধনে নাই অধিকার—মৌন সাঁঝের বেলা
পল্লীঘাটে আর হবে না হাস্যরবের খেলা,
সসম্ভ্রমে সিক্তবাসে অঙ্গখানি ঢেকে
আস্‌বে নাকো সজল-চরণ-চিহ্ন দুটী এঁকে!

যতন করি' আলতা পরি'—আরত' আঙ্গিনাতে—
নীলাম্বরী বসন পরি' সঙ্গিনীদের সাথে
মিশ্‌তে আমি পারবো নাকো—থাক্‌তে হবে দূরে
বাসনা মোর যতই' কেন থাকনা পরাণ জুড়ে !

আঁচলখানির আড়াল দিয়ে—কতই' ভয়ে ভয়ে,
প্রদীপ রেখে—কি জানি কোন প্রাণের কথা কয়ে—
শুভ্র ছোট আঁচলখানি যত্নে টানি গলে
প্রণাম করা হবে না মোর আর তুলসি তলে।

যেথায় শুভ—চিহ্ন সেথা থাক্‌বে নাকো মোর
আমার দেখি চখাচখির বন্ধ হবে দোর,
আমার পরশ লাগ্‌বে নাকো কোনই' শুভ কাজে
আমার আঁচল-হাওয়া সেথা বাজের মত বাজে।

কাহার বুকে দিয়েছিলাম কঠিন মনস্তাপ
আজকে তাহার পেতে হলো রুদ্র অভিশাপ—
বেঁচে আমি এমনি ক'রে মরবো চিরদিন,
ম'রে বাঁচা হবে না মোর—এমনি ভাগ্যহীন।

কে তুমি গো করলে আমায় অমঙ্গলের রাণী
কিসের লাগি আঁধার কোলে আন্‌লে আমায় টানি,
কোন পাপে মোর জীবন প্রাতে নামিয়ে দিলে সাঁঝ
কোমল বুকে এমন করে হান্‌লে নিঠুর বাজ !

কিসের লাগি নিশ্বাসেতে বিষ দিয়েছে মোর
পরশ কেন বজ্রসম লাগ্‌বে সুকঠোর,
দৃষ্টি কেন ভস্মীভূত করবে সবার প্রাণ
বধির কেন করবে সবে আমার প্রাণের গান !
শুধাই' ওগো ! মৌন মধুর মরণ তোমায় আজ
সসীম কবে মিলিয়ে যাবে তোমার অসীম মাঝ—
শুধাই' তোমায় ! না হ'তে মোর একটী বছর শেষ
কে অমারে পরিয়ে দিল এমন ধারা বেশ !

শ্রীরেণুকা দাসী।

নারী-সমস্যা।

—:০:—

বর্ত্তমান যুগে মানুষের মনকে যে সমস্ত সমস্যা সব চেয়ে বেশী ভাবাইয়া তুলিয়াছে তাহার মধ্যে নারী-সমস্যা একটি প্রধান। যে প্রথা যে মতবাদ এতদিন নারী সম্বন্ধে কায়েম হইয়াছিল অনেকেই আজ তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। নারীর কি করণীয়, কতটুকু অধিকার, ইউরোপ ও আমেরিকার বহুদেশেই আজ তাহার একটা বেশ ভাল করিয়া বোঝাপড়া হইতেছে।

সকল দেশের নারী-জীবনের সমস্যা যে একরূপ তাহা নয়—অন্ততঃ সকল দেশে তাহা সমান বাস্তব হইয়া উঠে নাই। সমস্যা বাস্তব না হইয়া উঠিলে তাহা সমস্যাই নয়—পুথির সমস্যা হইতে পারে, জীবনের সমস্যা নয়। তাই ইউরোপ ও আমেরিকায় সেখানকার আচার ও প্রথার জন্য নারী-জীবনে যে অভাব ও অভিযোগের সৃষ্টি হইয়াছে আমাদের দেশে তাহা অনেক সময়েই কল্পনারও অতীত।

প্রকৃত পক্ষে নারী-সমস্যা বলিতে বাস্তবিক যাহা বুঝায় তাহা ইউরোপ ও আমেরিকাতেই হইয়াছে, আমাদের দেশে তাহা সবে আসিতেছে মাত্র—আসিলেও তাহা দুই এক জনের ব্যক্তিগত জীবনে আসিতে পারে, জাতীয় জীবনে বাস্তব হইয়া উঠে নাই।

সকল দেশেই অল্পবিস্তর নারীকে ভার বা দায় বলিয়াই মনে করা হয়। 'ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' এ কথাটা যে শুধু আমাদের দেশের লোকেই বলে তা নয়, ইউরোপ ও আমেরিকায়, মুখে প্রকাশ না করিলেও লোকের অন্তরের কথাটা তাই। পুরুষ আহরণ করিবে, নারী তাহাই গ্রহণ করিবে—ইহাই সকল দেশের প্রথা। ইহার মূল কারণ নারীর আর্থিক অধীনতা। এই আর্থিক অধীনতাই নারীকে পরাসক্ত করিয়াছে, পুরুষের মুখাপেক্ষী করিয়া ফেলিয়াছে, তাই আজ নারী দায় বা ভার। ভার বলিয়াই, এই পরাসক্ত প্রকৃতির জন্যই পুরুষের চেয়ে নারীর বহুবিষয়েই গরজ বেশী। নারীর বিবাহের গরজ বেশী, পুরুষের সাহায্য লাভের গরজ বেশী, তাহাদের মনস্তুষ্টির গরজ তার ইয়ত্তাই নাই। কারণ পুরুষের নারী না হইলে চলিতে পারে, নারীর তা চলিবে না। তাঁর আশ্রয়ের জন্য, তাঁর ভরণপোষণের জন্য, সামান্য মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য পুরুষকে তাঁর চাই-ই।

এই পরাসক্ত প্রাকৃতির জন্যই জগতে নারীর আজ এত হীনাবস্থা; তাঁর অধিকার ও দায়িত্বের এত বৈষম্য। নারী সম্বন্ধে যে ধারণা, তাঁর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে তার অনেকটাই নারীর এই পরাসক্ত প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছে।

নারী প্রচেষ্টার একটি মূল কথা হইতেছে এই পরাসক্ত প্রকৃতি অস্বীকার করা। নারীর পরাসক্ত ভাবটা প্রকৃতিগত নয়। নারী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ও বিধি-নিষেধই নারীকে পরাসক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অমুক কাজটা নারীর নিষিদ্ধ, অমুক কাজটা করিলে তাহার কমনীয়তা চলিয়া যাইবে—এরূপ স্তোকবাক্য হইতে বাঁচাইয়া নারীকে আর্থিক স্বাধীনতা দিলেই তাঁর পরাসক্ত প্রকৃতি অপ্রাকৃত হইয়া পড়িবে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বাস্তবিক হইয়াছেও তাই। চিরপ্রচলিত মতবাদগুলির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া নারী আজ এমন কোন কাজ নাই যাহার মধ্যে প্রবেশ না করিতেছে।

আর্থিক স্বাধীনতাই নারী-প্রচেষ্টার শেষ কথা নয়। কিন্তু ইহাতে নারী তাঁর সত্তা নূতন করিয়া অনুভব করিতেছেন। এই অনুভূতির জোরেই আজ ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকেই বলিতেছেন,—নারী সম্বন্ধে যে ধারণা, তাঁহাদের কার্য্যকলাপের সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ প্রচলিত তাহা ভ্রান্ত; এবং এই ভ্রান্ত মত ও ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই নারীকে এতদিন পর্য্যন্ত যে অধিকারে অধিকারী বিবেচনা বা অধিকার বিচ্যুত করা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

তাই নারী-প্রচেষ্টার মূল কথা হইতেছে, বঞ্চিত অধিকার ফিরাইয়া পাওয়া। রাষ্ট্রীয় অধিকার চাই, সকল রকম ব্যবসা ও কাজের দ্বারগুলি উন্মুক্ত চাই, সম্পত্তি সম্ভোগ ও বিবাহ সংক্রান্ত আইনগুলির মধ্যে সাম্য চাই—এক কথায় নর-নারীর সমান অধিকার চাই—ইহাই মুখ্য কথা।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে নারীদের অনেকেই এই অধিকারগুলি চাহিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথেষ্ট ক্লেশ যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। ইহার ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা সকলই সুফল নয়। একে ত নারী-প্রচেষ্টার মূলকথা হইতেছে নষ্ট-অধিকার লাভ; তাহার উপর আবার এই বাধা পাওয়াতে সমস্ত প্রচেষ্টাটির মধ্যে পুরুষের সহিত নারীর এমন একটা রেষারেষী ভাব আনিয়া দিয়াছে যেন ইহা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে জাতিতে লড়াই—অনেকটা শ্রমিক ও ধনিদের লড়াইয়ের মতন।

হইবার কথাও তাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নারী-জগৎ ও পুরুষ-জগৎ আখ্যা দিয়া পরস্পরের কাজের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্য-রেখা টানিয়া যেমন নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইতে পারিয়াছিলেন বর্ত্তমানে আর তা চলে না। স্বাতন্ত্র্য রেখা ঘুচাইয়া দিয়া নারী আজ একই জগতের অধিবাসিনী, একই জগতে আসিয়া পুরুষের সমান অধিকার দাবী করিতেছেন। নারী আজ পুরুষের প্রতিদ্বন্দী; বর্ত্তমানে নারী তাই পুরুষকে দেখিতেছে তার অধিকারের অন্তরায় রূপে, তার ন্যায্য দাবীর বিঘ্ন-স্বরূপে। নারী আপনাকে এখানে নিষ্পেষিত মনে করিতেছে। তাই মনোভাবটাও সেইরূপই কিছু উগ্র হইয়া উঠিতেছে!

যতদিন দাবী ও অধিকারের উপর নির্ভর করিয়াই নারী-সমস্যার সমাধান করিতে যাওয়া হইবে ততদিন এরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। নারী নিষ্পেষিত, নারী অনেক অধিকার হইতে

বঞ্চিত তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহার নিরাকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহাদের এই নিষ্পেষণ ও বঞ্চিত অধিকারের তালিকা প্রকাশেই ত নারী-সমস্যার সমাধান হইবে না। প্রকৃত পক্ষে, নারীর অধিকার ও দাবী নারী-সমস্যার মূল কথা নয়—বর্ত্তমান অপ্রাকৃত সমাজের অন্যায় ও পক্ষপাত ব্যবস্থায় এরূপ দেখাইতেছে মাত্র। তাহা কিন্তু আরও অনেক বড়—তাহা মানব সমস্যা।

কতগুলি মূল ভিত্তিকে আঁকড়াইয়া বর্ত্তমান সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মূল ভিত্তি-গুলির উপর দাঁড়াইয়া সমাজ মানব সম্পর্কের কাঠামোগুলি সৃষ্টি করিয়াছে। আর্থিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক প্রভৃতি মানবের সকল সম্পর্কের বিধিনিষেধই ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে জগতে তাহাদেরই একবার যাচাই করিয়া লইবার আয়োজন চলিতেছে। কারণ মানুষ প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে বর্ত্তমানে আর মনের সঙ্গে সায় দিয়া নিতে পারিতেছে না। তাই আজ মানুষ চাহিতেছে এমন সমাজ গড়িতে, যেখানে ন্যায় ও কল্যাণের সঙ্গে বিধি-ব্যবস্থার মিল হইতে পারে।

শ্রমিক-সমস্যা, নারী-সমস্যা, পরাধীন-জাতির সমস্যা প্রভৃতি যত কিছু সমস্যা আজ মানবকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের মূল কথা একই—এই সামাজিক মূলভিত্তি-গুলিকে একবার পরখ করিয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তোলা।

নারী সমস্যার মূলকথা তাই। নর-নারী সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ চিরপ্রচলিত আছে তাহাকে বর্ত্তমান জগৎ আর চিরন্তন বলিয়া মানিয়া নিতে রাজী নয়। তাই নর ও নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে প্রথা চিরপ্রচলিত, বর্ত্তমানে এই নারী সমস্যায় তাহারই একটা পরখ হইতে বসিয়াছে এবং এই নূতন পরখের উপরেই গড়িয়া উঠিবে নূতন সমাজ, নূতন নূতন প্রথা ও বিধি-নিষেধ লইয়া। নারী-সমস্যার মূল কথাটাই এই—নূতন ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সোণার বাঙলা।

সমাজের দাবী।

সাম্য স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষী আমরা নিজেরাও কথাটা মানি এবং বিরোধী দলকেও বার বার বল্‌তে শুনি যে সমাজ নাকি নারীর কাছ থেকে দাবী করে প্রেম আর পবিত্রতা। তফাৎ এই যে বিরোধী দল বলেন শুধু ঐ দুটাতেই নারীত্ব বজায় থাকে; আর কিছু বেশী থাক্‌লে নারীত্ব হারাবার সম্ভাবনা, আর আমরা ঐ "শুধু" কথাটী উঠিয়ে দিয়ে আরো কিছু সংযোগ করে দি।

নারী দেহ দিয়ে সৃষ্টি কার্য্য চালিয়ে যান, বলেই তাঁর কাছে প্রতিভার দাবী ধরে বিশ্বসমাজ বসে থাকে না, তাঁর কাছ থেকে সব সময়ই চায় আদর্শ জননার ঐ দুইটী বিশেষ গুণ প্রেম আর পবিত্রতা।

নারীর কাছ থেকে সমাজ যে পবিত্রতা দাবী করে তার সঙ্গে কি বহির্জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই? অন্তরের পবিত্রতা ত চাই নিশ্চয়ই কিন্তু শুধু অন্তরের পবিত্রতা নিয়ে বসে থাকলেই কি সমাজের প্রতি সকল কর্ত্তব্য শেষ হ'বে? ইংরাজীতে একটা কথা আছে cleanliness is next to godliness. দেহের পবিত্রতা অন্তরের পবিত্রতা (দেবত্ব)র প্রায় সামিল, দেহের পবিত্রতা শুধু প্রতিদিনের স্নানে হয় না—ঘর দ্বার-ও পরিষ্কার রাখ্‌তে হয়। শুধু নিজের ঘরটী ঝেড়ে মুছে তক্‌তকে করে রাখ্‌লেও হয় না ঘরের আশ পাশও দেখ্‌তে হয়।

পাড়াগাঁয়ের কথা ছেড়েই দিলাম, কালকাতার মত আজব সহরের রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে কত মায়ের বাছার গায়ের উপর কত জননীই না ঘর ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেন—কত শিশুর মল মূত্র জড়িত কাগজ বা ন্যাকড়া ছুঁড়ে দেন। জননী যিনি পবিত্রতার আধার আচার, নিয়ম শৃঙ্খলাকে তিনি এমন করেই তো নিত্য প্রতিদিন অগ্রাহ্য করে চল্‌ছেন। আজ আমার ছেলে পথ চল্‌তে গিয়ে অপরের মায়ের হাতের প্রক্ষিপ্ত স্বাকারজনক আবর্জ্জনায় অভিষিক্ত হয়ে অপবিত্র হয়ে আসে, কাল সেই মায়ের ছেলেই আবার আমারই পানের পিক্‌ আর নাকের সিক্‌নি মেখে ঘরে যায়। এমনি করে পরের ছেলেকে নোংরা করে দিয়ে আমরা জননীত্বের পরকাষ্ঠা দেখাচ্ছি!

আমার ঘরের আঁস্তাকুড় ঝেঁটিয়ে তুলে রাস্তায় ময়লার গামলায় না ফেলে চাকর বা দাসী ফেলে এলো পাশের বাড়ীর দরজার সামনে—আমিতো তাদের কিছুইত বারণ করলাম না। বরং পাশের বাড়ীর চাকর যদি কিছু বলতে এলো তো হাত মুখ নেড়ে দুদশ কথা শুনিয়ে দিলাম এরই নাম হ'ল সুচিতা রক্ষা।

রাশীকৃত আবর্জ্জনা উঠানে পচ্‌ছে কিন্তু রান্নাঘর ধোয়া মোছা গবর লেপা চল্‌ছেই এতেই কি শুচিতা রক্ষা হয়? পচা আবর্জ্জনারাশির কাছে দুর্গন্ধময় স্থানে মাছি ভন্ ভন্ করছে, নিষ্টিবন ইত্যাদি লিপ্ত হয়ে ছেলে মেয়েরা খেলা করছে, চানাচুর বা ঘুঙ্‌নীআলা ডেকে সেই খানেই বসে খাচ্ছে, ছেলেমেয়ের ঘুস ঘুসে জ্বর, সর্দ্দি পেটের অসুখ লেগেই আছে, আমাশা বা Typhoidও হচ্ছে কিন্তু তাতে ত সাত পাঁচীল তোলা পর্দ্দা ঘেরা অন্তঃপুরের জননী দলের সমাজের শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষার কোন বাধা পাচ্ছে না।

আবর্জ্জনা রাখার জন্য না হয় একটা পুরোণো মেটে হাঁড়ীই সরাচাপা দিয়েই রাখ্‌তে বল—কর্ম্মিষ্ঠা তারা ঘর ঝাঁট দিয়ে তরকারী কুটে সেই খানেই গিয়ে সব জঞ্জাল ফেলে আস্‌বে তারপর সুযোগ মত রাস্তার dust bin তাদের পৌঁছে দেওয়াবে।

ট্রেণে যেতে দেখেছি কত বাংলা দেশের অন্তঃপুরে বৌ—ঘরের পাশের পায়খানাতে কোলের বাছাকে নিতে পারেন না শুচিতা নষ্ট হবার ভয়ে কিন্তু বাছাকে যেখানে বসে আছেন সেই খানেই মলমূত্র ত্যাগ করতে বলেন ও করান।

নিজের বসবার জায়গাটাকে পায়খানায় পরিণত করায় শুচিতা নষ্ট হয় না—যেখানটায় ঐ সব কাজকর্ম্ম উচিত সেখানটায় গেলে শুধু যত দোষ।

"বুকভরা মধু, বঙ্গের বধু" বাংলা দেশের মেয়ে আমরা আমাদের যেমন স্নেহ কোমল মায়ের প্রাণ—তেমন নারী আর কোনও জাতের নাই—তাইতেই তো আমরা এমন প্রেমের ব্যবহার করি যে আমরা সন্তানের রোগটা আমার পড়শীর সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়। হায় শুচিতা হায় প্রেম। এমনি করে তোমাদের অপমান প্রতিদিনই হয়ে যায় সে কার দোষে? এও কি বিদেশী শিক্ষার ফল? আজ সমাজ; তাই বসে বসে ভাবী তোমার দাবী আমরা কেমন করে মেটাবো—শুধু সতী স্ত্রী হয়ে না বুদ্ধিজীবি মানুষ হয়ে প্রতিজ্ঞার তুমি দাবী করনা বটে আমাদের কাছে—কিন্তু যে প্রেমের তুমি দাবী কর্‌ছ সে কি বুদ্ধি বিরুপ

সম্পাতে উজ্জ্বল নয়? যে পবিত্রতা তুমি আকাঙ্ক্ষা করছ তাকে কি মনুষ্যোচিত বিচার বিবেচনার দ্বারা বুঝে ভালবেসে গ্রহণ করতে বল না?

বিচার বিবেচনা করবার দাবী আমরা করে বসলাম তোমার কাছে এই বলে যে তা হলেই তোমার দাবী আমরা মিটাতে পারব—তুমি আমাদের সুযোগ দাও।

সোণার বাংলা। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

নারীর স্বাবলম্বন।

সর্ব্বং আত্মবশং সুখং একথা যে নারীর বেলাও প্রযোজ্য এই কথাই আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই, এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যে আমরা কতরূপেই করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় আমরা নারী জাতি স্বাবলম্বনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইব। স্বাবলম্বিনী হইতে পারিলে বিপদে নির্ব্বাক ও পঙ্গু রহিয়া মানুষ হিসাবে মৃত আখ্যায় ভূষিত হইতে হইবে না, আমরা জ্যান্ত হইয়া দেহ ও মনের জোরে লাঞ্ছনা হইতে নিজেদের সম্মান ও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইব। আমাদের মধ্যে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি আত্মনির্ভরশীলা নারীদের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যে যে দেশের পুরুষ তাহার মা বোনের রক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে, সে দেশে এইরূপ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পৌরুষ সম্পন্ন নারীর জন্মগ্রহণ ঘোর সংরক্ষণবাদীদেরও সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না। যদি এরূপ দুর্দ্দশা নাও হইত তথাপি আমাদের নারীকে স্বাবলম্বনের সহায়ে সমস্ত জগতে পরিভ্রমণ করিতে বলিতাম, এখন ত বলিবই।

আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য যেমন দেহের পরিপোষণের আবশ্যক মনের পরিপোষণের নিমিত্ত তেমনই স্বাবলম্বনের আশ্রয় অবলম্বনীয়। এই স্বাবলম্বনের অভাবেই হিন্দু বিধবারা দুমুঠো ভাতের জন্য অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহিয়া থাকে। আজ ছেলেদের কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়াছেন। এই সময় নারীরাও যেন ঐ শিক্ষার সকল রকম সুযোগ ও সুবিধা পায়। সময়ের সদ্ব্যবহারের সুবিধা পাইয়া হিন্দু বিধবারা যদি নিজেদের

ভরণপোষণের উপায় বিধান করিতে পারে, তাহা হইলে মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া সর্ব্ববিধ নির্য্যাতনে নিষ্পন্দ রহিয়া তাহাদের আর আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয় না। বিধবাদের শিক্ষা পাইবার অবসর জোটে, নিজেদের যত্ন ও চেষ্টায় এই অবসর সময়ে তাহাদের স্বতন্ত্র হইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে।

স্বাবলম্বন সধবা বিধবা সকলেরই মেরুদণ্ড হইবে। ইহার বলেই তাহাদের ঋজু হইয়া কর্ম্মজগতে বিচরণ করতঃ স্বহস্তে স্বীয় প্রয়োজনের সংস্থান করিতে হইবে। নিজেদের বিষয় নিজেদেরই ভাবিতে হইবে, পুরুষের উপর বরাত দিলে চলিবে না। এই জন্য নারীর মধ্যে চিন্তা করিবার শক্তির জন্ম দিতে হইবে, তাহাদের ভাবিবার সময় জুটাইয়া লইতে হইবে।

আমরা নারীদের সর্ব্ব বিষয়ে স্বাবলম্বিনী হইতে বলিয়া পুরুষের বিদ্বেষ-পরায়ণা হইতে বলি না, কারণ বিদ্বেষ মাত্রই মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী—আমরা কেবল নারীদের নিজের উপর আস্থা ফিরাইয়া আনিতে এবং দেহ ও মনে তদুপযোগিনী বলিষ্ঠা হইতে বলিতেছি। মতামত দিবার উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। নিজেদের ভালমন্দ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও ভাবিয়া চিন্তিয়া মত প্রকাশ করিবার নির্ভীকতা আনিতে হইবে।

নারীর শিক্ষা কিরূপ হইবে তাহার মীমাংসার জন্য সকল নারীদেরই মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। নারীর উপর চাপান-শিক্ষা চুপটি করিয়া ভালমানুষের মত মানিয়া লইলে চলিবে না। নারীদের শিক্ষা নারীরাই ঠিক করিবে, কারণ তাঁহারা নিজেদের অভাব যতটা বোঝেন পুরুষের তাহা ধারণা করিবারও শক্তি নাই।

দৈনন্দিন সকল বিষয়েই নারীর বিশিষ্ট মত পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। আর এক জনই তাহার জন্য ভাবিবে, আর একজনের মধ্যে অস্তিত্ব বিলীন করিয়াই তাহাকে গড়িয়া উঠিতে হইবে এ আদর্শ আমাদের চিন্তার ও জীবনে কতই না অবসন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে। এই জড়তা ও অবসাদ দূর করিবার নিমিত্ত নারীর মধ্যে স্বাবলম্বনের বীজ উপ্ত করিয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব জাগাইয়া তুলিতে নারীজাতির মহাসাধনা করিতে হইবে।

নিজেদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং দেহ ও মন তদুপযোগী গড়িয়া উঠিলে নানারূপ কৃত্রিম বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে না। কুসংস্কারের

বেড়া জালে অনায়াসেই নিজেদের ধরা দিতে প্রবৃত্তি হইবে না। আদর্শের জন্য প্রাণপাত না করিয়া মানুষের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়াই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সাহস জাগিবে। জীবন-যুদ্ধে নামিয়া নানা দিক হইতেই শক্তি ও সাহস সঞ্চিত হইতে থাকিবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারী-সমাজের সঙ্গে পরিচয় লাভও সহজ হইয়া আসিবে। ভারতের নারী আর চির নাবালিকা না রহিয়া বর্ত্তমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রসর-বাদিনীদের নিকট "সাহস বিস্তৃত বক্ষপট" দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে এবং নারীর বিভিন্নমুখীন উন্নতির সম্পর্কে তাহাদেরও বলিবার অধিকার জন্মিবে।

বিজলী শ্রীঅমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খোকার ঘুমন্ত মুখের হাসি

-ঃ-*-ঃ—

মেঝের উপর ঘুমিয়ে আছে
হেসে আমার খোকা,—
জাগন্ত কি ঘুমন্ত মুখ
লাগ্‌চে বড় ধোঁকা।
হিমপ্রভাতে আকাশ কোলে
বুঝি অরুণ-রশ্মি দোলে,
মরি, অধর রাগে ফুটে যে গো
গোলাপ থোকা থোকা

মেঝের উপর ঘুমিয়ে আছে
হেসে আমার খোকা,
রঙের লীলায় নেতিয়ে পড়ে
নিথর এ কোন্ পোকা!
দেবশিশুরা খেলচে সাথে
হাত এনে ওর কোমল হাতে,
ওর ঠোঁটের ভাষা বল্‌চে যেন—
'একলা ত নয় দোকা'!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

রাজতরঙ্গিনী।

প্রথম তরঙ্গ।

(অনুবাদ)

কাশ্মীর রাজ্য সুউচ্চ শৈল শিখরে পরিবেষ্টিত; উহা মহা পরাক্রান্ত সৈন্য দ্বারাও বিজিত হইবার নহে। কাশ্মীরবাসী, পারলৌকিক ত্রাস ব্যতীত, অন্য ত্রাস কাহাকে বলে, তাহা অবগত নহে। শীত ঋতুতেও তাহারা উষ্ণসলিলা নদী অবগাহনসুখ উপভোগ করে; গ্রীষ্মে, সলিলস্নাত সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া নদীতটবাসীদিগকে সুখ প্রদান করে। কাশ্মীরের নদী সকল সর্ব্বদা স্থির, প্রশান্ত, ভীষণ জলজন্তু তাহাতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কাশ্মীর কাশ্যপ স্থাপিত দেশ, কশ্যপ (সূর্য্যদেব) তাঁহার মহিমা প্রচার করিবার জন্যই যেন

তথায় নাতিউষ্ণ কর বিতরণ করেন। বিশাল বিদ্যা মন্দির, জাফরাণ, বরফ-বারি ও আঙ্গুর ফল, স্বর্গ রাজ্যেও যদিচ দুর্লভ, তথাপি উহা কাশ্মীরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ত্রিজগতের মধ্যে কৈলাস উৎকৃষ্ট স্থান; কৈলাসের মধ্যে হিমালয় উৎকৃষ্টতর, কাশ্মীর আবার হিমালয়ের উৎকৃষ্টতম প্রদেশ।

অতি আদিম কাল হইতে কাশ্মীর রাজ্যে নিম্ন লিখিত দেবমূর্ত্তি ও পুণ্যকীর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয়:—

কাশ্মীরের দারুময় মহাদেবের মূর্ত্তি; বারেক মাত্র মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারিলে অক্ষয় দিব্যলোক লাভ হয়।

কাশ্মীর শৈলে মন্দাকিনী পর্ব্বতগাত্র ধৌত করিয়া সায়ংকালে, প্রবাহিতা হন। পুণ্যাত্মা তাহা প্রত্যক্ষ করেন, পাপীর চক্ষে তাহা পতিত হয় না।

অগ্নির সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ব্রহ্মা স্বয়ং ধরাবক্ষ হইতে উত্থিত হইয়া বনানী সকল ধ্বংস করেন।

দেবীভঙ্গ পর্ব্বতস্থ হ্রদবক্ষে দেবী সাবিত্রী হংসরূপ পরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করেন। গঙ্গাদেবী তথা হইতে প্রবাহিতা হইতেছেন।

নন্দীক্ষেত্রে দেবারাধিত চন্দন চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। নন্দীক্ষেত্রে দুর্গা মূর্ত্তি আজিও বিরাজিত। তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হইলে মানব দিব্য বাক্‌শক্তি ও অনুপম কবিত্ব লাভ করে ও পরকালে স্বর্গ ভোগের অধিকারী হয়।

কাশ্মীর দেবাদিদেব চক্রবৃত্ত, বিজয়েশ, আদি-কেশব ও ঈশানের অধিষ্ঠান স্থান। কাশ্মীর দেবালয়ে পরিপূর্ণ।

কাশ্মীর রাজ্যের রাজকাহিনী কাশ্মীরের তৎকালের গৌরবগাথা বা কলঙ্ক বার্ত্তা যাহাই প্রচার করুক, আমি তাহার যথাযথ সত্য বিবরণ প্রদান করিব। এই গ্রন্থে কাশ্মীরের আদি অবস্থা ও রীতি নীতির বহু তথ্য বিবৃত হইবে; সুধীগণ কি তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন না? অনিত্য মনুষ্য-জীবন-ইতিহাস চিন্তা করিলে রাজ্যের গৌরব আপনি প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। অতএব সুধীগণ, কাশ্মীরের রাজন্যবর্গের এই সুললিত জীবন ইতিহাস শ্রবণ করুন।—

ষড়কল্প হইতে ছয়টী মন্বন্তর ধরিয়া ধরা বারি-নিম্নে নিমজ্জিতা ছিলেন; হিমালয় তন্মধ্যে বিরাজিত ছিলেন। বর্ত্তমান বিবস্বতকল্প উপনীত হইলে মহাপ্রাণ কাশ্যপ স্বর্গ হইতে দেবতাকে আহ্বান করিয়া আবাহন দ্বারা পৃথিবীকে জলোপরি উত্থিত করিলেন—এইরূপে কাশ্মীর রাজ্যের সৃষ্টি হইল। তৎপর নীল, নাগাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার রাজছত্রে নাগচিহ্ন শোভা পাইত। নাগাদিগের বহু সম্প্রদায় কাশ্মীরে বাস করিত। তাহাদিগের ধনরত্নাদি কুবেরের ধনরত্নের তুল্য ছিল। আদি রাজ নীল নাগাগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজপদ লাভ করেন। তাঁহার দেড় হস্ত পরিমিত একটি দণ্ড ছিল। তাঁহার মস্তকোপরি রাজছত্র শোভা পাইত। তিনি একটি 'কুণ্ডে'র অধিকারী ছিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী কালের কাশ্মীরের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। কলিযুগের প্রথমে, প্রথম গোনন্দের রাজ্য কালের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাগণের বিষয় কিছুই অবগত হইবার উপায় নাই। গোনন্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক মহা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন ও পাণ্ডবশত্রু জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। জরাসন্ধ গঙ্গাবিধৌত কাশ্মীরের এই মহাপ্রতাপশালী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী মথুরা আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। গোনন্দ ও জরাসন্ধের যুক্ত সেনাদল মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া যমুনা পুলিনে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ মহা ভীত হইয়াছিল। প্রথমবারে কেশব সৈন্য গোনন্দের পরাক্রমে পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল কিন্তু মহাবল বলরাম উপস্থিত হইয়া পুনঃ সৈন্য সমাবেশ করিলেন; উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল; বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা বহুকাল সংশয়ের বিষয় ছিল! পরিশেষে গোনন্দ বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীরক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যদল জয়শ্রী লাভ করিল।

দামোদর পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু কাশ্মীরের ন্যায় সৌন্দর্য্যময় রাজ্য লাভ করিয়াও তিনি সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার গর্ব্বিত অন্তঃকরণ, পিতৃহন্তার নির্য্যাতনচিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। এই সময়ে গান্ধার রাজ তাঁহার কতিপয় কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার আত্মীয়গণ সহ বিবাহিত করিবার মানসে নিমন্ত্রণ করিলেন। সিন্ধু তীরে স্বয়ম্বর মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল, এতদুপলক্ষে মহা সমারোহের আয়োজন হইল। দামোদর

বহু অশ্বসৈন্য সমভিব্যাহারে উৎসব ব্যর্থ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; শত শত গান্ধার নিহত হইল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে দামোদর জীবন হারাইলেন।

দামোদরের রাণী শ্রীমতী যশোবতী গর্ভবতী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণে ঈর্ষ পরায়ণ মন্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের এ কার্য্যে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ হইতে শাস্ত্রীয়প্রমাণ আবৃত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন কাশ্মীরের কুমারীগণ পার্ব্বতির অংশ; কাশ্মীরের রাজন্যবর্গ মহাদেবের বিভূতি। ঘোর সংসারী ও পাপআদিগের, তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া মহাপাপ অর্জ্জন করা উচিত নহে। মনুষ্য আপনার স্ত্রীর মূল্য অনুধাবন করে না কিন্তু প্রজাগণের উচিত তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে মা ও দেবীর ন্যায় অবলোকন করে।”

যথা সময়ে রাণী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ইনি একটি নির্ব্বাপিত বংশের অবতংস। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বালকের জাতউৎসব সুসম্পন্ন করা হইল ও তিনি রাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন। উপযুক্ত সময়ে বালকের পিতামহের নামানুযায়ী দ্বিতীয় গোনন্দ নামে তিনি অভিহিত হইলেন। বালকের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত হইলেন; একটি তাঁহার মাতা, তিনি বালককে স্তন্য পান করাইতেন, অপর ধাত্রী তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিত। বালক যাহাদিগকে দেখিয়া হাসিত, তাঁহার পিতৃ মন্ত্রীগণ তাহাদিগকে (সৌভাগ্যবান মনে করিয়া) অর্থ দান করিতেন। শিশুর হাসি যে অর্থহীন, তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারিতেন না। মন্ত্রীগণ মধ্যে যদ্যপি কেহ রাজার শিশুসুলভ বাক্যকাকলি বুঝিতে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তিনি লজ্জিত হইতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা শিশুকে তাহার পিতৃ সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতেন—তাঁহার পদদ্বয় পদপদ্মাসনে স্থাপিত হইত; শিরোপরে চামর ব্যজিত হইত। শিশুরাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সমক্ষে প্রকৃতিবর্গের বিচার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইত। এই সময়ে কুরুপাণ্ডবের মহাসমর উপস্থিত হয়। কিন্তু গোনন্দ রাজ অতি শিশু ছিলেন বলিয়া কোন পক্ষই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

গোনন্দ রাজের পর ৩৫ জন রাজার ইতিহাস বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী রাজা লব। লব মহা শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার সৈন্য অসংখ্য;

তিনি তাহাদের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে ; তাঁহার সৈন্যগণের চীৎকার ধ্বনিতে রজনীতে অধিবাসীবর্গের নিদ্রা হইত না, শত্রুগণ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইত। তিনি গোলয়া নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করেন। এই নগরীতে ৮৩ লক্ষ প্রস্তর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে জিদারী প্রদেশস্থ লিভার গ্রামখানি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যান।

তাঁহার পর তদীয় পুত্র কুশেষা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনিও পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। কুশেষা কুরুহর নামক গ্রামখানি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন।

তৎপুত্র খগেন্দ্র অতি সাহসী ও সহিষ্ণু রাজা ছিলেন। নাগাগণ তাঁহার শত্রু। তিনি বহুনাগা বিনষ্ট করেন। তিনি খাগীখুন ও মুশা নগরী স্থাপন করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্র নির্ভীক, অতি পবিত্র স্বভাব ও নম্র নৃপতি। তিনি দারাতের সন্নিকটে সৌরনগরী স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে একটি সুরম্য রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত করান—এই প্রাসাদের নাম 'নরেন্দ্র ভবন।' তিনি অপুত্রক ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর গোধর নামক, অন্য বংশীয় অপর একজন রাজা হন। তিনি হস্তীশালা নামক গ্রামখানি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যান।

তৎপর তাঁহার পুত্র সুবর্ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি দানশীল নৃপতি ছিলেন; তিনি ভিক্ষার্থীদিগকে সুবর্ণ দান করিতেন। করলা প্রদেশে তিনি সুবর্ণমণি নামক খাল খনন করান।

তাঁহার পুত্র দনক প্রজাবর্গের জনক স্বরূপ ছিলেন। তিনি বিহার ও জলধর নির্ম্মাণ করান।

তাঁহার পুত্র শচীনর। শচীনর ক্ষমাশীল ও মহাত্মা নৃপতি। শচীনর সমাঙ্গাসনগর ও রাজগ্রহহর নির্ম্মাণ করান। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

শচীনরের পর মহাত্মা অশোক কাশ্মীরের অধিপতী হন। তিনি শকুনীর প্রপৌত্র ও শচীনরের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র পুত্র। অশোক সত্যবাদী ও নিষ্কলঙ্ক রাজা ছিলেন। তিনি

বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী। তিনি বিতস্তা তীরে (ঝিলম) শুষ্কক্ষেত্রে পর্ব্বতোপরি বহুশতস্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। তিনি ধর্ম্মারণ্যের প্রান্তদেশে এরূপ একটি সুউচ্চ চৈত্ত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন যে উহার মস্তকদেশ দৃষ্ট হইত না। তিনি শ্রীনগরের প্রতিষ্ঠাতা ; শ্রীনগর ৯৬ লক্ষ সুরম্য প্রাসাদে পরিশোভিত ছিল। তিনি শ্রীবিজয়েশের পতনোন্মুখ প্রাচীরপ্রকার নির্ম্মূল করিয়া তৎস্থানে সুদৃঢ় শৈলপ্রাকার নির্ম্মাণ করান ও শ্রীবিজয়েশের মন্দিরের চত্বর মধ্যে আরও দুইটী প্রাসাদ প্রস্তুত করান ইহার একটির নাম অশোক ও অপরটির নাম ঈশ্বর। তাঁহার রাজ্য কালে ম্লেচ্ছগণ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া উৎপাত আরম্ভ করে। কিন্তু তখন তিনি ধন সম্পদে বিতস্পৃহ হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ; ঈশ্বর চিন্তায় তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

অশোকের পুত্র জলক ; জলক বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি শিবের উপাসক ও শিববরে সিদ্ধ ছিলেন। জলক ম্লেচ্ছগণকে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করিয়া পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যাবত্তার বিবরণ শ্রবণ করিয়া দেবতারাও স্তম্ভিত হইতেন। যদ্যপি কোন স্বর্ণগোলক সলিলে নিক্ষিপ্ত হইত তিনি তাহাও শর-বিদ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি সলিলমধ্যে অবস্থান করিবার বিদ্যা (যোগবল) অবগত ছিলেন। তিনি এই বিদ্যাবলে যৌবন সম্পন্না নাগ কন্যাগণের পতি হইয়া ছিলেন। তিনি মহাদেবের ত্রিমূর্ত্তি—বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্রজ্যেষ্ঠের উপাসনা করিতেন। ভিন্ন দেশ-বাসীদিগকে (ম্লেচ্ছগণ) পরাজিত করায় তাঁহার অত্যন্ত সুনাম হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে স্বরাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া একটি স্থানে তিনি তাঁহার কেশ বন্ধন করিয়াছিলেন—অদ্যাপিও এই স্থান 'উজ্জটা ডিম্ব' নামে অভিহিত।

ম্লেচ্ছগণকে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করিয়া তিনি অন্যান্য দেশ জয় করিতে মনোযোগী হইলেন। কান্যকুব্জ জয় করিলেন। কান্যকুব্জ হইতে চতুর্ব্বর্ণের, প্রতি বর্ণের কতকগুলি লোক আনয়ন করিয়া কাশ্মীরে স্থাপন করিলেন। ইহারা সকলেই ধর্ম্মবেত্তা, আইনজ্ঞ ও স্বধর্ম ধর্ম্মপরায়ন ছিলেন। জলকার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কাশ্মীরের অবস্থা হীন ছিল ; শাসন কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন হইত না। তিনি উপযুক্ত শাসন পদ্ধতি প্রচলন করিবার মানসে, সাতটী

নূতন পদের সৃষ্টি করিলেন। এই পদসপ্ত যথাক্রমে, প্রধান বিচারপতি, প্রধান রাজস্ব সচিব, ধন রক্ষক, রাজদূত, প্রধান পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও সেনাপতি নামে অভিহিত হইত। রাজা, দ্বার ও অন্যান্য কতিপয় প্রদেশের শাসন ভার তদীয় রাজ্ঞী ঈশান দেবীর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অষ্টাদশটী উপাসনালয় স্থাপিত হয়। বরভল্ল ও অপর কয়েকটি স্তম্ভ তিনি নির্ম্মাণ করান। রাজা প্রতিদিন নন্দী পুরাণ শ্রাবণ করিতেন। বশোর জনৈক শিষ্য পুরাণ আবৃত্তি করিত। শ্রীনগরের জ্যেষ্ঠ রুদ্রদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত; এতদ্ব্যতীত তিনি সোদর দেবের অর্চ্চনা করিতেন।

কথিত আছে, একদা বিজয়েশ্বরের মন্দিরে গমন কালে, পথি মধ্যে রাজার একটী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়; রমণী তাঁহার নিকট কিছু খাদ্য বাঞ্ছা করিল। তিনি তাহাকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী যে খাদ্য ইচ্ছা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, সহসা রমণী কদাকার রূপ ধারণ করিয়া নরমাংস প্রার্থনা করিল। তাহার এই অস্বাভাবিক ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য রাজা নরহত্যায় অনিচ্ছুক হইয়া, নিজ শরীর হইতে তাহার প্রয়োজনীয় মাংস গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহার সেই বীরোচিত আত্মত্যাগ দেখিয়া রমণী যেন বিচলিতা হইল ও বলিল আপনি দ্বিতীয় বুদ্ধ'—পরের প্রাণের জন্য এত মায়া অন্য কাহারও নাই।' রাজা শিব উপাসক তিনি বুদ্ধের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমাকে দ্বিতীয় বুদ্ধ বলিয়া সম্বোধন করিলে—বুদ্ধ কে ?"

রমণী তাহা বলিতেই আসিয়াছেন; তিনি বক্তার ন্যায় অতি তেজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন। সৌরকরহীন লোকালোক পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে কীর্ত্তিকা জাতির বাস। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে ভজনা করেন। এই জাতি রোষ কাহাকে বলে জানে না—শত্রু মহা অনিষ্ট করিলেও ক্ষোভ করে না, লুণ্ঠনকারীকেও ক্ষমা করে ও তাহাদিগের উপকার করিতে চেষ্টা পায়। তাহারা সকলকে সত্য মাহাত্ম্য শিক্ষা দেয়, জ্ঞানালোক প্রদান করে; পৃথিবী মহা অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে—তাহা বিদূরিত করাই তাঁহাদের কার্য্য। কিন্তু আপনি ইঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন। আমাদিগের এই দেশে একটি মন্দিরের ঢক্কা ধ্বনিতে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। আপনি দুষ্টবুদ্ধি ব্যাক্তিগণের কুপরামর্শে এই মন্দিরটি ধ্বংস করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাধারণ ইহাতে রাগান্বিত হইয়া আপনার বিনাশ করিতে আমাকে

প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু আমাদিগের পুরোহিতপ্রবর সে সংকল্পের অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলিলেন যদি আপনি (রাজা) আমার বাক্য গ্রহণ করিয়া আপনার স্বর্ণ দ্বারা উক্ত মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহা হইলে মন্দির ভগ্ন জনিত পাপ হইতে আপনি মুক্ত হইবেন। হে মহারাজ! সেই জন্যই আমি ছদ্মবেশে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। রাজাকে মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া কীর্ত্তি দেবী স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজাও তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাৎস্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন।

রাজা নন্দীক্ষেত্রে শিব ভূতেশের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইলেন। তাঁহার শেষ জীবন ভগবৎ চিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছিল। কনকবাহিনী নদীতীরে 'চির-মশান' ক্ষেত্র; রাজা এই স্থানে তিন রাত্রব্যাপী পূজা উৎসব করেন। এতৎ উপলক্ষে রাজপরিবারের এক শত নারী জ্যেষ্ঠ-রুদ্র সমক্ষে নৃত্য গীত করিয়াছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিলেন। তিনি ও তাঁহার রাজ্ঞী চির-মশান ক্ষেত্রে জীবনলীলা শেষ করেন।

দ্বিতীয় দামোদর তৎপরে কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অশোক রাজের বংশধর বা অন্য রাজ বংশের তাহা অবগত হওয়া যায় না। দামোদর অতিশয় ধনী ছিলেন। তাঁহার গৌরব গাথা অদ্যাপি গীত হয়। তিনি কাশ্মীরের পার্শ্ববর্ত্তী যক্ষরাজ কুবেরকে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা একটি জলাকীর্ণ প্রান্তরোপরি সেতু নির্ম্মাণ করান। স্বয়ং তথায় একটি নগর প্রতিষ্ঠা করি। দামোদরসূধা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিবর্গের হিতকল্পে একটি অসাধারণ কার্য্য করিয়া যাইবার মানসে তিনি বন্যার গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য জলাভূমির চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ শৈল প্রাকার (বাঁধ) নির্ম্মাণ কার্য্যে যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার সে সংকল্প সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই। একদা রাজা শ্রাদ্ধ করিবার পূর্ব্বে স্নানার্থ নদীতে গমন করিতেছিলেন; কতিপয় ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া নদী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ যোগ প্রভাবে রাজচরণ সমীপে নদী আনয়ন করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, এই যে বিতস্তা।

এখন আমাদিগকে আহারীয় প্রদান করুন।" রাজা ইহাকে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া সন্দেহ করিয়া বলিলেন, 'এক্ষণে আপনারা অন্যত্র গমন করুন; আমি স্নানাদি সমাপন না করিয়া আপনাদের ভোজন করাইতে পারিব না।' ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে 'সর্প হও' বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। রাজা অভিশাপগ্রস্ত হইয়া কাকুতি মিনতি করায় ব্রাহ্মণগণ বলিলেন 'তুমি যদ্যপি দিবামানে পবিত্র রামায়ণের আদি অন্ত শ্রবণ করিতে পার, তবে শাপ মুক্ত হইয়া মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইবে।' অদ্যাপি তাঁহাকে তৃষ্ণার্ত্ত সর্পরূপে দামোদর সুধায় বিচরণ করিতে দেখা যায়! ঋষিগণের অভিসম্পাত দানের শক্তিকে শত ধিক্কার। এরূপ একটি সদাশয় নৃপতি তাঁহাদের অভিশাপে বিনষ্ট হইলেন! শত্রুগণ নির্জ্জিত যশঃ গরীমা কালে হয় ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু হায়! ব্রাহ্মণের অভিশাপে যিনি বিলুপ্ত হইলেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না!

দমোদরের পর, হুষ্ক, যুষ্ক ও কনিষ্ক নামক তিনজন রাজা কাশ্মীরে একত্র রাজত্ব করেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামানুকরণে তিনিটী রাজধানী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত যুষ্করাজ 'জয়স্বামীপুর' নাম্নী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা—তিনি আরও একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করান। রাজাগণ যদিও তুরস্কবংশসম্ভূত ছিলেন, তথাপি তাঁহারা শুষ্কলের নামক সমতল ক্ষেত্রে বহু উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের রাজ্য কালে কাশ্মীরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; বৌদ্ধধর্ম্ম অপ্রতিহত ভাবে তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর লোকধাতুর এই আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত ১৫০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠনাম বৌদ্ধিষ্ঠত নাগার্জ্জুন কাশ্মীরের বনমধ্যে (একাধিক্রমে) ছয় দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন।

তৎপর অভিমন্যু রাজত্ব করেন। শত্রু বলিতে অভিমন্যুর কেহ ছিল না। তিনি কান্তকোঠ নামক গ্রামখানি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন; একটি শিব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেব পীঠোপরি তাঁহার নাম খোদিত করাইয়াছিলেন। তিনি এক নগরী স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুযায়ী তাহার নাম অভিমন্যুপুর রাখিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্য্যপ্রমুখ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হন ও তাঁহার অনুমত্যানুসারে রাজ-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এদিকে নাগার্জ্জুনের অধিনায়কত্বে বৌদ্ধগণ ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে

লাগিলেন। তাঁহারা শৈব মতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাজিত করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, নীল পুরাণোক্ত পূজা পার্ব্বণ, উৎসবাদি দেশ হইতে নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। নাগগণ ইহাদের ব্যবহারে উত্তপ্ত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন; পর্ব্বত শিখর হইতে বরফখণ্ড গড়াইয়া দিয়া বহু বৌদ্ধ ধর্ম্মীকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ও অসীম উদ্যমের সহিত পুরাণোক্ত উৎসবাদি বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজা অশান্তিময় যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে দূরে থাকিবার মানসে দর্ভবিসারে গমন করিলেন। অবশেষে কাশ্যপ বংশ সম্ভূত পুণ্যশ্লোক চন্দ্রদেব মহাদেবের আরাধনায় (মহাদেবের বরে) সিদ্ধ হইয়া অশান্তির শেষ করিলেন। তিনি বরফ ক্ষেপণ বন্ধ করিয়া দিলেন; নীল পুরাণ উক্ত পূজা আদি পুন প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পুণ্যাত্মা পূর্ব্বেও একবার যক্ষগণকে হত্যার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় গোনন্দ তাঁহার পর রাজা হইলেন। গোনন্দ সিংহাসনারূঢ় হইয়া নীল পুরাণ ব্যবস্থিত উৎসবাদির বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করিয়া নাগ জাতিকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং দুর্ম্মতি বৌদ্ধগণ যাহাতে নির্জ্জিত না হয় তাহারও ব্যবস্থা করা হইল। তিনি অতি সদাশয় ও প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন; তিনি কাশ্মীর রাজ্যে নবজীবন দান করিয়াছিলেন। সূর্য বংশের রামচন্দ্রের ন্যায় তিনি তাঁহার বংশের প্রধান নরপতি। প্রকৃতিবর্গের পুণ্যফলে সদাশয় নৃপতিগণ অবতীর্ণ হন; তাহাদের সৌভাগ্য বলে রাজ্যের পরহস্তগত অংশ সকল পুন অধিকৃত হয়। যে রাজা প্রজাপীড়ন করেন তিনি রাজ্যের ধ্বংশের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; যিনি প্রজাপালন করেন তাঁহার উন্নতির অবধি থাকে না। এই রাজার ইতিহাস পাঠ করিলে সুধীগণ ভবিষ্যত রাজন্যবর্গের উন্নতি অবনতি স্থির করিতে পারিবেন। সুযশা গোনন্দ ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

ক্রমশঃ—

দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা।

স্বাস্থ্য।

আজকাল এই নব জাগরণের যুগে আমরা অনেকেই দেশের কথা ভাব্‌ছি, কিন্তু আমাদের এই ভাবাটা, আমাদের চিন্তা কোন পথে চলেছে তা' সুস্পষ্ট হয়' উঠ্‌ছে না। ভাববার নেশা আমাদের চেপে ধরেছে সন্দেহ নাই কিন্তু অন্যান্য সকল নেশারই মত এ নেশাও আমাদের চোখ খুলে দিচ্ছে না, বরং মুদিয়ে রাখতেই চেষ্টা করছে। দেশব্যাপী নানা আন্দোলনের ফলে প্রাণে আমাদের টনক্ লেগেছে কিন্তু সে আঘাত এখনও আমাদের মাথায় গিয়ে পৌঁছায় নাই তাই কথার বোঝা বাড়ছে—কাজ কিছুই হচ্ছে না। দেশের সকল অবস্থা শান্ত মনে বিচার করে ব্যবস্থা কি হতে পারে—তারই একটা সুসমঞ্জস ও সঙ্গত চেষ্টা দেশের লোকের মাঝে এখনও দেখা দেয় নাই।

জীবনের সব চাইতে বড় প্রশ্ন বা সমস্যা "বেঁচে থাকা"—"আত্মরক্ষা।" এ সমস্যা যে কত বড় ইতিহাস খুঁজলেই তার উপলব্ধি হয়। কালের গতিতে জগতের কত জাতি যে মরে গেছে—তার সংখ্যা নাই—কেন মরল এ প্রশ্নের উত্তরে সে একই কথা,—বেঁচে থাকবার মত ক্ষমতা তাদের ছিল না, আত্মরক্ষার শক্তি তাদের লোপ পেয়েছিল। দেশের দিকে স্থির মনে তাকালেই আমাদের অবস্থাটাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিছুদিন পরে আমরাও—এ বাঙ্গালী জাতিটাও যে লুপ্ত জাতির ইতিহাসের একটা অধ্যায় অধিকার করে বসব—আর সে দিনটাও যে খুব বেশী দূরে নয় দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এ কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। আমাদের প্রাণের গতি মুমূর্ষের নাড়ীর স্পন্দনের মত ধীরে ধীরে চলেছে।

জনসম্পদই জাতির প্রধান সম্পদ। আমরা ক্রমশঃই এই জনসম্পদেই হীন হয়ে পড়েছি। বছরের পর বছর যাচ্ছে, মৃত্যু তার বিষাণ বাজিয়ে কত জীবন ওপারে নিয়ে যাচ্ছে তার সংখ্যা কে করে। যে শিশু সন্তানের জন্মে বাঙ্গালীর দুঃখ দৈন্যগ্রস্ত আঁধার কুটীরে হাসির উজ্জ্বল

আলোক ফুটে উঠত সে শিশু সন্তান আজ ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল তুলে, শ্মশানের পার্শ্বে শয্যা পেতে নিচ্ছে—এ কি কম অভিশাপের কথা। যে দেশে জন্মের হারের চাইতে মৃত্যুর হার বেড়ে চলে, তার যে কাল শেষ হয়ে এসেছে এ কথা বোধহয় কেহই অস্বীকার করবেন না। গত কুড়ি বৎসরের হিসাব খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে মৃত্যু সংখ্যা হতে জন্ম সংখ্যা যতটা অধিক ছিল বৎসর বৎসর সেই আধিক্যের হার ক্রমশঃই কমে আসছে—আমরা কোন মনগড়া তালিকা প্রস্তুত করে' এটা প্রমাণ করব না—আমাদের সরকার বাহাদুরের রিপোর্টই আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করবে।

প্রথমতঃ আমরা প্রতি দশবৎসরের হিসাব দেব ১৯০১ হ'তে ১৯১১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে এ দেশে জন্ম হয়েছিল ১৫৭৯৭৩৪৪ এবং মৃত্যু হয়েছিল ৩৭১২৮২৯৬। মৃত্যু হতে জন্ম সংখ্যা ২০৬৯০৪৮ এত বেশী এ হিসাবে উক্ত দশ বৎসরে আমাদের বাংলাদেশে মোট ২০৬৯ ৪৮ এত লোকসংখ্যা অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৫৬৭ জন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার পরবর্ত্তী দশবৎসরে (১৯১১—১৯২১ পর্য্যন্ত), সরকারী রিপোর্ট হতে জানা যায় যে জন্মসংখ্যা ১০৮৬০২৫৭ ও মৃত্যুসংখ্যা ১৪০০১৬৭৭। জন্মসংখ্যা হতে মৃত্যুসংখ্যা বাদ দিলে দেখা যায় যে বিগত দশবৎসরে—৮৫৮৫৮০ জন মাত্র আমাদের জনসংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছি এ হিসাবে প্রতিদিনের বাড়তি সংখ্যা ২৩৫ দাঁড়ায়। উপরের—অঙ্ক গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ও তুলনা করলেই জাতির অবস্থা কোন পথে চলেছে, উন্নতির না ধ্বংশের পথে তা' সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ দেখতে পাওয়া যায় যে জাতির-উৎপাদিকা-শক্তি কমে আসছে অথবা—মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ—দৈনিক হিসাব অনুসারে প্রথম দশ বৎসরে যত জন করে প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল—দ্বিতীয় দশবৎসরে তার চাইতে অনেক কমে গেছে, প্রায় ৫ ভাগের ২ ভাগ হয়েছে। এ কি ভয়ের কথা?

তারপর—১৯২০ ও ১৯২১ সালে—বাঙ্গালীর মৃত্যুসংখ্যা ১৪৮১৬১২ ও ১৪০৩০৩০ আর জন্মসংখ্যা ১৩৫৯৯১৩ এবং ১৩০১০০১, দুই বৎসরেই জন্মসংখ্যা হইতে মৃত্যুসংখ্যা বেশী, এত যে—দৈনিক হিসাবে প্রতিদিন ৩০৬ জন করে কমে যাচ্ছে আর কোনও অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা—আমাদের অবস্থার শোচনীয়তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করব না। যারা বোঝবার তাদের পক্ষে ঐ যথেষ্ট। আর যারা না বুঝবার তারা কর্ত্তৃপক্ষের মত উপরের—অঙ্কগুলিকে অবিশ্বাস্য

মনে করতে চেষ্টা করবেন স্বায়ত্ত শাসনের ফলে আমাদের হাতে যে ক্ষমতা এসেছে সে ক্ষমতার ব্যবহার না করে আমরা আজ গেয়ে বেড়াচ্ছি যে উপরের অঙ্কগুলি ভুল, এই ভুলের জন্য—বিশেষ করে দায়ি করছি মিউনিসিপাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির দিক দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তার প্রধান কর্ত্তব্য অবধারণ করেছেন যে Vital statistics মৃত্যুর তালিকা বিশেষ যত্ন সহকারে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

যাক ও সব কথা—এখন প্রশ্ন হল—আমাদের জাতীয় জীবনের এ দুর্দ্দশার কারণ কি? নানা মুনির এ বিষয়ে যে নানা মত হবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। যারা বিদেশীয় সভ্যমত মুগ্ধ হয়ে বিদেশীয় আচার ব্যবহার আহার ও বিহার গ্রহণ করেছেন তারা বলবেন ভাত ছেড়ে বিদেশী রকমের খাদ্য গ্রহণ না করাই আমাদের এ দুর্দ্দশার কারণ। তারা বোধ হয় ভুলে যান—যে পূর্ব্বপুরুষগণ দীর্ঘ জীবন ভোগ করে গেছেন এবং তখন দেশে মৃত্যুর আহ্বানে—এত লোক সাড়া দিত না। আর একদল লোক আছেন যাঁরা বলে থাকেন যে আমাদের সামাজিক কুপ্রথাগুলিই আমাদের জাতীয় জীবনের এ অধঃপতনের কারণ। অতি অল্পবয়সে স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহ, বিধবা বিবাহের অপ্রচলন প্রভৃতি কারণ দেশকে জনসম্পদে হীন করে ফেলছে। স্বীকার করি যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে অনেক বিধবা যাঁরা বন্ধ্যা অবস্থায় কালাতিপাত করছেন তাঁহারাও সন্তান জন্ম দিয়ে দেশের সম্পদের বৃদ্ধি-সাধন করতে পারেন—স্বীকার করি যে বাল্য-বিবাহের কুফলে সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হয় না ও শৈশবেই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়—কিন্তু একটা কথা তবুও মনে জেগে উঠে যে—এ দোষ-গুলি ত আমাদের দেশে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা পূর্ব্বে অনেক বেশী ছিল তবে সে সময়ের বাঙ্গালী জাতি জনসম্পদে এত ধনী হল কি করে পুরুষ ও নারীর উৎপাদিকা শক্তি বেশী ছিল কেন ও শিশুর জীবনী শক্তি বর্ত্তমান শিশুর শক্তি অপেক্ষা বেশী ছিল কেন? এ সকল কথা একটু বিশেষ বিবেচনা করে দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলি ছাড়াও আর একটা জিনিষ আছে যা আমাদের এ দুর্দ্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

সকল কথার মূলের কথা হল খাদ্যাভাব। বাঙ্গালীর ছেলে আজ দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। জীবন রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে জিনিষগুলি আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় একটু মাছ, একটু দুধ তাই আজ বাঙ্গালীর দুর্লভ হয়ে উঠেছে। জীবন যাত্রার

প্রধান উপকরণগুলি বিলাস দ্রব্যের মত দামী ও বহুল ব্যয়সাধ্য হয়েছে। এখন কথা হল, যে তবে কি দেশের উৎপন্ন শস্য আমাদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হবার জন্য তার পরিপোষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ কথার উত্তর দিতে গেলে হৃদয়ে ক্রোধ ও ক্ষোভ উভয়ের যুগপৎ সঞ্চার হয়। আমাদের "সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলা ভূমি তাঁর সন্তানের উদর পূর্ত্তির জন্য এখনও ক্ষেতে ক্ষেতে প্রচুর শস্য জন্মান। দেশে এত শস্য জন্মে যে এক বৎসরের শস্যে ৪।৫ বৎসর অনায়াসে চলে। নির্ব্বোধ আমরা সে শস্য জাহাজে করে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে অনাহারে দিন কাটাই। মাতৃস্নেহ শতধারে উৎসারিত হয়ে দেশকে সিক্ত করছে কিন্তু হতভাগ্য নির্ব্বোধ সন্তান আমরা, মায়ের দান পরকে বিলিয়ে দিয়ে শূণ্যহাতে বসে আছি যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য করেন যাদের এই বিলিয়ে দেবার ব্যবসাতে কিছু স্বার্থ আছে তারা বলবেন যে ব্যবসা বানিজ্য বন্ধ করে রাখলেই কি জাতির কল্যাণ হবে? আমাদের কথা এই যে জাতির প্রয়োজনের জন্য যতটা দরকার ততটা দেশে রেখে উদ্বৃত্তটা দিয়েই ব্যবসা বানিজ্য চালান উচিত। সর্ব্বাগ্রে জীবনরক্ষা তারপর ব্যবসা বানিজ্য। খাদ্যাভাব যে আমাদের কতটা হয়েছে তা আমরা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি কারণ আমরা সকলেই ভুক্তভোগী। প্রতিদিন কে কতটা পুষ্টিকর জিনিষ খেয়ে থাকেন তার হিসাব যদি প্রতিদিন নেন তবে অনেকের হিসাবেই শূন্যের ভাগ বেশী দেখতে পাওয়া যবে।

আমাদের খাদ্যাভাব ঘটেছে কিন্তু জীবন সংগ্রামটা আমাদের ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে চলেছে আমরা আধপেট খেয়ে কিম্বা কতকগুলি অখাদ্য দিয়ে উদর পূর্ত্তি করে আপিসে কার্য্যস্থলে গিয়ে সারাটা দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করি এবং আমাদের পুত্রগণও কোনও প্রকারে নাকে মুখে কয়েকটা ভাতের দানা মুখে ফেলে স্কুলে পড়তে চলে যায় ও ১১টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলগৃহে বন্ধ থাকে। এভাবে পরকালের পথটা আমরা প্রশস্ত করছি। আমরা সকলেই বুঝতে পারছি যেন এই পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনীশক্তি চলে যাচ্ছে কিন্তু তবুও উপায়হীন হয়ে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও—আমাদের সেই আফিস ঘরে ও সেই স্কুল ঢুকতে হচ্ছে আমরা তুলনা করি আমাদের সঙ্গে অপর দেশের লোকের বলে থাকি জার্ম্মাণ ছেলেরা আমাদের ছেলেদের চাইতে অনেক অধিক পরিশ্রম করে—ইংরাজ ছেলেরা কেমন বলিষ্ঠ ও শক্ত। তাদের অনুকরণ করবার জন্য আমরা অনেকেই ছেলেদের উপদেশ দিয়া থাকি।

কি দুর্ভাগ্যের কথা—ছেলেদের মুখে একটু আহার দেবার মত শক্তি যাদের নাই তারাই আবার উপদেশ দেয় জার্ম্মাণ ছেলের অনুকরণ করতে। তাই প্রতি বছর বছর দলে দলে ছেলে পাস করে বেরুচ্ছে—লাভ করছে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ—আর হারাচ্ছে চোখ কাণ নাক স্বাস্থ্য। আমরা ছেলেদের অভিভাবক হয়ে শত্রুর মত তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি কালের করাল গহ্বরে—তাই আজ গৃহে গৃহে উৎসাহহীন, বীর্য্যহীন পাসকরা যুবকের দল। দেহ যখন দুর্ব্বল থাকে তখন সে নানা "ব্যাধি মন্দির" হয়ে পড়ে। তাই যখন দেশে কোনও রকম একটা মড়ক উপস্থিত হয় গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠে,—কারও বা দেখতে পাওয়া যায় "উপযুক্ত" ছেলে মরে গেল কোন নারীর "উপযুক্ত স্বামী মরে গেল,—এভাবে দেশব্যাপী শোকের হাহাকার গগন ভেদ করে উত্থিত হয়। তাই আজ মনে হচ্ছে—আমাদের এই শিক্ষার মন্দিরগুলি চূর্ণ হয়ে মিশে যাক, ছেলের দল মুক্ত হয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়ুক এবং মুক্ত আকাশের তলে স্বাধীনভাবে মাটী কেটে চাল ধরে জীবিকা অর্জ্জন করুক।

জীবন আমাদের নূতন করে আরম্ভ করতে হবে—সে নূতন করে আরম্ভ করবে মানে—"Return to Nature."

এখনকার এই সভ্যতার আবরণ সাজ খুলে ফেলে প্রথমতঃ জাতিকে সবল সুদৃঢ় মানব সম্পদ দ্বারা—পূর্ণ করে তুলতে হবে—তারপর যেদিন দেখা যাবে জাতীয় জীবনে জোয়ার এসেছে লক্ষ লক্ষ পূর্ণ স্বাস্থ্য উৎসাহপ্রোজ্জ্বল মুখের দীপ্তিতে বাংলা আলোকিত হয়ে উঠেছে—সেদিন আমরা ভাবব এই সভ্যতার কথা।

খাদ্যের অভাব দূর না করলে এই প্রশ্নের সমাধান হবে না। খাদ্যের অভাবেই এই স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু। এই খাদ্যের অভাবের জন্যই আমরা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বিসূচিকাগ্রস্ত হয়ে মারা যাই। ১৯২১ সনে এক বিসূচিকায় বাংলা দেশে ৮০৫৩৭ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ইনফ্লুয়েঞ্জা এসে সহস্র সহস্র লোক ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা মরকের বছর—৭৫০,০০০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তারপর ম্যালেরিয়া রাক্ষসী কত লোক যে গ্রাস করেছে তাহার সংখ্যাই নাই। ম্যালেরিয়া গরীবের রোগ। যে সংসারের পুরুষ ও নারী আধ পেট খেয়ে খেয়ে বলহীন—হয়ে পড়েছে আমরা দেখতে পাই সে সংসারেই ম্যালেরিয়া রাক্ষসী প্রথম প্রবেশ করে। ধনীদের মধ্যে ম্যালেরিয়া বিশেষ দেখিতে পাওয়া

যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত দেহ সবল থাকে ততদিন ম্যালেরিয়া বীজ আমাদের দেহে প্রবেশ করলেও—সহজে আমাদের কবলিত করতে পারে না। প্রায় সকল রোগের মূলেই খাদ্যাভাব।

তারপর শিশুর মৃত্যু—সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী জানতে পাই বাংলার কোন কোন স্থানে শতকরা ৭০ জন শিশুর মৃত্যু হয়ে থাকে। কি ভয়ানক কথা!—সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় মনে করেন যে—এই শিশুর অকাল মৃত্যুর জন্য প্রধানতঃ দায়ী—অজ্ঞ গ্রাম্য ধাইগুলি। ডিরেক্টর মহোদয় তাঁর রিপোর্টের অপর এক স্থানে স্বীকার করেছেন যে শতকরা পঞ্চাশটী শিশুর মৃত্যুর কারণ তাহাদের জন্মগত দুর্ব্বলতা (Dibility at birth) এখন প্রশ্ন হল এই জন্মগত দুর্ব্বলতার মূলে কি?—একই উত্তর খাদ্যাভাব, দেশের দারিদ্র্য। দেশের পুরুষ যারা তারাই এক প্রকারে উপবাসী, অপুষ্ট দেহ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ক্ষয়কারী রোগের দাস—তাদের সন্তান কি করে স্বাস্থ্যবান সবল হতে পারে? খাদ্যাভাবে মায়ের বুকের অমৃত ধারা শুষ্ক,—মাও উপবাসী ও রোগে কাতর—এ অবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্য কি হতে পারে? প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ শিশু না খেয়ে মারা যাচ্ছে—দেশের কি দুর্ভাগ্য।

বাঙ্গালী যে আজ মরতে বসেছে সে বিষয় বুঝতে আজ আর কারও বাকী নেই, অন্য কোন দেশ হলে সকল দেশ জুড়ে এমন একটা বিকট চীৎকার হাহাকার উঠত যাতে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীর হৃৎকম্প উপস্থিত হত—কিন্তু এদেশের অবস্থা কে দেখেবে বা কে শুনবে। জন্মের হার কমে গেছে মৃত্যুর হার বেড়েছে, মরক এসে আপনার অধিকার স্থাপন করছে—শিশুর দল মাতৃ-অঙ্কে শুয়ে না খেতে পেয়ে মরছে আর চাই কি—একটা দেশের মরবার উৎসবে আর কি আয়োজন চাই।

তারপর—আর একটা ব্যাপার—সে দিকে বোধ হয় এখনও—কারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সকল দেশেরই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের লোকগুলিই (Middle class) জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। আজ আমাদের সেই মধ্যবিত্তগুলি নষ্ট হতে বসেছে। দেশের দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব ভীষণ জীবন-সংগ্রামে ভীত হয়ে অনেক মধ্যবিত্ত অবস্থার যুবক বিবাহ করতে রাজী হচ্ছেন না। সকল সহর খুঁজে বেড়ালে এমন অনেক যুবক সকলেরই চক্ষে পড়বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে মণ্ডিত হয়েও তারা আজ যে উপার্জ্জন করছেন তাতে কষ্টে

বর্ত্তমান অবস্থায় সংসার প্রতিপালন অতি কঠিন ব্যাপার। অনেকে আছেন কোনও প্রকার কাজের যোগাড় না হওয়ায়—হতাশ হৃদয়ে বেকার অবস্থায় কাল কাটাচ্ছেন।

এই প্রকার বুদ্ধিমান যুবকগণ—তদি বিবাহ না করেন তবে দেশ যে হলেও-হতে-পারত-কত বুদ্ধিমান সুসন্তান হতে বঞ্চিত হল তা হিসাব করে দেখলে দুঃখ আমাদের না এসে পারে না। আমি বলছি না তারা উপার্জ্জন কিছু না করেই'—বিবাহ করে বসুক কিন্তু সমস্ত জীবনের জন্য সঙ্গে ও কতগুলি সন্তান একত্র হয়ে দুঃখের ফলে অভাবের সঙ্গে জীবন যাপন করুন—আমি শুধু দেশের অবস্থাটা ধরে দেখাচ্ছি। এ সকল যুবক বিবাহ না করাতে দেশ কতটা জনসম্পদ হতে বঞ্চিত হল তাই—দেখানই আমার উদ্দেশ্য—। এ অবস্থাটা যদি আরও—ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় তবে বাঙ্গালিকে মৃত্যুমুখে নিয়ে যেতে এও—যে কিছু সাহায্য করবে সে নিশ্চিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—যারা দারিদ্র্যজ্ঞানবর্জ্জিত, শিক্ষার কোনও বালাই যাদের নাই তারা কিন্তু সুস্থ মনে বিবাহ করছে ও প্রভূত সন্তান জন্ম দিয়ে অকাল মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।—আর একটা বিষয় যার জন্য মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের জন্মের হার কমে আসবে সে হল খুব বেশী বয়সে বিবাহ। অনেক স্থলেই আজ কাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ছেলেরা উপার্জ্জনের পথে আসতে প্রায় ২৮।৩০ বৎসর পার হয়ে যায়—আর মেয়েদের বিবাহের বয়সও প্রায় ১৮।২০ হয়ে পড়ছে। দেশের অবস্থা অনুসারে আমার মনে হয় কিছুদিন পরে মেয়েদের বিবাহের বয়স ২০।২৫ দাঁড়াবে। ছেলের বয়স ৩০ দাঁড়ালে ও মেয়ের—বয়স ২০ পার হলে তাদের উৎপাদিকা শক্তি অনেকটা কমে যাবে। অনেকে বোধ হয় বলবেন যে বিলাতে ও তাই হচ্ছে তবে তাদের কেন কমছে না তার উত্তরে বলতে হবে যে, আমাদের সঙ্গে ও দেশের অনেক তফাৎ যেমন আমাদের দেশের মেয়েরা ১২।১৫ মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয় কিন্তু ও দেশের মেয়েরা ১৮ হতে ২২ মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে থাকে—এখানেই একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ও বিষয়ে আমাদের অবস্থার সঙ্গে তাদের অবস্থার সামঞ্জস্য না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় বলে হবে না।

সোনার বাংলা যে আজ—শ্মশান হতে চলেছে তারই একটা ছবি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা পেয়েছি।—ইতিপূর্ব্বে অনেকেই এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে

প্রয়াস পেয়েছেন আমিও তাদের সুরে গলা মিলিয়ে দুঃখের গান আজ আপনাদের শোনলেম। এখনও আমাদের রক্ষা পাবার সময় আছে এবং আত্মরক্ষার জন্য আমাদের আজ জীবন সংগ্রামে নামতে হবে। দেশের যুবক মহলে বসে বসে আলোচনা করে উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে। উপায় স্থির হলে তারপর—কার্য্যে অবতীর্ণ হতে হবে। জীবনকে দায়িত্বহীন করে—কোনও রকমে কাটিয়ে দেওয়া এক প্রকাণ্ড কাপুরুষতা—আমি আশা করি আমাদের দেশের যুবকের দল এই কাপুরুষতা ত্যাগ করে আজ কর্ম্ম ক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়বে জীবনের সকল প্রকার দায়িত্ব দেশের প্রতি দায়িত্ব, সমাজের প্রতি দায়িত্ব, মানবতার প্রতি কর্ত্তব্য সকল তার ধীর ভাবে গ্রহণ করে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হবে—জীবনের আনন্দগুলি কাপুরুষের মত ত্যাগ করতে কোনই পৌরুষতা নাই, বরং তারই সঙ্গে আছে একটা প্রকাণ্ড অবমাননা আমাদের পুরুষত্বের প্রতি, আমাদের চরিত্রের প্রতি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ জগতের কিছুই সুখসম্পদ স্বাস্থ্যজ্ঞান আত্মা বলহীনের লভ্য নয়—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"।

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

মরণ আড়াল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবশেষে উঠিলাম। যদ্দুর মত চেষ্টা করিয়াই আমার সেই আত্মগোপনের স্থান হইতে নিজকে টানিয়া তুলিতে হইয়াছিল। মনের চাঞ্চল্য শরীরের শক্তিও আমাকে পরিত্যাগ করিতেছিল যেন! অথচ প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল,—এভাবে বসিয়া থাকা ঠিক্ হইতেছে না,—ডাক্তার যদি 'টের' পান কি ভাবিবেন! হায়! তখনও তাবাতা'র হিসাব, আপনার প্রকৃত বর্ণ লুকাইয়া ভালমানুষ সাজিবার মানুষের কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা!

মাতালের মত টলিতে টলিতে আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে কোন ক্রমে ফিরিলাম। এত লুকো-চুরি আর সহ্য হয় না! ঋজুভাবে চলিতে এত বাধা, পদে পদে আত্মপ্রতারণা, পরের চক্ষে ধূলি দিবার ব্যবস্থা,—আর ভাল লাগে না, মনুষ্যের মানুষ হইবার ব্যবস্থা কোথায় এ সংসারে? দশচক্রে ভগবান ভূত যেখানে, সেখানে আবার কলঙ্কীর সু হইবার সাধ! সেই কথাটাই তখন বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে জাগিতেছিল;—বিরক্ত হইও না ভাই! একই কথা, একই ভাব কতবার তোমাদের শুনাইতেছি, শুনাইব—যদি এ অধমের কাহিনী শুনিয়া মর্ম্ম-পীড়িতকে একটু শান্তি দিয়া অনুগৃহীত করিতে চাও—বিরক্ত হইও না। বুঝি,—উন্মত্তের প্রলাপের মতই বকিয়া যাইতেছি। দয়া, দয়া—সহানুভূতিই তোমাদের আমার সম্বল,—আমি যে পারি না,আমার যে বারে বারে মনে জাগে—ঐ একই কথা—অধীনতা অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ কাঁদিয়া বলে,কেন আমার এ দশা—কেন মানুষকে তোমরা জোর করিয়া অমানুষের দলে ঠেলিয়া দিবে! কোন্ অপরাধে আমি বঞ্চিত হইলাম, নিভার আমার মঙ্গল সাধনে? পরেশের হত্যা কোন্ পাপে? নরহত্যার অপরাধী হইলাম আমি! নিভা—প্রিয়তমা—কোথায় আছ তুমি—কেমন ভাবে আছ বা,—জেলের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমেও তোমায় ভুলিতে পারি নাই, রজনীর অন্ধকারেও তুমি তথায় দেখা দিয়াছ! জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পরপারের জীবের মত, তোমার মধুস্মৃতিতে দিন কাটিয়াছে; আজ জেলের বাহিরেও সেই অবস্থা,—অসহ্য! সেই চিন্তাই আকুল করিয়াছে আমাকে,—রাজচন্দ্র আজও জীবিত,—হয় ত আজও সে নিভার পশ্চাতে......!

তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম; সহসা ডাক্তারের স্বরে চমকিয়া উঠিলাম! ডাক্তার বলিলেন—"কি মিষ্টর গুপ্ত,—কথা কি—তোমায় এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে যে, ভাবনার আর কি আছে? ভালয় ভালয় সব মিটে গেছে,—কিসের ভাবনা আর!"

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম—"সকলি আপনার দয়ায়! জীবনটা যে আমার কি তা ত আপনার জান্‌তে বাকী নেই,—নানা কথা আপনি মনে আসে,—আর এমন নিষ্কর্ম্মা-ভাবে বসে বসে—"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন—"ভুলে যাও—ও সব ভুলে যাও, যা হবার হয়ে গেছে—এখন তুমি মনে করতে পার এ তোমার নতুন জন্ম—কাজ করে যাও নতুন উৎসাহে।"

"আমিও ত তাই চাই,—সেই পথই আমায় অনুগ্রহ করে ধরিয়ে দিন ! ওখানে কোন গোল হয় নি ত ?"

"গোল হবার আশঙ্কা ছিল যথেষ্ট ;—নানা কৌশলে সব ঠিক করেছি। সভ্য জগতে জানা থাকলে কোন কাজে বাধা হবার ভয় নেই,—শব পরীক্ষার পূর্ব্বেই কেমিক্যাল সাহায্যে শবটার এমন অবস্থা করে ছিলেম—সাধ্য কি ওদের প্রকৃত বিষয়টার কাছ ঘেঁসে ! মুখের চেহারাটা পর্য্যন্ত বদলে গিয়েছিল !"

আশস্ত হইলাম কিন্তু সেই সঙ্গে না ভাবিয়া পারিলাম না—কি সাংঘাতিক লোক এ ডাক্তার !

ডাক্তার বলিলেন—"অতি গোপনীয় কথা,—তোমায় খুব আত্মীয় মনে করেই বল্‌ছি,—দেখো বিশ্বাসহন্তা হও না যেন,—এই বিশ্বাসের উপরে তোমার আমার আত্মীয়তা, বান্ধবতা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে,—তোমার উন্নতি অবনতি এই বিশ্বাসে,—দেখ আমার ভাবে চল যদি—আমার ছেলের চাইতেও তোমায় সুখী করবো—বিশ্বাস হারালে সমস্তই হারাবে—কি ছিলে সে কথা ভুল না কখনও—বলেছি তোমার এখন নতুন জন্ম—আমার বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখতে পার যদি—কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না !"

বলিলাম—"বার বার কেন ও কথা বল্‌ছেন !"

ডাক্তার বলিলেন—"সাধে কি বলি,—যে অতি গোপনীয় কথা তোমায় বল্‌তে যাচ্ছি—তা হতে তুমি বুঝ্‌তে পারবে কেন আমার এত আশঙ্কা,—লোকের এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় সমস্ত নষ্ট হয় ! মিষ্টর গুপ্ত তোমার আমি আমার সমস্ত দিতে বসেছি পরীক্ষা করব না ? বিশ্বাস,—বিশ্বাস, এক চুলও যেন তার এদিক ওদিক না হয়। আমি নিজকে নিতান্ত অসহায় ভেবেই তোমার আশ্রয় নিচ্ছি মিঃ গুপ্ত !"

মনে একবার দ্বিধা উপস্থিত হইল। ভাবিলাম বলিয়া ফেলি আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, অন্তরের সে ভাব চাপা দিলাম। বলিলাম "আমি যে আপনার আশ্রিত !"

"না—না আশ্রিত নও,—অবলম্বনীয়। মনে বুঝি তোমার দ্বিধা বোধ হচ্ছে আমি যা তোমায় কি সাংঘাতিক কাজ করতে বলি, তেমন কিছু নয়—কেমন ? তবে সংসারে থাকতে হলে, বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করে সুখী হতে হলে, মুনিঋষি হলে ত আর চলে না, ক্ষেত্র বুঝে

কাজ করতে হয়। সেটা সংসারে থাকতে হলে করতেই হবে, এতে আর দ্বিধা কি !"

আমার মন ভাবের সামান্য বাহ্যিক প্রকাশও তীক্ষ্ণদর্শী বৃদ্ধের চক্ষু এড়ায় নাই,—সাবধান হইলাম। বলিলাম,—"দ্বিধা নয়, ভয় হয় পাছে আমার নির্বুদ্ধিতায় আপনার কোন কাজ পণ্ড করে ফেলি।"

"সে ভয় নেই, পূর্ব্বেই বলেছি তুমি পারবে ; আমি ত সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গেই আছি ! শোন তবে—দেখ্‌লেই ত ছোকরাটা কি ভাবে অকালে প্রাণ দিলে—তোমায় যতটুকু বলেছি তার চাইতে আমায় এ মৃত্যুতে আরও বিপদগ্রস্ত করেছে। অলকা বলেছি ত—আমার এক স্বর্গীয় বন্ধুর কন্যা—তাঁর অগাধ নগদ অর্থ, ব্যাঙ্কে সব জমা আছে,—উইল করে গেছেন তিনি—কেমন খেয়ালী লোক ছিলেন, এই ছেলেটার দিকে তাঁর ছিল বড় ঝোঁক—অলকাকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করে বসেছিলেন,—ওর পড়াশুনা যা' সেই হিসেবেই তিনি করিয়াছিলেন ; উইলে ত সেটা লিখে গেছেন,—এখন বুঝ্‌তে পারছ আমার বিপদ ! আমি এখন প্রকাশও করতে পারি না ওর এ আত্মহত্যার কথা অথচ উইলটার সর্ত্ত অনুসারে তা না করলেও নয়,—ওর মৃত্যু প্রমাণিত না হলে অলকাকে অন্যত্র বিয়ে দিবার উপায় নেই। যদিও উইলখানা আজও অলকার নিকট গোপন আছে কিন্তু একদিন ত তা প্রকাশ করতে হবে,—এখন কি করি সেই মহা সমস্যা !'

আমি বলিলাম—"সত্যিই ! ....উইলখানা ভাল করে না দেখলে কিছু বা বলা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন—"That's business like,—কথার মত কথা—কিন্তু অতি গোপনে অন্য কেউ এর একটু গন্ধ পেলেই সর্ব্বনাশ ! মেয়েটাকে এমনি বশে আনা দায় ! সেও আবার অসুখে পড়েছে—নানা কারণে কাজটার কিনারা হওয়া চাই তাড়াতাড়ি ! কিন্তু পর্ব্বতের মত বাধা সামনে !. মেয়েটাকে কিছুতেই জানতে দিতে পারা যায় না অপমৃত্যুর কথা—তা হলে একদম বিগড়ে যাবে !"

তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না ; অতুল অলকার সেই একদিনের কথাবার্ত্তাতেই আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, তাহাদের দুটিতে কি ভাব ছিল। ডাক্তারের কথায় তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল,—অতুলকে সরাইবার জন্য তাঁর কেন মত,—উইলখানাই যত অনর্থের মূল। ডাক্তারের বিশেষ কোন স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় ঐ উইল, অতুলও ছিল তাহাই ! আরও কি

সন্দেহ থাকে ? এ অপকর্ম্ম ডাক্তারেরই। নিশ্চয়,—নিশ্চয়—অতিনিশ্চয় ডাক্তারই অতুলকে হত্যা করিয়াছে! অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! এই লোকের সহিত করিতে হইবে আমার কারবার,—চলা ফেরা! সে আর বেশী কি? দেশের কল্যাণে আমার এমন সৎসঙ্গ অনেক হইয়াছে! আর কিছু না হ'ক,—চোর ডাকাত নরহন্তার সংসর্গে আমার আর ভয় নাই, লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতাও কম হয় নাই; ডাক্তার আমাকে যতই নাবালক মনে করুন,—আমার সাহস আছে—আমি তাঁর কুচক্র ভেদে অযোগ্য হইব না। কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার। সেই নীতিই অবলম্বন করিলাম। ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম "ওঁদের দুটিতে খুব ভাব ছিল বুঝি! আহা! বেচারী কি জন্যে তবে প্রাণ দিলে! বিয়েতে ত কোন বাধা ছিল না!"............

ডাক্তার বলিলেন—"হাজার হ'ক তোমরা যুবক,—যুবকের মত তোমার ভাবনা,—ভাবটাব ও-সব তোমাদেরই ভাবা সাজে। বল ত,—কি করে আমি, আগে পিছু না দেখে, না বুঝে ওকে মেয়ে দেই! খেয়ালী ছোকরা অত টাকা হাতে পেলে কি কথা ছিল, একেবারে জাহান্নামে যেত! আমি সেটা সহজে হতে দেই নি, সেইটাই আমার মহা অপরাধ,—অভিমানে প্রাণ দেওয়া হ'ল!"

বলিলাম—"গেছে, আপদ চুকে গেছে, আপনা হতে সরে গেছে,—বেশ হয়েছে! আপনি এখন ইচ্ছামত দেখে শুনে মেয়েটাকে সৎপাত্রে দিতে পারবেন,—অমঙ্গলে মঙ্গলই হয়েছে! শুধু উইলখানা, তাও ত বলছিলেন তিনি উইলের কথা জানেন না,—তবে আর··· "

ডাক্তার বলিলেন—"তবে যে আর কি সেটা তোমার এখনও বুঝতে দেরী আছে—কিছুদিন আমার সঙ্গে না চল্‌লে ফিরলে অত তুমি এখনি বুঝবে কি? উইলটা সে জানে না যেন,—জগতে আর কেউ কি জানে না, ব্যাঙ্কার, অলকার বাপের সলিসিটর, তা ছাড়া উইলের তিন চারটি সম্ভ্রান্ত সাক্ষী,—রেজেষ্টরী দলিল,—রেজেষ্টরী অফিস,—এরাও কি উইলের কথা জানে না? এতগুলো লোকের জানা আর জানা হলো না! ভাল বা হোক!"

বুঝিলাম বৃদ্ধের কত স্থানে আঘাত করা হইয়াছে! বলিলাম,—'জানে জানুক, ওদের জানা অজানায় আসে যায় কি! যুবকটি বেঁচে থাকলে অবিশ্যি কথা ছিল—যে রকম

নেই,—উইলেরও মূল্য আর আছে কি? বিয়েটা ত এখন যেখানে সেখানে হ'তে পারে!"

"সেইটাই ত ভাববার! এত দিন একটা বাঁধাবাঁধি ছিল,—ইচ্ছা করলেও অন্যত্র বিয়ে হবার যো ছিল না,—এখন কে বল্লে ও আমার ইচ্ছা মত বিয়ে করতে রাজি হবে,—গোঁড়া হিন্দু ঘরের মেয়ে ত নয়—দু চার মাস পরে সাবালিকা হবে—তখন আমার কথা না শুনে যদি, আমি আর কি করতে পারব!"

ও: এই জন্যই এত,—এত তাড়াতাড়ি,—এ না হইলে অতুল হয় ত আরও কয়টা দিন বাঁচিতে পারিত!

আমি বলিলাম "তিনি কি এমনি খোষ মেজাজী!"

"না না—তা কেন—যদি হয়—সেই কথাই বলছি—সব দিকটাই ভেবে দেখা দরকার!"

"ঠিকই! বলছিলেন, তাঁর অসুখ, তিনি ভাল হয়ে উঠুন,—এর মধ্যে একটা উপায় হবেই,—অনেক দিন দেখা না হলে ত একটা কিছু ওঁর মনে হবে—তখন না হয় দুর্ঘটনাটার কথা বলবেন।"

"না—না—না—কি যে বলছো,—আসল কথাটা এখনও কিছুই বোঝনি,—কি করে এখন ওর আত্মহত্যার কথা প্রকাশ করা যায়? বুঝ্‌ছ না কেন তুমি,—মরাটা যে কয়েদী—তুমি—এটা প্রচার না থাকলে তোমার অস্তিত্বই যে নেই! এত ভুলো তুমি,—হাঁদা—নিজের ভালমন্দটা পর্য্যন্ত বুঝতে পার না—এত বেকুব!"

বৃদ্ধ মহা বিরক্ত হইয়াছেন,—হইবারই কথা! আমি মূলেই ভুল করিয়াছি এ বিশ্বাস তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছে কিন্তু আমি চাই ওঁর মনের ভাব রগরাইয়া রগরাইয়া নিঃশেষ করিয়া বাহির করিতে! আমি বলিলাম "ও মরাটার কথা তুলিতে যাবেন কেন! বলছিলেন—অভিমানে প্রাণ দিলে,—সেই অভিমানেই কি যুবকটির অন্য দেশে চলে যাওয়া অস্বাভাবিক,—অন্যত্র মারা গেছে সেটার প্রচারের ব্যবস্থা এমন কি কঠিন হবে!"

বৃদ্ধ আশ্বস্ত হইলেন,—বলিলেন "বলেছ বেশ,—সেইটাই হবে স্বাভাবিক! তারই ব্যবস্থা করছি! তুমি প্রস্তুত থেক—শেষ রাতে কলকাতা রওনা হতে হবে,—বলেছি অলকার সেখানে অসুখ,—মেয়েটার ভালমন্দ দেখতে হয় সবার আগে!"

বৃদ্ধ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন, আমাকে মহা রহস্যে নিমজ্জিত করিয়া। এ সমস্যার সমাধান আমি করিতে পারিব কি! বৃদ্ধের প্রার্থিত বরটি কে? আমি! এতটা নির্ভর এখন আমার উপর,—তার মত ধুরন্ধর কিছুতে করিবে না। তবে কি তার পুত্র? খুব সম্ভবও সেই,—কিন্তু বৃদ্ধের কথাবার্ত্তায় মনে হয়,—পুত্রের উপরও তাঁর আস্থা নাই,—যথেষ্ট তাঁর সন্দেহ আছে—পুত্র সেই অর্থের মালিক হইলে পূর্ণস্বার্থ তাঁর রক্ষিত হইবে কি না। তবে কে সে বর,—বৃদ্ধের অভীষ্ট ক্রীড়নক!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:-*-:—

কোচবিহারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন বৃষ্টি। ৮·২২ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে বিগত বর্ষে এ সময় ছিল ৪·৯৮ ইঞ্চ। সহরে এবারে প্রায় ঘরে ঘরে হাম হইয়াছিল, এখন কমিতেছে। গবাদির পীড়াও এবারে বেশী। সরকার হইতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা হইয়াছে। ফলে পীড়া হ্রাস পাইতেছে। শস্যের অবস্থা মন্দ নহে কিন্তু এরূপ ভাবে বৃষ্টি চলিলে,—জমীর জঙ্গল পরিস্কার একরূপ অসম্ভব। সুতরাং শস্যের অপকার হইবে।

• • •

কোচবিহারের মহামান্য রাজসভা রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সাহায্য কল্পে ৪,২৪৮৲ টাকা সাহায্য দান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শিক্ষাই সর্ব্বউন্নতির মূলে।

• • •

কোচবিহারে কতিপয় যুবকের চেষ্টায় একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। প্রাতে দরিদ্র সন্তানগণকে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়,—শিক্ষকের

অধিকাংশই কলেজের ছাত্র। পর্যায়ক্রমে তাঁহারা শিক্ষকতা করেন। এরূপ চেষ্টা চাই গ্রামে গ্রামে। ঘরে ঘরে নরনারীর শিক্ষার ব্যবস্থা হউক।

নারীর অধিকার ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে,—সুখের কথা। শিক্ষিতা নারী উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিতা হউন—স্ত্রীশিক্ষার গরীমা তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে।

পাটনা গবর্ণমেণ্ট কুমারী শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যা মনোনীত করিয়াছেন। শ্রীমতী সুধাংশুবালা হাজরা বি-এল, পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী কর্ণেলিয়া সোরাবজি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

রাজ কোট রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার দুইজন মহিলা-সভ্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

অন্য পক্ষে আবার বাঙ্গলায় শ্রীমতী রেজিনা গুহ ওকালতি পাশ করিয়াও কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। আসামেও ব্যবস্থাপক সভায় নারীর নির্ব্বাচনাধিকার প্রত্যাখিত হইয়াছে। হউক—নিরাশ হইবার কিছু নাই। নারী প্রকৃত শিক্ষিতা হইলে তাঁহাদের অধিকার স্বীকৃত হইবেই হইবে।

আসল কথা,—সেই শিক্ষারই কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। কতিপয় উচ্চশিক্ষিতা মহিলার গর্ব্বে গর্ব্বিত বা পরাজয়ে নিরাশ হইলে সুফল হইবে না,—যিনি যে বিষয়ে কৃতী তাঁহার পথ তিনি করিতে পারিবেন। কিন্তু চাই কৃতীর সংখ্যায় বৃদ্ধি। বঙ্গের নিরক্ষর নারীর সংখ্যা অত্যধিক। যাঁহারা লিখিতে পড়িতে জানেন তাঁহারাও নাম মাত্র শিক্ষিতা,—বিদ্যা জোড় চিঠিপত্র লেখার। এ অবস্থার উন্নতি অচিরে হওয়া আবশ্যক। শিক্ষিতাগণ তৎপর হউন। ওকালতি না হইল তাহাতে কি? তাহা হইতে গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। তাঁহারা তাঁহাদের ভগিনীগণের শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করুন। সে দিন আসিলে বুঝিব নারী প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

নিত্য নারী নির্য্যাতনের সংবাদ, উহার কয়টিই বা প্রকাশ পায়! কত বধূ বিনা অপরাধে পশুর অধিক নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিতেছেন—তাহার সংখ্যা কে রাখে? আমরা জানি—বঙ্গের হিন্দু মুসলমান বহুস্থলেই বধুর নির্য্যাতনে তৎপর। পণ্ডিতের পরিবারে বধুর পিতাকে পীড়ন করিবার ইচ্ছায় নিরপরাধ তের বৎসরের বধুর প্রতি পশুর মত ব্যবহার করা হইয়াছে। শিক্ষিত বি-এ, পাশ মুসলমান যুবক, শ্বশুরের খরচে পড়িয়াও নিমকহারাম শিক্ষার কলঙ্ক লেপন করিয়া স্ত্রীকে নিত্য প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছে,—অথচ ইহারা ভদ্র,—ভদ্রপরিবারের বাহিরে ঢাকিবার চেষ্টা.—অন্দর—আবরণ,—আর এই ব্যবহার।

ইহার প্রতীকার কোথায়? শিক্ষিতা নারী এ বিষয়ে অবহিত হউন—ভগিনীগণের আত্মবোধ, সাহস,—আত্মনির্ভরতা যাহাতে উদ্বুদ্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে জীবন উৎসর্গ করুন—ব্যবস্থাপক সভা বা এখন নাই জুটিল! দলে পুষ্ট হইলে পশ্চাতে আর পড়িয়া থাকিতে হইবে না।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা—বড় ভয়ানক, মৃত ত মরিয়াছেই—যে মারে তাহাদেরও হৃদয়ের পরিচয় অতি শোচনীয় ভাবে প্রকাশ পায়। লবণকর গবর্ণমেণ্টের সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। দরিদ্রের প্রাণে বজ্রপাত করিয়া পালক, দেশে একি ভীষণ হাহাকারের সৃষ্টি করিলেন। এ দেশের দরিদ্র—সভা করিয়া, কাগজে লিখিয়া নিজেদের দুঃখ দৈন্য জোর-গলায় প্রচার করিতে জানে না—সে শিক্ষা তাহাদের নাই তাই বলিয়াই কি মূককে এরূপ ভাবে তাড়ন করিতে হইবে? তাহারা চীৎকার করিতে জানে না বলিয়াই কি ভাবিয়া লইতে হইবে—উহারা বঞ্চিত হইলেও উহাদের বেদনা-বোধ নাই। আশ্চর্য্য—সঞ্জীবনীতে দেখিলাম শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় আবার এই লবণ করের স্বপক্ষে ওকালতী করিয়াছেন—আমরা জানি সরকারের লবণে তিনি পুষ্ট কিন্তু দেশের লোকের একটু রক্তও কি তাঁহার দেহে নাই? সঞ্জীবনী কোন প্রাণে—এ ওকালতী পত্রিকাস্থ করিলেন! সঞ্জীবনী নিজেই ত বলিয়াছেন—এই লবণকরের ভার যে দুর্ব্বহ—তাহা অনেক সুধী ও বিবেচক স্বীকার করিয়াছেন—

ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিব সার বেসিল ব্ল্যাকেটের বোম্বাই গমন উপলক্ষে সার ফজলভয় করিমভয় ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিরূপে এক অর্ভ্যথনা সভা করেন। এই সভায় তিনি বলেন—ভারতগবর্ণমেণ্ট সৈন্য বিভাগের ব্যয়সংকোচ ব্যাপারে সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য লবণকর বৃদ্ধি করিয়া দেশের লোকের প্রাণে আঘাত দিয়াছেন। ইহাতে সভাসমিতি ও ব্যবস্থাপক সভা সমূহে অপ্রীতিকর ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের উপরও অযথা বোঝা চাপান হইয়াছে। আর বোঝা বাড়াইতে গেলে ইহার বিনাশ হইবে।

সৈন্য বিভাগে দেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার লাঘব করা উচিত ছিল। বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মীদিগের বেতন কমিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। দেশে শিক্ষিত যুবকদিগের কাজ কর্ম্ম জুটিতেছে না। তাহাদিগকে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করিলে দেশের লোকের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টেরও মহা উপকার সাধিত হইত। গবর্ণমেণ্ট তাহা না করিয়া লবণকর বৃদ্ধি করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

ব্যবসায়ীদিগের এই সমিতি লবণকর বৃদ্ধির সংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে। বড়লাটের এই মহাভ্রমের ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকের বিশ্বাস হারাইলেন। ১৯১৭ সনের আগষ্ট মাসের ঘোষণায় আর তাহাদের বিশ্বাস থাকিবে না। শাস্তিপ্রিয় দেশে প্রতিনিধিদের সমবেত মতকে এরূপভাবে উপেক্ষা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। যদি তাঁহাদের মতকে এরূপভাবে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আর ভবিষ্যতের জন্য আশা পোষণ করিতে পারেন না। লর্ড রেডিং এসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, দেশের লোকের নিকট তাহা অবজ্ঞেয় হইয়াছে। তাহারা এ সকল যুক্তির অসারতা সহজেই বুঝিতে পারে। ব্যবস্থাপক সভা সমূহের সদস্যগণ দেশের প্রতিনিধিরূপে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবাদ রাখেন। তাঁহারা জানেন যে, দেশের অবস্থার পক্ষে নূতন কর স্থাপন কতটা সম্ভবপর। লর্ড রেডিংএর এই কার্য্যের ফলে বহু শান্তপ্রকৃতি জননায়ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন। তাঁহার এই ব্যবহারে গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইল।

* * *

ভারতের লবণকর বৃদ্ধি বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে, পার্লামেণ্টে তাহার আলোচনা করিতে দেওয়া হইবে কিনা, গত সোমবার পার্লমেণ্টে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী লর্ড উইণ্টারটন তদুত্তরে বলিয়াছেন, "আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বৃদ্ধিহারে কর আদায় করা হইতেছে।"

সুতরাং পার্লমেণ্ট লবণকর বৃদ্ধি আইন বন্ধ করিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্ট পারিবেন না, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা পারেন নাই, ভারতের জনসাধারণের সুপরামর্শ লবণকর বৃদ্ধি বন্ধ করিতে পারেম নাই। লবণকর বৃদ্ধি একমাত্র ভারতবাসীই করিতে পারে। ভারত-বাসীরা যত লবণ ডাল তরকারীতে খায়, তাহার বেশী লবণ পাতে খায়। "আমরা পাতে লবণ খাইব না" সমস্ত ভারতবাসী যদি এই সঙ্কল্প করে, তবে লবণের কর দ্বিগুণ হওয়াতে কোন ক্ষতি হইবে না।

ভারবাসীর পরামর্শ ভারতের গবর্ণর জেনারেল অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ভারতসচিবও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারবাসীর মর্য্যাদা তাহার নিজের কার্য্যের উপর এখন নির্ভর করিতেছে। ভারতবাসীর যদি আত্মসম্মান বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সহিত বলিবে, "আমরা পাতে লবণ খাইব না।"

● ● ●

যাহাদের অন্নের সহিত অন্য ব্যঞ্জন আছে—তাহারা পাতে লবণের ব্যবহার কমাইয়া দিন। কিন্তু যাহাদের ব্যঞ্জনই ঐ লবণ তাহাদের উপায় ? আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি—কৃষকের মধ্যে ভাল অবস্থা যাহাদের তাহাদেরও অন্নের ব্যঞ্জন শাক—কোন প্রকার সিদ্ধ, ও লবণ। আর সাধারণ কৃষকের ব্যঞ্জন কোন প্রকার অম্ল, ও লবণ। শাক ও লবণ—পিঁয়াজ, লঙ্কা ও লবণ। লবণই তাহাদের আহারে প্রধান ব্যঞ্জন—ইহাদের লবণ বর্জ্জন কিরূপে সম্ভবে।

কলা বা অন্য ক্ষার হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া কোচবিহারের লোক পূর্ব্বে ব্যবহার করিত। আবার তাহারই প্রচলন হ'ক—ছোট বড় সকলে 'হাঁকা'—ক্ষারের জল ব্যবহার করিয়া লবণকর ব্যর্থ করুন।

কদলী বৃক্ষ বসা বা ফলের খোসা শুষ্ক করিয়া পোড়াইয়া লইলে যে খার হয় তাহা কোন একটি ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্রে রাখিয়া জল দিলে উহা চুয়াইয়া যে জল নিম্নস্থ পাত্রে জমা হয় তাহাই ছ্যাঁকা। ছ্যাঁকা লবণাক্ত—ইহাতে অল্প লবণ মিশাইলে লবণের কাজ চলে।

বঙ্গের ছাত্রগণ ক্রমেই নানা বিষয়ে কৃতীত্ব দেখাইতেছেন। ভারতব্যাপী প্রতীযোগীতা পরীক্ষায় তাঁহাদের ফল ক্রমেই সন্তোষজনক হইতেছে। বিগত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে সমগ্র ভারতের সিভিল সার্ভিসএর প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় বঙ্গের চারিটী ছাত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এবৎসর মাত্র নয়টীকে সার্ভিসে গ্রহণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ও ষষ্ঠ হইয়াছেন মান্দ্রাজী, দ্বিতীয় তৃতীয় অষ্টম, নবম বাঙ্গালী, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তমআগ্রা অযোধ্যাবাসী। আমরা আরও বিশেষভাবে এই কৃতীত্বের জন্য গৌরব অনুভব করিয়াছি। ইহার মধ্যে শ্রীমান জ্যোতীন্দ্র নাথ তালুকদার অষ্টম হইয়াছেন যিনি, তিনি আমাদের রাজসাহী বিভাগের নাটোর মহকুমার অন্তর্গত হালসা গ্রাম নিবাসী ও কোচবিহার মহারাজার স্মৃতি রক্ষিত দেবীগঞ্জের উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় ও অত্র সহরস্থ জেঙ্কিন্স স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। উত্তর বঙ্গের তিনি প্রথম আই, সি এস,। শ্রীমানকে আমরা অতি সরল ও সদাশয় বলিয়া জানি, ভগবান তাঁহায়—দীর্ঘজীবন দান করুন।

রাজসাহী বিভাগের আর একটী গৌরবমণি শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চৌধুরী। পাবনা জেলাস্থ করঞ্জা গ্রামে তাঁহার নিবাস। রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি দান করিয়াছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে বহুনব তথ্য আবিষ্কার করিয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকার রাসায়নিক পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শুভ ১৩৩০ সালের স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা,—৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

পঞ্জিকা হিন্দুর নিত্য প্রয়োজনীয়; প্রত্যেক দৈনিক কার্য্যে হিন্দু পঞ্জিকাকে মানিয়া চলেন। গ্রহ, তিথি প্রভাবে হিন্দুর অকাট্য বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহারা আজ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের একটী নিত্য স্মরণীয় মহৎ উক্তি ও সূক্ষ্ম যুক্তি—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্—এই মহামন্ত্র বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিলেন ইহার ফলে রোগ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নারীর অসম্মান, শিশুর মৃত্যু প্রভৃতি অশেষ অকল্যাণ ভারতবাসীর জীবনে নিত্য সহচর হইয়া উঠিয়াছে, এই বিস্মৃতির দিনে স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্ঘের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় ও তাঁহার কতিপয় সহকর্ম্মী দেশের ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য নানা দিক হইতে যেরূপভাবে অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসার্হ। প্রশংসার জন্য নহে—জানি তাঁহারা প্রশংসালোলুপ নহেন,—প্রকৃত কর্ম্মী; তাহাদের এই কর্ম্মের পুরস্কার ভগবান একদিন দান করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কুগ্রহ মনুষ্য জীবনে মহা অনর্থের মূল কিন্তু তাহা অপেক্ষা যে আরও ভয়ঙ্কর কুগ্রহ আমাদের জীবন নাশ করিতে বসিয়াছে তাহার পরিচয় আমরা বড় রাখি না। আলোচ্য গৃহ পঞ্জিকার হর পার্ব্বতী সংবাদে অতি সুনিপুণভাবে এই সকল গ্রহ উপগ্রহের পরিচয় ও তাহাদের কুপ্রভাব ও গ্রহ শান্তির—যোগের প্রতীকারের ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে পঞ্জিকাতে আলোচিত হইয়াছে ইহাতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলির শিরোনাম হইতে এই পঞ্জিকার উপকারিতা উপলব্ধি হইবে। কদভ্যাস, ধূমপান ফল, মাদকদ্রব্য সেবন-ফল, ভোজন ক্রিয়া, সেব্য অসেব্য, জীবাণুরহস্য, ব্যাধি ও ব্যাধিপ্রতিসেধক, ব্যায়াম, জাতীয় অবনতি ও তাহার প্রতীকার, পল্লীমঙ্গল, সহরবাসীর কর্ত্তব্য, ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি, বাঙ্গালীর আঁতুর ঘর,

দাম্পত্য জীবন ও বিবাহ, প্রসব ও শিশুচর্য্যা, চিকিৎসক ও চিকিৎসা ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আলোচ্য হইয়াছে। আশা করি বঙ্গভাষী পাঠকগণ প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই গৃহে পত্রিকাকে গৃহে স্থান দিয়া ইহার উপদেশ মত চলিতে চেষ্টা করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। উপরের লিখিত ঠিকানায় এক আনা মূল্যের ডাক টিকিট পাঠাইলে পত্রিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঈশ্বর ও মানব; ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিনবতিতম ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক বিবৃত সন্দর্ভ আমরা পুস্তিকাকারে প্রাপ্ত হইয়া ও তাহা পাঠ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয় কেবল বিদ্বান ও শাস্ত্রীয় তত্ত্বের নিধি নহেন, তিনি একজন ভক্ত। ভক্তের উক্তি সমালোচ্য নহে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার। ভক্ত নিজেও ভগবানের উক্তি নানা ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার অনুভূতি ভ্রাতৃগণকে শুনাইবার জন্য আনন্দে আত্মহারা হইয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "কান পাতিয়া শোন বিশ্বপতি পরম পিতার সাদর আহ্বান, ভুলিয়া যাও দুঃখ শোকের ব্যথা, ভুলিয়া যাও বিপদ আপদের কথা, উৎসবের আনন্দ-ধারায় আমাদের সকল ব্যথা সকল যন্ত্রণা ধৌত করিবার জন্য ভগবান স্বয়ং উপস্থিত। ভগবানের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতম যোগ। যে অপরাজিত পরমপুরুষের শক্তি বলে আমাদের আত্মা ত্রিভুবন বিজয়ের শক্তিধারণ করে তিনিই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও।"

আপনাকে পরীক্ষা কর। আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ধর্ম্ম সাধনের জন্য, পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের উদ্দেশ্যে স্বীকার করিতে হইবে তাহার প্রভাব। ভক্তের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতে হইবে—

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।

ঠাকুরের পৌরহিত্য সার্থক হউক। তাঁহার প্রার্থনা স্পর্শ করুক হৃদয়ে হৃদয়ে।